শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা বারো ॥

তৃতীয় সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৬৪

প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর : মন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১।১, দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা :
সুখেন্দু গুপ্ত
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাড়ে চার টাকা= চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

## উৎসর্গ

**পরেশকে ও পলাশকে**

# ভূমিকা

বর্তমান উপন্যাসের পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে এই গ্রন্থে বাংলা ভাষার দুটি বিভিন্ন রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন পরিচ্ছেদ তথা-কথিত সাধু ভাষায় (প্রকৃত-প্রস্তাবে দীর্ঘ ক্রিয়াপদে) লিখিত আবার কোন পরিচ্ছেদ বা তথাকথিত কথ্য ভাষায় (প্রকৃত প্রস্তাবে সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদে) লিখিত। এই গতি অনুসরণ করিবার মূলে একটি নিয়ম আছে বলিয়া লেখক মনে করেন। যে-সব পরিচ্ছেদে গল্পের প্রবাহ প্রবল, ভাষায় লঘুতা ও দ্রুতি যেখানে অত্যাবশ্যক, সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদের ভাষা সেখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার গল্পের প্রবাহ যেখানে অপেক্ষাকৃত স্তিমিত, ভাবুকতা ও বর্ণনা যেখানে অধিকতর, ভাষার লঘুতা ও দ্রুতি যেখানে অত্যাবশ্যক নয় সেখানকার ভাষায় দীর্ঘ ক্রিয়াপদের ব্যবহার করা হইয়াছে।

বাঙালী লেখকের হাতে ভাষার দুটি রূপ আছে—ইহাকে তাহার সৌভাগ্য বলিয়া মনে করা উচিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অধিকাংশ বাঙালী লেখক ইহাকে একপ্রকার বিড়ম্বনা বলিয়া মনে করে। সহজে ইহার সমাধান করিবার আশায় খেয়ালের বা মন-গড়া অবাস্তব সাহিত্যতত্ত্বের আঘাতে দীর্ঘ ক্রিয়াপদের হাড়গোড় গুঁড়াইয়া দিয়া সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া ভাষাকে 'সাবলীল' করিয়া তুলিতে অধিকাংশ বাঙালী লেখক উদ্যত। তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না যে ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব ভাষার একটা ঐশ্বর্য এবং ঐতিহাসিক কারণেই তাহার উদ্ভব হইয়াছে। ভাষায় ঐশ্বর্যকে বিড়ম্বনা মনে না হইয়াই পারে না। ক্রিয়াপদের পৃথক রূপ পৃথক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে ভাষা-প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছে। এই গ্রন্থে তাহাদের পৃথক প্রয়োজন সাধনে ব্যবহার করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

'চলন বিল' 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' পর্যায়ের তৃতীয় গ্রন্থ। পূর্বে প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'অশ্বত্থের অভিশাপ।'

—বাবা গল্প বলো,

তিন বছরের ছেলে এখনো স্পষ্টভাবে 'লয়' 'পয়' উচ্চারণ করতে পারে না, ওই এক রকম করে বলে, কিন্তু তাতে কারো বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ছেলে আবার বলে, বাবা গল্প বলো,

বাবা শুধায়, কিসের গল্প ? হাতীর ?

ছেলে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—না।

বাবা আবার শুধায়, ছাগলের ?

ছেলে আরো জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে জানায়, না।

বাবা এবারে হেসে বলে, মাথাটা যে ছিঁড়ে পড়বে।

ছেলেটিও হাসে, বলে, বলো—

বাবা জিজ্ঞেস করে—কিসের বলবো বল।

ধুলোড়ি বা ধুলুড়িম্বি গল্প।

বৃহৎ কুঠি আছে। জোড়াদীঘির ?

ছেলে বড় বড় দুটি চোখে সমর্থন ঘোষণা করে, মাথা নেড়ে বলে—হাঁ।

বাবা বলে, আচ্ছা তবে শোন্।

এই বলে সে গল্প বলতে শুরু করে, ছেলে মস্ত দুটো চোখ মেলে শুনে যায়। কাহিনীর সঙ্কট-মুহূর্ত যতই আসন্ন হয়ে ওঠে চোখ দুটো বৃহত্তর হয়, অধরোষ্ঠ ঈষমুক্ত হয়ে পড়ে শুক্তির মতো স্বচ্ছ ছোট্ট দুটি দাঁতের অংশ দেখা দেয়। বাপ তন্ময় হয়ে বলে যায়—

—ছেলে তন্ময় হয়ে শোনে।

পিতা গল্প বলতে আরম্ভ করে—জোড়াদীঘি বলে একটা গ্রাম আছে। সেই গাঁয়ের জমিদার চৌধুরীরা, তারা চার শরিক। চৌধুরীরা অনেক দিনের পুরানো বংশ, কবে যে তাদের পত্তন তার ঠিকঠিকানা নেই। গাঁয়ের খুব

বুড়ো লোকেও বলতে পারে না, কেননা, তারাও চৌধুরীদের অবস্থা এমনিই দেখছে, তাদের বাপঠাকুর্দাও ছোট্ট বেলায় তাদের কাছে চৌধুরীদের দরবার গল্পই করেছে, কেউ এমন বলেনি যে তখন চৌধুরীদের দালানের জায়গায় খড়ের ঘর ছিল।

বাপ এই ভাবে বলে যায়, ছেলে কাছে শান্তভাবে বসে কচি কচি হাত দুখানা কোলের উপরে রেখে শুনে যায়, বোঝা না বোঝায় মিশিয়ে এক রকম করে উপভোগ করে। যারা মনে করে যে ছোট ছেলেমেয়েরা বয়স্কের চেয়ে কম রসগ্রাহী তারা মস্ত ভুল করে। রসগ্রহণের পক্ষে অর্থবোধ অন্তরায় নয়, বরঞ্চ অনেক সময়ে বেশি বুঝলেই রসগ্রহণে বাধা জন্মে। সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরই স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত হলে শকুনির স্বর্গপ্রাপ্তির কথা জানতে পাওয়া যেত।

পিতা আবার বলে, একবার জোড়াদীঘির চৌধুরীদের সঙ্গে পাশের গাঁয়ের এক জমিদারের বিবাদ বাধল। সেই বিবাদ ক্রমে কলহ থেকে মারামারিতে পরিণত হল। সে কি মারামারি, লড়াই বললেই চলে। এপক্ষে ওপক্ষে হাজার হাজার প্রজা, তাদের হাতে লাঠিসোটা, ঢাল তরোয়াল
এমনতরো কত কি, এমন কি দুই পক্ষে অনেকগুলো
এমন অবস্থা হল যে জোড়াদীঘির দল এগিয়ে উপস্থিত
গাঁয়ে।

এই কথায় ছেলেটির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার কাছে মিত্র হিসাবে দুই পক্ষই সমান তবু কেমন যেন সে জোড়াদীঘির পক্ষ টেনে চলত। শিশু, নারী ও দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি নিরপেক্ষতার ভারসাম্য সহ্য করতে পারে না, কোন এক পক্ষকে অবলম্বন না করা অবধি তারা কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। পুত্রের মুখে আনন্দের আভা লক্ষ্য করে পিতাও আনন্দিত হয়ে ওঠে, দ্বিগুণ উৎসাহে আবার আরম্ভ করে।

গল্পের মাঝে অবান্তর ঘটনা বা নূতন কিছু এসে পড়লে পুত্র বলে ওঠে, কই বাবা, এমন তো আগে বলনি। বাবা বলে—তোর মনে আছে দেখছি। ছেলে হাসে। ফলকথা বুঝতে বিলম্ব হয় না যে গল্পটি বহুকথিত ও বহুশ্রুত।

বস্তুত পিতাপুত্রের মধ্যে এই একটিমাত্র গল্পই প্রচলিত। তবে যে পিতা হ্যতীর গল্প, ছাগলের গল্প বলে পরীক্ষা করে, সে কেবল পরীক্ষাই, তার বেশী কিছু নয়। প্রতিদিন সায়াহ্নে নির্জন কক্ষের দীপালোকে পিতা একমাত্র কথক, পুত্র একমাত্র শ্রোতা। রাত্রি গভীর হয়ে উঠলে নিতান্ত ঔৎসুক্য সত্ত্বেও পুত্র ঘুমে ঢুলে পড়তে থাকে, তখন পিতা তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের শয্যায় একান্তে শুইয়ে দেয়, তারপরে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ছাদের উপরে যায় চলে। কখন কত রাতে যে নেমে আসে কেউ বলতে পারে না। সেই নির্জন ছাদে, অন্ধকার রাত্রে, দিগন্তব্যাপী প্রকাণ্ড বিলের দিকে তাকিয়ে সে কি চিন্তা করে কেউ জানে না। বিলের মধ্যে শত শত আলেয়া চমকায়, তাদের সঙ্গে ওই নিশাচর লোকটির কি ইসারা ইঙ্গিত চলতে থাকে কে বলতে পারে?

*

প্রায় সওয়া শ বছর আগেকার কথা।

চলন বিলের প্রান্তে ধুলোউড়ি বলে একখানা গ্রাম; লোকে সংক্ষেপে ধুলোড়ি বা ধুলুড়ি বলে। সেই গ্রামের শেষ সীমাতে একটি প্রাচীনকালের বৃহৎ কুঠি আছে। কতকাল থেকে সেই কুঠি যে অনধ্যুষিত তা কেউ বলতে পারে না। কুঠির পরেই বিলের আরম্ভ, বিলের মধ্যে কিছু দূরে, আর-একটি ছোট গ্রাম; গ্রাম না বলে একটি পাড়া বলাই উচিত, কারণ এক সময়ে দুটি গ্রাম ভূখণ্ডের দ্বারা যুক্ত ছিল, তারপরে কোনোবার প্রবল বর্ষায় মাঝের জমিতে ভাঙন লেগে দুটি আলাদা হয়ে পড়েছে, বস্তুত দুইটি একই গ্রামের অংশ, তার প্রমাণস্বরূপ লোকে এখনো এই ছোট গ্রামটিকে ছোট ধুলোউড়ি বলে। সেখানে কয়েক ঘর মাত্র লোকের বাস। বর্ষাকালে দুই গ্রামের মধ্যে নৌকায় যাতায়াত, এখন শীতকালে পায়ে হেঁটেই আসাযাওয়া চলে।

কিছুকাল আগে ধুলোউড়ির লোকে দেখল, কোথা থেকে নূতন লোক এসে কুঠিবাড়িটা দখল করে বসল। তারা পুরানো বাড়ির ভাঙা দরজা-জানালাগুলো কাজ চালাবার মতো করে সারিয়ে নিল, মানুষ বাসের

উপযোগী কিছু তৈজস ও আসবাব এল, তার চেয়ে আর বেশী কোন পরিবর্তন ঘটল না কুঠিবাড়ির। আর লোকজনও যে অনেক এল এমন নয় —সবশুদ্ধ চার-পাঁচ জন মাত্র। মানুষের ওইটুকু স্পর্শে কুঠির নির্জনতায় লক্ষ্য করবার মতো কোন বদল হল না, সে যেমন নিদ্রিত ছিল, তেমনি রইল; অত বড় বাড়িতে ওই কটি লোকের সাড়াশব্দে কুঠির নিদ্রাভঙ্গ হল না, কেবল সে একবার যেন স্বপ্নে কথা কয়ে উঠল, তাতেই বোঝা যেতো কুঠির স্তব্ধতা কি অপরিমেয়!

কুঠির নূতন কর্তা দর্পনারায়ণ চৌধুরী। সে তার শিশুপুত্র দীপ্তিনারায়ণ আর পুরানো চাকর মুকুন্দকে নিয়ে এখানে এসে বসল, সঙ্গে আরো জন দুই অনুচর ছিল, আর কোন লোক ছিল না তাদের সঙ্গে।

দর্পনারায়ণ যে-সব গল্প বলে শিশুপুত্রটির মনোরঞ্জন করত, তার মধ্যে জোড়াদীঘির জমিদারদের কাহিনী ছিল শিশুটির সবচেয়ে মুখরোচক, বোধকরি সে কাহিনী পিতারও কম চিত্তাকর্ষক ছিল না; পুত্রের ভালো লাগার মাধ্যমে নিজের ভালো লাগার সমর্থন যেন সে পেত, পুত্রের আগ্রহ পিতার চিত্তকে চঞ্চলতর করে তোলে, যেমন নূতন অববাহিকার জল এসে পড়ে মূল নদীকে দেয় ঝাঁপিয়ে।

বিকালবেলা পিতাপুত্রে ছাদের উপরে এসে বসে—সম্মুখে যতদূর দেখা যায় ঝিলের অবারিত উদারতা, চোখের দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না, ছুটতে ছুটতে অবশেষে ধোঁয়া আর কুয়াশা আর মেঘ মিলিয়ে যেখানে দিগন্তের মতো রচনা করেছে সেখানে গিয়ে আপনি বাধা পায়।

দুজনে বসলে পুত্র বলে, বাবা বলো। 'ল' টা 'য়' হয়ে যায়।

পিতা পূর্বদিনের অনুবৃত্তি করে সূচনা করে—

জোড়াদীঘির সঙ্গে শত্রুপক্ষ রক্তদহের অনেকদিন ধরে লড়াই চলল। তারপরে জোড়াদীঘির চৌধুরীরা রক্তদহের জমিদারের বাড়ি চড়াও করে জমিদারকে বেঁধে নিয়ে জোড়াদীঘিতে ফিরে এল।

পুত্র জোড়াদীঘির জয়ে উল্লসিত হয়। পুত্রের উল্লাসে পিতা উদ্দীপ্ততর

আগ্রহে বলতে থাকে—রক্তদহের জমিদারকে তো বেঁধে এনে জোড়াদীঘির বাড়িতে তারা কয়েদ করে রাখল। কিন্তু তারপরেই বাধল গোল।

পিতা বলে চলে—ওদিকে হাঙ্গামার খবর পেয়ে কোম্পানি ফৌজ পাঠিয়ে দিল জোড়াদীঘিতে, তাদের উপরে হুকুম, যেমন করেই হোক রক্তদহের জমিদারকে উদ্ধার করে জোড়াদীঘির বাবুদের বেঁধে নিয়ে আসতে হবে।

শিশু দীপ্তিনারায়ণ কিছুতেই বুঝতে পারে না, কোম্পানিই বা কে আর জোড়াদীঘির বাবুদের উপরে তার এত রাগই বা কেন? বুঝতে পারুক আর নাই পারুক, বুঝতে পারে না বলেই আরও বেশী করে তার রাগ হয় কোম্পানির উপরে—সেই সঙ্গে একটা ভীত বিস্ময়েরও উদ্রেক করে তার শিশুচিত্তে উক্ত কোম্পানি। কোম্পানিও তবে কম বীর নয়, জোড়াদীঘির বাবুদের উপরে হাত দিতে সাহস করে। সে ভাবে, আচ্ছা কোম্পানি কি মানুষ, না জানোয়ার, না গল্পে শ্রুত কোন দৈত্যদানব। এই চিন্তার কিনারা না পেয়ে তার শৈশব কল্পনা মানুষে-জানোয়ারে দৈত্যদানবে মিলিয়ে কোম্পানির একটা মূর্তি অঙ্কিত করে। সে মনে মনে দেখে, কোম্পানির মুখটা সিংহের, হাত দুটো মানুষের আর বাকিটা সব দৈত্যের।

পিতা বলতে থাকে—কোম্পানির ফৌজ এসে জোড়াদীঘির বাড়িতে ঢুকে পড়ল; কয়েদখানা থেকে রক্তদহের বাবুকে মুক্তি দিয়ে জোড়াদীঘির বাবুদের বেঁধে নিয়ে চলে যায় সদরে, আর বিচার করে তাদের সাত বছরের ফাটক দেয়।

কোম্পানির উপরে রাগে গা জ্বলতে থাকে দীপ্তিনারায়ণের। কিন্তু হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে ছাদের প্রান্তে চলে যায়—আর দুই হাত আকাশে পেতে চীৎকার করে বলতে থাকে—বক মামা ফুল দে, বক মামা ফুল দে।

পুত্রের চীৎকারে পিতা তাকিয়ে দেখে সন্ধ্যাগমে দলে দলে হাঁস বিল ছেড়ে বাসার দিকে চলেছে। এক-এক দলে পঁচিশ-ত্রিশটি হাঁস তীর-মুখ ব্যূহ রচনা করে ছুটেছে, যতই দূরে যাবে তীরের সূচীমুখ ক্রমে অর্ধবৃত্তে, অর্ধচন্দ্রে পরিণত হতে থাকবে। হাঁসগুলো কেবলি বিল থেকে উঠছে, এখনো উচ্চাকাশ

পায়নি, তা ছাড়া কুঠিটাও বেশ উঁচু, কাজেই ছাদের কাছ ঘেঁসেই যেতে থাকে, যেদিন রোদ থাকে ছাদের উপরে দলে দলে ছায়া পড়ে, ছায়া গুনে হাঁস গুনে নেওয়া যায়, পিতাপুত্রে ছায়া গোনার প্রতিযোগিতা পড়ে, আবার চোখ বুজে কেবল শব্দ লক্ষ্য করেও হাঁসের দল অনুমান করা যেতে পারে। দূরশ্রুত ক্ষীণ শব্দ ক্রমে প্রবলতর হতে হতে ঠিক মাথার উপর এসে প্রচণ্ড একটা শ-ষ-স ধ্বনির তোরণ মধ্যবিন্দুটিতে উঠে নেমে পড়তে পড়তে আবার ক্রমে একটা দূরশ্রুত অস্পষ্ট 'হস্' আওয়াজে পরিণত হয়ে যায়। এমনি চলতে থাকে অন্ধকার জমাট না বাঁধা অবধি।

আজ রোদ নেই, ছায়া গোনবার প্রতিযোগিতা হবে না দেখে দীপ্তিনারায়ণ হেঁকে চলেছে—বক মামা ফুল দে, বক মামা ফুল দে। ওদিকের ছেলে-মেয়েদের বিশ্বাস তাদের এই মিনতি উপেক্ষা করতে না পেরে নীড়াতুর বকের দল চঞ্চু থেকে দুচারটে ফুল ছোট ছোট মানব ভাগিনেয়দের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে। বকের দল অপসারিত হলে নখের উপরে শুভ্রবিন্দু গণনা করে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হিসাব চলে, বক মামা কাকে ক'টা ফুল দিয়েছে। দীপ্তিনারায়ণের এখানে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় সে জানে বক মামার সে প্রিয়তম ভাগ্নে। পিতাকে এনে দশ নখের দাগ দেখায়, বলে, দেখো বাবা কত ফুল। বাবার স্নেহাতুর কান শোনে, দেখো বাবা কত 'ফুয়'। দর্পনারায়ণ ভাবে মানুষে 'ফুয়' না বলে ফুল বলে কেন?

কোনোদিন বা দর্পনারায়ণ দীপ্তিনারায়ণকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়। ধুলোউড়ির কাছে বিলের অনেকখানি শুকিয়ে গিয়েছে; ছোট ধুলোউড়ি পর্যন্ত শীতকালে শুকিয়ে মাঠ হয়ে যায়; মসুর, সর্ষে, ছোলা প্রভৃতি রবিশস্যের চাষ হয়, তারপর রবিশস্য ঘরে উঠলে বৈশাখের প্রথমে, কোনবার বা বৈশাখের শেষে পুবের বানে জায়গাটা ভরে উঠে আসল বিলের সামিল হয়ে পড়ে।

দীপ্তি আগে আগে চলেছে, পিছনে দর্পনারায়ণ, সরু আলের পথ, দুজনের পাশাপাশি চলবার মতো জায়গা নেই। দীপ্তি গল্পের পরবর্তী সূত্রের জন্ত তাগিদ দেয়, পিতা বলে, দাঁড়াও, আগে মাঠের মধ্যে গিয়ে পৌছই, এমন সরু পথে চলতে চলতে কি গল্প বলা যায়? কখন বা পড়েই যাব।

এমন সময়ে দীপ্তিনারায়ণ বলে ওঠে, বাবা ওই দেখো! এই বলে সর্ষের ভুঁইয়ের মধ্যে আঙুল দিয়ে দেখায়। দর্পনারায়ণ কিছু দেখতে পায় না, বলে সর্ষের ফুল।

পিতার অজ্ঞতায় শিশু-পুত্র হেসে ওঠে, না না, ওই দেখো! বলেই সে আল থেকে ক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়ে। তার পায়ের সাড়া পেয়ে একটা মেটে রঙের খরগোস দুইলাফে অনেকটা দূরে গিয়ে পিছনের পা দুটির উপর ভর করে বসে লাল চোখ দুটো ঘুরিয়ে তাকায়।

দীপ্তিনারায়ণ পিতার উদ্দেশ্নে বলে, লাফারু। বলেই সেটার দিকে দৌড়ায়। কিন্তু লাফারুর সঙ্গে পারবে কেন? সে লাফ দিয়ে দিয়ে মুহূর্তে দু-তিনটে ক্ষেত পার হয়ে যায়, দীপ্তিনারায়ণ মাটির ঢেলাতে কেবলই হুঁচোট খেতে থাকে।

পিতা বলে, যাসনে যাসনে পড়বি। কে কার কথা শোনে! কিন্তু খরগোসটা কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যায়, কাজেই দীপ্তিনারায়ণকে থামতে হয়। সে একমুঠো সর্ষেফুল ছিঁড়ে নিয়ে ফিরে আসে।

এবার তারা মাঠের মধ্যে এসে পড়ে পাশাপাশি চলতে থাকে, পুত্র বলে, বাবা এবার বলো।

বাবা বলে, চৌধুরী জমিদার সাত বছর পরে ফাটক থেকে গাঁয়ে ফিরে এল। ফিরে এসে দেখে তার বাপ মারা গিয়েছে।

মৃত্যুর রহস্ত শিশুটি বুঝতে পারে না। তার নিজের মা নেই, অথচ দেখে অপরের মা আছে, নিজের মাকে তার মনে পড়ে না; শুধিয়ে উত্তর পায়, স্বর্গে গেছেন; স্বর্গ কোথায় শুধিয়ে আবার উত্তর পায়, আকাশে। সে বুঝে নেয় তার মা আকাশে গেছে। কিন্তু কেন যে গেল, কবে ফিরে আসবে, অপরের

মা আছে, অথচ বিশেষ করে তার মা আকাশে গেল কেন এসব প্রশ্নের মীমাংসা কে তাকে করে দেবে! সে কিছু না বুঝে চুপ করে থাকে।

পিতা গল্পের সূত্র অনুসরণ করে বলে চলে, চৌধুরী জমিদার এসে দেখে যে তার জমিদারির প্রায় সবখানি কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে।

কোম্পানির উপরে সুপ্ত ক্রোধ পুত্রের মনে জেগে ওঠে। যেখানে বড় হয়ে ছিল সেখানে কেউ ছোট হয়ে থাকতে চায় না। এ সব কথা শিশুর বুঝবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু দর্পনারায়ণ যে কেবল পুত্রের উদ্দেশ্যেই গল্প-বলত এমন মনে করবার কারণ নেই।

দর্পনারায়ণ বলে, যাই হোক হঠাৎ কোথায় আর যাবে, চৌধুরী সেখানেই রইল। কিছুদিন পরে তার একটি ছেলে হল, ছোট্ট ফুটফুটে ছেলেটি। তখন বাপমায়ের আনন্দ দেখে কে? বাপ বলত, তোমার মতো দেখতে হয়েছে; শুনে স্ত্রী বলত, কী যে বলো, ঠিক তোমার মতো। দেখেছ চোখ দুটো—এই বলে ছেলেটিকে তুলে ধরে। সে তো পিতামাতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিছু জানে না, একবার বাপের দিকে তাকিয়ে হাসে, আর একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসে। মা বলে, দেখলে ছেলের কাণ্ড! দুজনকেই খুশী করে দিল।

দীপ্তিনারায়ণ শুধায়, বাবা ছেলের নাম কি?

নামটা ঠোঁটের কাছে আসে, দর্পনারায়ণ চেপে গিয়ে বলে, নাম আবার কি? খোকা।

দীপ্তিনারায়ণ অনুকম্পার সঙ্গে হাসে, ভাবে বেচারা, একটা নামও জুটল না, তার অন্তত তিনটে নাম। শুধোয়,—তারপর?

বাপ বলে—এমনি চলছিল, দুঃখকষ্টের জ্বালা বাপমায়ে দুজনেই অনেকটা ভুলেছিল পুত্রকে পেয়ে, এমন সময় তার মা মারা গেল।

দীপ্তি ভাবে—আহা বেচারা! ছেলেটির প্রতি সে সহানুভূতি অনুভব করে। এই কথা বলবার সময়ে পিতার চোখ ছলছল করে আসে, গলা ভারী হয়ে আসে। শিশুটি হঠাৎ বাপের মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু ইতিমধ্যে

অন্ধকার হয়ে এসেছে, চোখের জল দেখতে পায় না। তবু কেমন যেন, কি ভাবে তার অধানুভূতি হয় ওই ছেলেটির সঙ্গে তার একটা সূক্ষ্ম যোগ আছে। পৃথিবীর সমস্ত মাতৃহীন পুত্রই যে দুঃখের একই পর্যায়ের অধিবাসী! দুজনে অনেকক্ষণ নীরবে চলে, তারপরে পিতা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, চৌধুরীর আর গাঁয়ে থাকবার কোন কারণ রইলো না। সে একদিন রাত্রে শিশু পুত্রটিকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে এসে অন্যত্র বসতি করল।

—আমার গল্প ফুরাল। এই বলে সে থামে।

কিন্তু যে গল্প থামলেই ফুরোয় সে তো গল্পই নয়। ছেলেটির মনে সেই মাতৃহীন শিশুর দুঃখ করুণায় গুঞ্জন করতে থাকে। দুদিকের ধানকাটা মাঠের বিচালিতে তখন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—শিশিরে ঠাসা বাতাস ঠেলে উপরে উঠতে না পেরে ধোঁয়া মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আবার ধোঁয়ার চাপে আগুনের শিখা নিভে নিভে আসছে। আর ধুলোউড়ির বাঁশবনের মাথায় স্তরে স্তরে ধোঁয়া জমে রয়েছে, সেগুলো ক্রমে দীর্ঘ বিতানিত ভাবে বিস্তারিত হয়ে পড়ছে। সর্ষেফুলের গন্ধে বাতাস ঘনীভূত, ইতস্তত দুচারটে শিয়ালের যাতায়াত ; এখনো তাদের প্রথম প্রহর হাঁকবার সময় হয় নি।

অনেক রাত্রে দর্পনারায়ণ ছাদের উপর থেকে নেমে আসে, ক্ষীণ আলোয় হঠাৎ চোখে পড়ে শয্যার একান্তে নিদ্রিত দীপ্তিনারায়ণকে। সে যেন তাকে নূতন করে দেখতে পায়। মানুষে ভালোবাসার পাত্রকে প্রতি দৃষ্টিতে নূতন করে আবিষ্কার করে, প্রেমে যে অভাবিতপূর্বতা আছে, তাতেই প্রণয়াস্পদকে কখনো পুরানো হতে দেয় না, নদীর স্রোতের মতো প্রেম প্রতিমুহূর্তে নূতন, পুকুরের বাঁধা সীমানার বদ্ধ জল সে নয়।

দর্পনারায়ণ দেখে তার শিশুপুত্র পাশ ফিরে শুয়ে আছে, কচি কচি হাতের মুঠি দুখানা দুই স্তবক জুঁইফুলের মতো শয্যার উপরে অযত্নে বিন্যস্ত ; স্বপ্নের

লঘুপায়ের চিহ্নটুকু অবধি সুকুমার মুখমণ্ডলে নেই। হঠাৎ তার বনমালাকে মনে পড়ে যায়। সদ্যোজাত পুত্রটিকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কতই না আদরের বিবাদ হয়েছে। বনমালা কৃত্রিম অভিমান করে বলত, আমি ছেলের মা কিন্তু ওর চেহারায় কোথাও আমার ছোঁয়াচ নেই। দর্পনারায়ণ বলত, তাই বই কি! কোথায় আমার মতো দেখলে?

তখন স্বামী-স্ত্রীতে পুত্রের নাক চোখ মুখ কানের কোথায় কার সঙ্গে কতটুকু ঐক্য তাই নিয়ে এক প্রকার সুখের বিবাদ-বিসম্বাদ শুরু হত! এমন বিবাদের কোন সিদ্ধান্ত হয় কেউ চায় না, কারণ তাতে ভবিষ্যতের প্রণয়-কলহের পথ বন্ধ হয়ে যায়। আজ বিপত্নীক দর্পনারায়ণের সেই সুখের দিনগুলি মনে পড়ল, মনে পড়ে চোখ ছলছল করে এল। তার মনে হল সেদিন যে-সব ঘটনাকে দুঃখ বলে মনে হত, আজ তারাই সুখের বেশ ধারণ করেছে। দূরগত দুঃখ সুখ বলে প্রতিভাত হয়, দূরগত শিলাস্তূপ যেমন নীলাঞ্জনসদৃশ গিরিমালা। দুঃখ দূরে গিয়েও যদি ভয়াবহতা বর্জন না করত তবে মানুষের জীবন কি দুর্বিষহই না হত! বিধাতা মানুষকে ওইটুকু কৃপা করেন।

মানুষের বর্তমান যতই বিষম হোক না কেন, আজকার দিন কালকার দিনে পরিণত হবামাত্র তা সুখকর হয়ে ওঠে। তাই তো মানুষ কল্পনা করেছে তার সত্যযুগ কোনো সুদূর অতীতে ছিল। কিন্তু বর্তমান! বর্তমান যেন বোবা জলের বিল। নদীর জলের মতো তাতে সঙ্গীত ধ্বনিত হয় না, বোবা দুঃখ মানুষের মনকে দুঃস্বপ্নের মতো চেপে ধরে। দর্পনারায়ণের মনে হল মানুষের জীবনটা বোবা জলের দুস্তর জলাশয়, তার গতি নেই, গান নেই, নৌকার ক্ষেপনীর সঙ্গীতও যেন তাতে ধ্বনিত হয় না, ঠিক যেন এই চলন বিলটার মতো।

বিলের কথা মনে পড়বামাত্র সে শয্যার পাশ থেকে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল—তার মনে হল চন্দ্রহীন অন্ধ আকাশ উপুড় হয়ে পড়ে বোবা বিলটাকে চেপে ধরেছে—অন্ধ আর বোবার এ কি সমন্বয়! একজন দেখতে পায় না, আর একজন প্রকাশে অক্ষম, দৃষ্টিহীন আর ভাষাহীনে মিলে এ কি

দুঃস্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করতে চাইছে! তার মনে হতে লাগল সৃষ্টি-স্রোতের বাইরে কোথায় যেন সে অকস্মাৎ এসে পড়েছে! তার মনে হল এখনি এই নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে না পারলে দুজনে মিলে তার অস্তিত্বকে পিষে মেরে ফেলে দেবে। সে মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল, শুতে ভুলে গেল। এমন কত রাত সে নিদ্রা ভুলে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিয়েছে!

কুঠির পিছন দিকে প্রাচীরঘেরা একটি বাগান ছিল। ছিল বলাই ভালো, কারণ এখন যা আছে, তা না থাকবারই সামিল। এক কোণে একটি বড় বাদাম গাছ আছে, আর আছে গোটা কয়েক আম, আমলকি, আর এক সার ঝাউ। ফুলের গাছ অনেক ছিল, কিন্তু সে-সব অনেক কাল হল গিয়েছে, প্রাচীরের খানিকটা ধ্বসে পড়েছে, সেই ফাঁক দিয়ে গাঁয়ের গোরু, ছাগল ঢুকে ফুলের গাছগুলো নষ্ট করে ফেলেছে। কুঠিতে লোক আসবার পরে প্রাচীরের ভাঙা অংশে বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছে, গোরু, ছাগল আর আসতে পারে না, কিন্তু মানুষের আসতে বাধা হয় না, তবু বড় কেউ আসে না। কুঠির নূতন মালিককে করে গাঁয়ের লোকের ভয়। এই বাগানটিতে মস্ত একটা লিচুর গাছ আছে, বাগানের ঐশ্বর্য। তখনকার দিনে সে অঞ্চলে লিচু গাছ দেখা যেত না। ওই গাছটা ওখানে কেমন করে হয়েছিল, কে লাগিয়েছিল, তা কেউ বলতে পারে না। গাঁয়ের লোকে লিচুর লোভে শূন্য কুঠিতে এসে ঢুকত, কাড়াকাড়ি করে ফল পেড়ে নিয়ে যেত। তাদের লোভের ব্যস্ততায় ফলগুলো পাকতে পেত না, লোকে জানত না লিচুফল পাকলে এমন লাল, তার স্বাদ এমন মধুর। এখন আর কুঠিতে কেউ ঢুকতে সাহস করে না, যথা-সময়ে পাকা লিচুতে গাছ ভরে যায়, কিন্তু গাঁয়ের লোক আর তার স্বাদ পায় না, প্রাচীরের বাইরে থেকেই দেখে।

এখন জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে লিচু গাছটি পাকা ফলে ভরে গিয়েছে, ঘন সবুজ পল্লবের উপরে ঘন লাল ফল, যেন সূর্যাস্তের মেঘ। দুপুর বেলায় তিনটি বালক-বালিকা গাছতলায় সমবেত হয়ে ফল পাড়ছিল। একজন গাছে চড়ে ফল ছিঁড়ে নীচে ফেলে দিচ্ছিল, আর দুজনে কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করে রাখছিল। নীচের দুজনের মধ্যে একজন দীপ্তিনারায়ণ, আর একজন একটি মেয়ে; বয়স তার বছর আষ্টেক হবে আর যে গাছের উপরে চড়ে ছিল, ডালপালায় আবৃত হয়ে পড়ায় তাকে সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তার বয়স যে সকলের চেয়ে বেশী অনুমান করতে কষ্ট হয় না। সে উপর থেকে ঝুপঝুপ করে গুচ্ছ গুচ্ছ পাকা ফল ফেলে দেয়, আর দুজনে কুড়িয়ে নিয়ে স্তূপ করে রাখে। এই তিনটি প্রাণী ছাড়া প্রকাণ্ড বাগানটাতে আর জনপ্রাণী নেই—সব কেমন খাঁ খাঁ করে, উপরের প্রকাণ্ডতর আকাশখণ্ডও সম্পূর্ণ রিক্ত, কোথাও মেঘের রেখা মাত্র নেই, কেবল থেকে থেকে একটা চাতক তৃষ্ণার তীক্ষ্ণ শূলে রৌদ্রদগ্ধ শূন্যতার গায়ে ক্ষুদে ক্ষুদে দেয় 'ফটিক জল।' গাঁয়ের আম্রকুঞ্জের মধ্যে একটা বৌ-কথা-কও পাখির ভীরু মিনতি ধ্বনিত, আর বাদাম গাছটার ডালে একটা হলদে পাখি 'কুক' 'কুক' রবে কাকে যেন কুমন্ত্রণা দান করে। মাঝে মাঝে জ্যৈষ্ঠ মাসের তপ্ত বাতাস দমক মেরে আসে, ঝাউ-এর গাছগুলো আর্তনাদ করে ওঠে, বাগানের শুকনো পাতার রাশ মরমর, সরসর শব্দে বাতাসের পায়ের চিহ্ন বহন করে। উপরের ছেলেটি চমকে উঠে চাপা স্বরে সতর্ক করে দেয়—দেখিস, কেউ আসে কিনা!

মেয়েটি একবার এদিকে ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে শব্দে আর ইসারায় মিলে জানিয়ে দেয়, ভয় নেই তুমি পাড়তে থাক। ছেলেটি অভয় পেয়ে আবার উপর থেকে ঝুপঝুপ করে লিচুর গুচ্ছ ফেলে দেয়।

ওদিকে দৃষ্টির অতীত শূন্যতায় চাতকের তৃষ্ণার আবেদনের আর অন্ত নেই—'ফটিক জল।' আর তারই পরিপূরকভাবে আম্রকুঞ্জের মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে সলজ্জ কাকুতি—'বউ-কথা-কও'! দুজনেই সমান তৃষিত, কিন্তু সে তৃষ্ণার আবেদনে কি প্রভেদ! বাসরঘরের রুদ্ধ বাতায়নের উপরে টোকা

মেয়ে চাপা কণ্ঠে একজনের ভীরু মিনতি, আর একজন আকাশের চৌকাঠে যেখানে আলোকের সিংহদ্বার সম্পূর্ণ প্রসারিত, নিজের আর্ত হৃদয়কে সেখানে আছড়ে ফেলে দিয়ে আবেদনের মর্মভেদী তীব্রতায় নিজের দুঃখকে বিশ্বজনীন করে যুগযুগান্তর ধরে মাথা কুটে মরছে 'ফটিক জল'। একজন কবি আর একজন বিরহীমাত্র! কবির বেদনা বিশ্বজনীন, প্রণয়ীর বিরহ নিতান্তই ব্যক্তিগত।

উপর থেকে বালকটির কণ্ঠ শুধাল—কুসমি, কত হল রে? আর চাই!

মেয়েটি বলল, অনেক হয়েছে, এবারে তুমি নেমে এসো। আর দেরি হলে মুকুন্দ এসে পড়বে।

মুকুন্দের নাম শুনবামাত্র দীপ্তিনারায়ণ শঙ্কিত হল—বলল,—এসো।

তখন ছেলেটি গাছ থেকে নেমে পড়ল। সে নীচের দুজন সঙ্গীর চেয়ে বয়সে বড়—বারো বৎসর অনুমান করলে ভুল হবে না।

তিনজনে একটা আম গাছের ছায়ায় এসে বসল, সেখানেই লিচুর গুচ্ছগুলো রক্ষিত হয়েছিল।

বড় ছেলেটি দীপ্তিকে তার কাছে এনে বসিয়ে বলল, দীপ্তিবাবু তুমি এইখানে বোসো, আমি তোমাকে লিচু ছাড়িয়ে দিচ্ছি। তখন লিচু খাওয়া আরম্ভ হল।

মেয়েটি বলল—মোহনদা, লিচু তো প্রায় শেষ হল, এর পরে কি হবে?

ছেলেটি একটা আম গাছ দেখিয়ে বলল—কেন, আম আছে।

মেয়েটি বলল—আম শেষ হলে তার পরে?

মোহন বলল—তারপরে কাঁঠাল।

মেয়েটি বলল—দূর, কাঁঠাল আবার লোকে খায়?

মোহন বলল—লোকে খায় না তো গাঁয়ের কাঁঠালগুলো যায় কোথায়? এত গোরু আসে কোত্থেকে?

তার কথায় তিনজনে হেসে উঠল।

মোহন বলল—আস্তে, মুকুন্দ শুনতে পাবে। তারপরে বলল, কাঁঠাল চটপট শেষ হলেই তো ভালো, শীতকাল এসে পড়বে। তখন খেজুরের রস—কি বলিস কুসমি।

খেজুরের রসের আশ্বাসে কুসমির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দীপ্তিনারায়ণ বলল—আমিও খাই।

মোহন বাৎসল্য-ও অনুগ্রহ-মিশ্রিত স্বরে বললে—খাবে বই কি? দীপ্তিবাবু না থাকলে কি ভালো লাগে।

এই তিনটি বালক-বালিকাতে মিলে একটি দল গড়েছিল। শীতকালে মাঠে মাঠে ঘুরে খেজুর রস খাওয়া ছিল এদের এক আনন্দ। সকাল বেলায় খেজুর রসের কলসীটি খুলে নিয়ে গেলেও নল দিয়ে রস গড়াতে থাকে—তিনজনে সেখানে গিয়ে সমবেত হত। একজনে গাছের উপর থেকে সমলোভী পাখি উড়িয়ে দিত, আর একজনে লক্ষ্য রাখত কেউ দেখতে না পায় কিংবা মুকুন্দ যাতে না এসে পড়ে, তৃতীয়জনে পতনোন্মুখ রসের ফোঁটার আশায় জিব মেলে নীচে দাঁড়িয়ে থাকত। একটা করে ফোঁটা জিবের উপরে পড়ে, আর সেই সরসস্পর্শে তার চোখে মুখে সে কি চরিতার্থতা! এই রকমে পালাক্রমে তাদের রস-খাওয়া হত। এমনি ভাবে তারা সকালে মাঠে মাঠে গাছে গাছে ঘুরে রস খেয়ে বেড়াত!

তিনজনের হাত মুখ সমান চলছে—তিনজনেই তন্ময়। এমন সময়ে কুসমি হঠাৎ অস্ফুটস্বরে বলে উঠল—মোহনদা—

কি রে?

—মুকুন্দ আসছে—

তিনজনে দেখতে পেল মুকুন্দ এসে পড়েছে, আর পালাবার পথ নেই। মুকুন্দকে করে ওদের বড় ভয়।

মুকুন্দ বৃদ্ধ, কালো বলিষ্ঠ দেহ, মাথাভরা টাক, রোদে চকচক করে, গোঁফ-জোড়াটি পাকা। মোহন আড়ালে তার উল্লেখ করে বলত, 'গোঁফজোড়াটি পাকা,—মাথায় কনক চাঁপা।'

মুকুন্দ চীৎকার করে উঠল—তাই আমি দীপ্তিকে খুঁজে পাইনে। এই রোদের মধ্যে এখানে আসা হয়েছে—অসুখ করবে যে!

তারপরে মোহনের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমিই এই নাটের গুরু!

মোহন কয়েকটা লিচু নিয়ে বলল—মুকুন্দদা খাও, আমি নিজে পেড়েছি।

মুকুন্দ হেসে ফেলল, বলল, আবার বাহাদুরি করা হচ্ছে—আমি নিজে পেড়েছি, পড়ে যদি হাতপা ভাঙত!

মোহন বলল—তবে জগন্নাথ হয়ে যেতাম। তোমাকে আর শ্রীক্ষেত্রে যেতে হত না, এখানে বসেই দেখতে পেতে।

শ্রীক্ষেত্রে যাওয়া হয়নি বলে মুকুন্দ সর্বদা লোকের কাছে আক্ষেপ করত।

মুকুন্দ বলল, তোকে একদিন জগন্নাথই হতে হবে, যে দুরন্ত। আমার ভাবনা দীপ্তিবাবুর জন্যে, ওকে যে লাঠি ধরতে হবে, জগন্নাথ হলে ওর্ চলবে না।

তারপরে বলল—যা, এখন বাড়ি যা, লিচু তো শেষ হয়েছে। চলো, দীপ্তিবাবু, বাবু খোঁজ করবে এখনি।

এই বলে মুকুন্দ দীপ্তির হাত ধরে কুঠির দিকে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ ফিরে এসে মোহনকে বলল—দেখ, তুই যা করিস, করিস, কিন্তু কুসমিকে যে আনিস—তার ফলে কি হবে তা কি জানিস না?

মোহন শুধোলো—কী হবে?

মুকুন্দ বলল—জানতে পারলে ডাকুরায় তোর হাড় ভেঙে দেবে!

মোহন বলল—শুধু জানতে পারলেই হয় না, ধরতে পারা চাই।

মুকুন্দ বলল—তোকে ধরতে না পেরে শেষকালে যে মেয়েটাকে মারধোর করবে।

এবারে মোহনের মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। সে বলল, চল, কুসমি তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কুসমি বলল—না মোহনদা, আমি নিজেই যেতে পারব, তোমাকে আর সঙ্গে যেতে হবে না।

—তবে চল, প্রাচীরটা পার করে দিই।

তখন মোহন ও কুসমি প্রাচীরের দিকে গেল, আর দীপ্তিকে নিয়ে মুকুন্দ কুঠির ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

# চলন বিল

রাজসাহী ও পাবনা এই দুটি জেলার সীমান্ত জুড়িয়া চলন বিল নামে একটি সুবৃহৎ জলময় ভূখণ্ড আছে। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার গ্রন্থ হইতে চলন বিলের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কতক অংশ উদ্ধৃত হইল।

রাজসাহী ও পাবনার সীমান্তবর্তী একশত চল্লিশ বর্গমাইল জলময় নিম্নভূমি চলন বিল নামে পরিচিত। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নাটোর মহকুমার শিংড়া থানার নিকট হইতে পাবনা জেলার অষ্টমনিষা গ্রাম পর্যন্ত এই বিল বিস্তৃত। রাজসাহী ও দিনাজপুর জেলা হইতে জল সংগ্রহের দ্বারা পুষ্টকায়া ও বর্ধিততেজা আত্রেয়ী নদী চলন বিলে আপন জলরাশি সমর্পণ করিতেছে। বড়ল নদীযোগে বিলের অতিরিক্ত বারিপ্রবাহ বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়া পড়ে। পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডের তুলনায় বিলের জমি নীচু। ব্রহ্মপুত্রে বন্যা আসিলে বড়লের স্রোত পিছু হটিতে বাধ্য হয়, কাজেই বন্যা না কমিয়া যাওয়া অবধি বিলের জল বাহির হইবার পথ না পাইয়া স্থির হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে বিলের অধিকাংশ শুকাইয়া যায়, কেবল পনেরো বর্গমাইল মতো স্থান জলময় থাকিয়া যায়। পূর্বে এই বিলটি চারশত একুশ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া ছিল বলিয়া মনে হয়—কিন্তু কালক্রমে পদ্মার শাখা বড়লের ও অন্যান্য নদীর দ্বারা আনীত পলিস্তরে অধিকাংশ স্থান ভরাট হইয়া উঁচু হইয়া গিয়াছে। ১৯০৯ সালে চলন বিল সম্বন্ধে তদন্তকারী কমিটি যে রিপোর্ট দেয় তাহাতে জানা যায় যে বিলের আয়তন কমিয়া একশ বিয়াল্লিশ বর্গমাইলের মতো হইয়াছে, বাকি অংশে জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া চাষবাস হইতেছে। ইহার মধ্যেও মাত্র তেত্রিশ বর্গমাইল স্থান সারা বৎসর জলময় থাকে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রতিবৎসর ২২২½ মিলিয়ন ঘনফুট পলি নদীসমূহ দিয়া বিলে প্রবেশ করে, আর ৫৩ মিলিয়ন ঘনফুট পলি নদীপথে বিলের সীমানা ত্যাগ

করে। অবশিষ্ট ১৬৯২ মিলিয়ন ঘনফুট পলি প্রতিবৎসর বিলে স্থিতি পায় এই পলিকে ১৪২ বর্গমাইল স্থানে সমানভাবে চালাইয়া দিলে বিলের গর্ভ প্রতিবৎসর অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু হওয়া সম্ভব। ১৯১০ সালে বিলের অবস্থা পুনরায় তদন্ত করা হইলে প্রকাশ পায় যে বিলের আয়তন আরও কমিয়া আসিয়াছে। পাবনা জেলার অন্তর্গত অংশে চাষবাস হইতেছে, আর রাজসাহী জেলার অংশে জলের গভীরতা গড়ে একফুট মাত্র। ১৯১৩ সালে আবার তদন্ত হইলে দেখা যায় মাত্র বারো হইতে পনেরো বর্গ মাইল মাত্র স্থানে সারা বৎসর জল থাকে। আরও দেখা যায় যে চারি দিকের পাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, বৈশাখ মাসে জলের গভীরতা গড়ে নয় ইঞ্চি হইতে ১৮ ইঞ্চির অধিক নয়। এই সব তদন্তের ফল হইতে বুঝিতে পারা যায় চলন বিলের গর্ভ অতিশয় দ্রুত ভরাট হইয়া উঠিতেছে, শুষ্ক অংশে গ্রাম বসিতেছে। চলন বিলের নিকটবর্তী অঞ্চলে যে-সব মন্দির, অট্টালিকা, পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে এক সময়ে তথায় সমৃদ্ধির অভাব ছিল না। হাণ্ডিয়াল গ্রামটিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ের একটি কুঠি ছিল, বহু দীর্ঘিকা-সমন্বিত সমাজ গ্রামে মোগল বাদশার একটি কাছারি ছিল, মরিচ-পুরাণে একজন ফৌজদার থাকিত, অষ্টমনিষা, কোলা, গুয়াখাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বহুসংখ্যক চতুষ্পাঠী ও বহুতর পণ্ডিত ব্যক্তি এক সময়ে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কালক্রমে বিল শুকাইয়া আসাতে এবং নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়াতে সমৃদ্ধি কমিয়া আসিল, স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে থাকিল, ব্যবসা-বাণিজ্য লোপ পাইল, সর্বাঙ্গীণ অবনতির এই প্রক্রিয়া এখনও সেখানে সক্রিয়। ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে সাঁওতাল জাতির লোক আসিয়া এখানে সেখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডাকাত ও ডাকাতি চলন বিলের বৈশিষ্ট্য—রামা, শ্যামা ও বেণী রায় নামে তিনজন দুর্ধর্ষ ডাকাতের কাহিনী এখনও সেখানে জীবন্ত স্মৃতি। ১৮২৮ সালের গেজেটিয়ার হইতে জানা যায় যে, হাণ্ডিয়াল গ্রামের চারিদিকে ঘন জঙ্গল ও জনশূন্য মাঠ ডাকাত থাকিবার উপযুক্ত স্থান। চলন বিলে ডাকাতশাসন করিবার উদ্দেশ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ষোল দাঁড়ের

ছিপ এবং পুলিশ জমাদারের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই সময়কার রিপোর্টে চলন বিলকে বাংলাদেশের বৃহত্তম জলময় ভূমিখণ্ড বলা হইয়াছে।

জাদুঘরের মৃত জানোয়ারের দেহাস্থি দেখিয়া যদি তাহার প্রতিটি মাংসপেশীতে সক্রিয় দুর্দান্ত বন্যজীবন বুঝিতে পারা যায়, তবে উপরের রিপোর্ট হইতেও চলন বিলকে বুঝিতে পারা যাইবে। বস্তুত এ বর্ণনা কাগজখণ্ডে অঙ্কিত মানচিত্রের চেয়েও অকর্মণ্য, মানচিত্রেও একটুখানি নীলাভা থাকে, এই বর্ণনাতে তাহারও অভাব। তবু তো কয়েক টুকরা হাড় জুড়িয়া মানুষে প্রাচীন ম্যামথের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পায়, তবু তো মানচিত্রের নীলাভায় মানুষে রূপকে সৃষ্টি করে। উপরের এই বর্ণনা রূপকও নয়, নিতান্তই রিপোর্ট।

বর্তমানের মুষ্টিমেয় চলন বিলের কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে। আমরা সওয়া শো বছর আগেকার কথা বলিতেছি—তখনই চলন বিল বাংলাদেশের বৃহত্তম জলময় অংশ ছিল, যতই প্রাচীনতর কালে অগ্রসর হওয়া যাইবে ততই দেখা যাইবে বিলের আয়তন ক্রমে বৃহত্তর হইতেছে। অনুমান করিলে অন্যায় হইবে না যে চার শত বৎসর পূর্বে এই বিলটি রাজসাহী, পাবনা, বগুড়ার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিত। ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সঙ্গমস্থলের পশ্চিমোত্তর অংশে চলন বিল বিরাজিত ; অবস্থান, আকৃতি, প্রকৃতি দেখিয়া চলন বিলকে উত্তর বাংলার নদনদী-স্নায়ুজালের নাভিকেন্দ্র বলিল অত্যুক্তি হইবে না। চলন বিলের গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য নদনদীময় বঙ্গদেশকে জানা আবশ্যক—বাংলাদেশের মধ্য দিয়া কয়েকটি নদনদী প্রবাহিত না বলিয়া বলা উচিত, কয়েকটি নদনদীর মাঝে মাঝে যে চরগুলি পড়িয়াছে—তাহারই সমষ্টির নাম বাংলাদেশ।

*

নদীময় বঙ্গ দুইটি সুবৃহৎ ত্রিভুজ, এই ত্রিভুজ দুইটি আবার অজস্র উপনদী ও শাখানদীর দ্বারা বিভক্ত—এই নদীসমূহের মধ্যে কোমল শ্যামল ভূখণ্ডই বঙ্গদেশ। গঙ্গানদী বঙ্গদেশে প্রবেশ করিবার পরেই রাজমহল পাহাড়ের

পূর্বদিকে পাক খাইয়া সরলভাবে দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে—ইহাই ভাগীরথী, গঙ্গানদীর পশ্চিমতম শাখা : গঙ্গানদীর পূর্বতম শাখা মেঘনা নামে পরিচিত, মেঘনা হইতেছে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মূল মেঘনার সম্মিলিত প্রবল বারিপ্রবাহ। ভাগীরথী ও মেঘনা একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু, বঙ্গোপসাগরের তীরভূমি ইহার তৃতীয় বাহু।

নদীতত্ত্ববিদেরা বলেন যে এক সময়ে, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে, ভাগীরথীর পথেই গঙ্গার মূল বারিরাশি সমুদ্রে পৌঁছিত কিন্তু কালধর্মে ভাগীরথীর সে প্রাধান্য আজ আর নাই—এখন গঙ্গার প্রবলতম শাখা, সমুদ্রাভিযানের প্রধান প্রবাহ মেঘনা নদী। চারি শত বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহা আকস্মিক ভাবে না ঘটিয়া ক্রমিক ভাবে ঘটিয়াছে—গঙ্গার মূল প্রবাহ ভাগীরথী-গর্ভ ত্যাগ করিয়া অনেকগুলি নদীপথে গড়াইতে গড়াইতে চারিশত বৎসর পরে মেঘনার খাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভাগীরথী ও মেঘনার মধ্যে জলাঙ্গী, ভৈরব, মাথাভাঙা, কুমার, আড়িয়াল খাঁ, তেঁতুলিয়া প্রভৃতি যে সব ছোট বড়, আপাতত অপ্রধান নদী বিদ্যমান—এক সময়ে, ক্রমিকভাবে এইগুলির প্রত্যেকটিই গঙ্গার মূল প্রবাহরূপিণী ছিল। এক-একটি খাত ত্যাগ করিয়া গঙ্গা ক্রমশ অধিকতর পূর্ববাহিনী হইতে হইতে মেঘনার খাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি নদীই স্বৈরিণী গঙ্গার স্থানপরিবর্তন-চিহ্ন। গ্রীষ্মের রাতে বিস্তীর্ণ শয্যায় রূপসী যখন বিশ্রদ্ধভাবে গড়াইতে থাকে তখন যেমন সে শয্যার উপরে দেহচিহ্ন রাখিয়া রাখিয়া যায়, গঙ্গাও তেমনিভাবে বর্তমানের শুষ্কপ্রায় নদীমালায় স্বদেহলেখা রাখিয়া গিয়াছে। বাংলার শ্যামল কোমল ভূমি নিদ্রালসা নদীর বিশ্রব্ধ বিশ্রামের শয্যা। রূপসী যখন শয্যার অপর প্রান্তে পৌঁছায়, তখন সে আবার সুখালসে গড়াইতে গড়াইতে পূর্বপথে ফেরে—এবং অবশেষে এক সময়ে শয্যার অপর প্রান্তে আসিয়া পৌঁছায়। নদীতত্ত্ববিদেরা বলেন যে গঙ্গাপ্রবাহের শেষতম খাত মেঘনা, পূর্বদিকে আর তাহার অগ্রসর হইবার পথ নাই, ভূমির কাঠিন্য অন্তরায়। তাঁহারা বলেন গঙ্গাধারার আবার পশ্চিমবাহিনী হইবার সময় সমাগত। পূর্বতম নদীখাতগুলির

পথে একে একে তাহার মূল বারিরাশি আবার প্রবাহিত হইতে থাকিবে, একে একে আড়িয়াল খাঁ, কুমার, জলঙ্গী প্রভৃতি উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে, অবশেষে, অনেক দিন পরে, হয়তো চার শতাব্দী পরে, কে বলিতে পারে, গঙ্গার মূল প্রবাহ আবার ভাগীরথী-গর্ভে ফিরিয়া আসিবে—গঙ্গার পার্শ্বপরিবর্তনের দ্বারা শয্যা পরিমাপ পরিসমাপ্ত হইবে। বাংলার নিম্নমুখী নদী-ত্রিভুজের ইহাই বিবরণ।

বাংলাদেশে আর-একটি নদী-ত্রিভুজ আছে, সেটি উধ্বর্মুখী—হিমালয় তাহার পাদদেশ—গঙ্গা তাহার একটি ভুজ, আর একটি ব্রহ্মপুত্র ( যমুনা ), গোয়ালন্দের অদূরে ইহাদের সঙ্গম। এখানকার ভূ-প্রকৃতি কিঞ্চিৎ রুক্ষ, কাজেই নদীমালা তেমন ভাবে পাশ ফিরিবার সুযোগ পায় নাই। ব্রহ্মপুত্র কিছুদূর পশ্চিমগামী হইয়া বর্তমান খাতে আসিয়া যমুনা নাম ধারণ করিয়াছে। হিমালয়ের বিবরনির্গত তিস্তা, তোরসা, করতোয়া প্রভৃতি নদীগুলি ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া আত্মমজ্জন করিয়া ধন্য হইয়াছে। যমুনা নামে খ্যাত যে ব্রহ্মপুত্র তাহা নিতান্তই আধুনিক নদী, মেজর রেনেলের মানচিত্রে তাহার চিহ্ন নাই। খুব সম্ভব এখানে একটা উপনদী মাত্র ছিল—এবং অধুনা লুপ্তপ্রায় করতোয়া প্রাচীনকালে দক্ষিণ দিকে আরও অনেকটা অগ্রসর হইয়া পদ্মাতে ( গঙ্গাতে ) পড়িত। তারপরে যমুনা যখন প্রবল হইয়া উঠিল – করতোয়ার যাত্রাপথ হ্রাস হইয়া গেল, গঙ্গা পর্যন্ত পৌঁছিবার প্রয়োজন আর তাহার রহিল না, সে ব্রহ্মপুত্রে মিশিল।

উধ্বর্মুখী ও নিম্নমুখী দুই নদীত্রিভুজের অনেকটা স্থান ধরিয়া একটা বাহু সমান। গঙ্গার যে স্থান হইতে ভাগীরথীর বেণী মুক্ত হইয়াছে—আর গোয়ালন্দের নিকটে আসিয়া যেখানে ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মায় যুক্তবেণী ঘটিয়াছে, এ দুইয়ের মধ্যবর্তী গঙ্গা বা পদ্মা দুইটি ত্রিভুজের একটি সমানবাহু। এই সমবাহুর উত্তরে রাজসাহী ও পাবনা জেলা। ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা মিলিত হইয়া যে কোণের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহাই পাবনা জেলা—এই পাবনা জেলার অনেকটা স্থান জুড়িয়া চলন বিল। ব্রহ্মপুত্র প্রবল হইয়া উঠিবার আগে

করতোয়া উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান নদী ছিল, করতোয়া বর্তমানের মতো ব্রহ্মপুত্রে না মিশিয়া যে অনেকটা অগ্রসর হইয়া পদ্মায় পড়িত, সে কথা আগেই বলিয়াছি। করতোয়ার মতো বৃহৎ নদী নিশ্চয় নিঃসঙ্গ ছিল না, নিশ্চয়ই বহু অখ্যাত ও অজ্ঞাত এবং অধুনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত উপনদী ও শাখা-নদী করতোয়ার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িত। কিন্তু কালক্রমে করতোয়ার অধিকার হ্রাস পাইল—ব্রহ্মপুত্র অর্ধপথে তাহাকে গ্রাস করিল কিন্তু তাহার ও তাহার সঙ্গিনী নদীগুলির খাত এত সহজে লোপ পাইবার নয়। অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে সুবিস্তীর্ণ চলন বিল সেই খাত। বস্তুত পাবনা জেলার ত্রিকোণ নিম্নভূমি পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া গঠিত তাই সেখানে এত বিল, এত জলা, এত নদীনালা, বর্ষাকালে জলমগ্নপ্রায়, অন্যসময়েও প্রায় জলমগ্ন।

রাজসাহী জেলার উত্তর ও পশ্চিম অংশ উচ্চ ও কঠিন—কিন্তু তাহার দক্ষিণ-পূর্বের ভূপ্রকৃতি পাবনা জেলার অনুরূপ। রাজসাহী জেলার অনেকটা অংশও বিলময়, জলময়। বস্তুত চলন বিলের বেশীর ভাগই রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। এই কথাগুলি মনে রাখিয়া বাংলাদেশের একখানা মানচিত্রের দিকে তাকাইলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে চলন বিলের অবস্থান সত্যই বিচিত্র—এই ভূমধ্যজলাশয়কে নদীময় বঙ্গের সুগভীর সুবিস্তীর্ণ নাভিকেন্দ্র বলা যাইতে পারে। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে আজকার চলন বিল দেখিয়া কোনমতেই একশত বৎসর আগেকার অবস্থা ধারণা করা যাইবে না। আমরা একশো বছরের আগেকার কথা বলিতেছি, তাহার পূর্বে অন্তহীন কাল পড়িয়া আছে।

চলন বিল এখন স্রোতহীন, গতিহীন, লক্ষ্যহীন স্থাণু জলাশয়—কিন্তু এক সময়ে এই ভূখণ্ড ব্যাপিয়া বহু নদীর সম্মিলিত বিপুল বারিরাশি প্রবাহিত হইত। চলন বিল সেই সব মৃত নদীর প্রেতাত্মা—এখন সে মানব সংসারের অতীত, এখন সে মানব সম্পর্কের বাহিরে, সেইজন্যই সে ভয়ঙ্কর।

চলন বিল বহু নদীর শ্মশান, মৃত নদনদীর পঞ্চমুণ্ডি আসনে এক মহাসাধক এখানে উপবিষ্ট। তাহার সমস্তই বিচিত্র, সমস্তই বিপরীত। সে মানব সংসারের হইয়াও সংসারের বাহিরে আসীন, সে মৃতদেহের উপরে বসিয়া জীবনের সাধনায় নিরত; যে জলের স্বভাবই গতি, এখানে স্বধর্ম হারাইয়া সে স্থাণুত্ব লাভ করিয়াছে; চলন বিল সম্পূর্ণ অচল। অচল কেন্দ্রের উপরে ঘূর্ণমান বিষ্ণুচক্র যেমন সতীদেহকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছিল, আত্ম-আবর্তিত এই জলরাশিও তেমনই কোমল পৃথিবীর অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রামসমূহের সৃষ্টি করিয়াছে, সতীদেহের ছিন্ন অংশ পীঠস্থান, চলন বিলের ভূখণ্ডও এক মহাপীঠস্থান, এখানে সংসার সম্পর্কের শবসাধনা চলিতেছে।

সত্যই এ স্থান বিচিত্র এবং বিপরীত। মানচিত্রকার ইহার রহস্য কতকটা অনুমান করিয়াছে—তাই ইহাতে দিয়াছে সমুদ্রের নীলাভা! চলন বিল সাগর বইকি, প্রকৃত ভূমধ্য-সাগর! সমুদ্রের হারাইয়া-যাওয়া জ্ঞাতি চলন বিল! মানচিত্রের সমুদ্র নীল কিন্তু বস্তুত সে কালো; চলন বিলের বারিরাশিও কালো; সমুদ্র নদীমালার বিসর্জনস্থান, চলন বিলেও নদনদী আসিয়া পড়িয়াছে; সমুদ্র মুক্তার আকর, চলন বিলেও মুক্তার ব্যাপারী ডুব দিয়া মুক্তা তোলে; তবে চলন বিলে জোয়ারভাঁটা নাই—মহাসমুদ্রে জোয়ারভাঁটার লীলা কি প্রত্যক্ষ?

চলন বিল দিনমানে অন্ধকার—কুহেলিতে, বিষবাষ্পে এবং মেঘে; চলন বিল রাত্রিবেলা আলোকিত, শত শত আলেয়ার দ্যুতিতে এবং নিশাচর ডাকাতের ক্ষিপ্রগামী ছিপ নৌকার শিকারসন্ধানী দীপ্তিতে; এখানে বিনা মেঘে বৃষ্টি আসে, বিনা ঝড়ে ঢেউ ওঠে, বিনা ঢেউয়ে নৌকা তলাইয়া যায়, আর বিনা সঙ্কেতে কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝার অতর্কতায় দুঃসহ দিগন্তর হইতে ডাকাতের ছিপের বহর নিশ্চিন্ত যাত্রীর ঘাড়ের উপরে আসিয়া

পড়িয়া সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া লুটিয়া-পুটিয়া পালায়, যাত্রীর হাহাধ্বনিকে ডাকাতের হাসি ধিক্কার দিতে থাকে। মানুষের শিকার এখানে মানুষ, পশুতে মানুষে মৈত্রী করিয়া এখানে মানুষ শিকার করিয়া ফেরে। এখানকার সমস্তই বিচিত্র!

যেদিন ঝড় ওঠে, ঝড় এখানে অবিরল, সকাল বেলাতেই কেমন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা দেখা দেয়। যত বেলা বাড়ে সমস্ত প্রকৃতি চিত্রার্পিত হইয়া আসে। জলে ঢেউটি থাকে না, গাছে পাতাটি নড়েনা, ডালে পাখিটি ডাকে না, মাছরাঙা বেলা পড়িবার আগেই পালায়, পুঁটিমাছের দল গভীর জলতলে প্রবেশ করে, কেবল আকাশ পরিস্কৃন্ন উজ্জ্বল শ্বেত পাথরের মেঝের মতো নির্মল এবং কঠিন। বেলা পড়ে, সন্ধ্যা ঘনায়, সমস্ত প্রকৃতি একটি পূর্ণ পরিপক্ক ফলের মতো ফাটিয়া পড়িবার মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, দিগন্ত মেঘে ভারী হয়, মেঘে বিদ্যুৎফলার ছোট ছোট ল-ফলা চমকায়, আর দূর পশ্চিমের আকাশ হইতে হাতির শুঁড়ের মতো কী একটা বস্তু বিলের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। ক্বচিৎ গৃহী, চকিত চাষী ওইটি দেখিবামাত্র আর্তস্বরে বলিয়া ওঠে আজ আর রক্ষা নাই! হাতির শুঁড় নেমেছে! কেহ আল্লা বলে, কেহ কালী বলে, সকলেই বলে আজ আর রক্ষা নাই! হাতির শুঁড় নামিয়াছে।

হাতির শুঁড় ক্রমে স্পষ্ট হইয়া ওঠে, আগাইয়া আসিতেছে ধূসর কালো. আকাশের চাতালে-ভূতলে স্পৃষ্ট লম্বমান দোলমান একটা বস্তু। জলস্তম্ভ! জলস্তম্ভ সমুদ্রের বৈশিষ্ট্য—চলন বিল যে সমুদ্র! জলস্তম্ভ মেঘ ও জলের, আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গমলীলা; আকাশের মেঘ খানিকটা নামিয়া আসে, পৃথিবীর জল খানিকটা ঠেলিয়া ওঠে, ঝড়ের বাতাস দুইয়ের মিলন ঘটাইবার ঘটক! তখন অন্তরীক্ষের মরুৎগণ জাগিয়া উঠিয়া বিলের জনহীন তরল প্রান্তরে দাপাদাপি করিয়া বেড়ায়! প্রচণ্ড প্রভঞ্জন কিন্তু কিছুই ভাঙে না, ভাঙিবে কি? মানুষের গড়া ঘরবাড়িই ভাঙিতে পারে। শত শত ঢেউ ওঠে আর ভাঙে কিন্তু সে ভাঙনের চিহ্ন থাকে কি? তখন ঝড়ে জলে বাতাসে বিদ্যুতে বজ্রে মেঘে করকায় বৃষ্টিতে আকাশে বিলে এক ত্রাহি ত্রাহি ধ্বনি!

নন্দীর অনবধানতায় ধূর্জটির কপালভাণ্ড নিঃশেষ করিয়া প্রমথগণ আজ সুরাসার পান করিয়া প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে, কে আজ আর কাহার কথা শোনে! চকিত নন্দী তাহার বিদ্যুৎঝলসিত হেমবেত্রখানায় বারংবার শাসন ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে—কিন্তু কে আজ কাহার কথা শোনে! অবশেষে ক্ষিপ্ত ধূর্জটি জলস্তম্ভের জটা উড়াইয়া আসিয়া নিজেই ক্ষ্যাপার দলে যোগ দিলেন! কত রাত্রি পর্যন্ত সে লীলা চলে—কে বলিতে পারে! দেবতার আসরের দর্শক কি মানুষে?

আবার বর্ষার প্রারম্ভে বিলের জল ফাঁপিতে শুরু করে—রাতারাতি জল বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ধানের গাছ বাড়ে, জলে আর শস্যে বিচিত্র আড়াআড়ি পড়িয়া যায়! অবশেষে শস্যের প্রতিযোগিতার ধৈর্যচ্যুতি করিয়া জল হঠাৎ বাড়িয়া যায়—ধানের গাছ মাথা জাগাইতে পারে না—চাষী বুক চাপড়াইয়া মরে। ক্রমে পূর্ব দিক হইতে যমুনার কালো জল বিলে ঢোকে—তারপরে আসে পশ্চিম দিক হইতে বড়ল নদীর খাতে পদ্মার ঘোলা জল—আর আরও পরে আসে উত্তর দিক হইতে আত্রেয়ীর গেরুয়া জল—প্রকৃতি তিন দিক হইতে বিলকে আক্রমণ করিয়া বিভ্রান্ত করিয়া দেয়—তখন বিলের থমথমে ভাব—জল বাহির হইতে না পারিয়া পূর্ণতার শেষ প্রান্তে পৌঁছায়!

ক্রমে বর্ষা যায়, জল শুকায়, ডাঙা জাগে, চাষ হয় চাষী দেখা দেয়। শীতকালটাই চলন বিলে মানুষের সময়। রাক্ষসপুরীর রাক্ষসেরা ঘুমাইয়া পড়িলে মানুষ রাজপুত্র জাগিয়া উঠিয়া রাক্ষসগণের মৃত্যুবাণ সন্ধান করে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। শীতকালে বিল ঘুমাইয়া পড়িলে গুটি গুটি মানবপুত্রগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, মানব-সংসারগ্রাসী এই জলময় রাক্ষসের মৃত্যুবাণ অনুসন্ধান করে। না জানিয়াও বিলের মৃত্যুবাণ সে ব্যবহার করিতেছে—বিলও না জানিয়া তিলে তিলে মরিতেছে—চলন বিলের মৃত্যুবাণ লাঙলের ফলা।

*

বাংলাদেশের নদনদীর রহস্য যে জানিতে না পারিয়াছে সে বাংলাকে জানিবে কেমন করিয়া? এ দেশের অসংখ্য নদনদীমালায় তাহার প্রাণ নিত্য তরঙ্গিত হইতেছে, জোয়ারভাঁটায় আন্দোলিত হইতেছে, বর্ষায় কূলপ্লাবী হইতেছে, শীতে স্তিমিত এবং গ্রীষ্মে বিবরপ্রবিষ্ট হইতেছে। কৈলাসের ভৈরবীচক্র ভাঙিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত নদনদী জটা মুক্ত করিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র, ভৈরবীচক্রসমুত্থিত নদ ও নদী সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া চলনবিলের প্রান্তে আসিয়া অভিসারসঙ্গমে সম্মিলিত এবং তারপরে বর্ধিতবেগে, অদৃশ্য দুকূলরূপে যাত্রাচক্রের সমাপনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রাভিমুখে ছুটিয়াছে। বঙ্গোপসাগরের কোমল তীরভূমিতে নদী ও সমুদ্রের বাসর। নদী নারী, সমুদ্র পুরুষ; ঝড়ের নাগরদোলায় দুজনের মিলন; পেলব পলিময় বঙ্গ তাহাদের সন্তান; অসংখ্য ব-দ্বীপরূপে নিত্য নিয়ত কত সন্তান এখনো জন্মলাভ করিতেছে। অন্যান্য দেশ জাদুঘরের জীব, বঙ্গদেশ এখনো সজীব।

বাংলার নদীময় প্রাণচিত্রের দিকে তাকাইলেই লক্ষ্য হইবে যে নদীগুলির গতির মধ্যে একটা অকারণ আতিশয্য আছে। গঙ্গানদী অন্য প্রদেশে শান্ত এবং নির্দিষ্টপথগা কিন্তু বাংলাদেশে প্রবেশ করিবামাত্র দেশের গুণে কেমন যেন কুলত্যাগিনীরূপে দেখা দিয়াছে, ঝোঁকের মাথায় ক্রমশ পূর্ব হইতে অধিকতর পূর্ব-বাহিনী হইয়া উঠিতে উঠিতে ভারতের পূর্বতম প্রান্তে গিয়া মাথা কুটিয়া মরিতেছে। এমন আতিশয্য তাহার দীর্ঘপথের আর কোনখানে দৃষ্ট হয় না। বাংলার গঙ্গা অতিশয়রূপিণী।

বাঙালীর চরিত্রেও এই আতিশয্য বর্তমান। সে ঝোঁকের মাথায় কাজ করে, সে একই সঙ্গে উত্তম ও অধমের চরমে পৌছিতে পারে, বাঙালী দেশ-প্রেমিক ও বাঙালী গোয়েন্দা দুইজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ, মধ্যপথ বাঙালীর পথ নয়। সে ভাগীরথী হইতে গড়াইতে গড়াইতে মেঘনায় গিয়া পৌছায়—আর অগ্রসর হইবার উপায় না দেখিলে পুনরায় পূর্বতম চরমে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ তাহাদের

নদীমালার ন্যায় নির্দিষ্টপথগামী—তাই বাংলাদেশের সঙ্গে তাহাদের মেলে না,. তাহারা বাংলাদেশকে বলে চপল, বাংলাদেশ তাহাদের বলে স্থবির। চপলে স্থবিরে মিলিবে কি উপায়ে? আবার না মিলিলেই উপায় কি?

অন্যান্য দেশ হয় নারী নয় পুরুষ কিন্তু নদীসমুদ্রসঙ্গমের দেশ বাংলা একাধারে নরনারীর অর্ধনারীশ্বররূপে সে মহাযোগী, নরনারীর পৃথকরূপে সে মহাভোগী। যোগ ও ভোগের দুই কোটিময় জীবনধনুকে জ্যারোপণ বাঙালীর জাতীয় সাধনা। কঠিনতম এই সাধনা, তাই দুর্লভতম তাহার সিদ্ধি। সিদ্ধি দ্বারা বাঙালীকে বিচার করিলে চলিবে না, সাধনার আন্তরিকতার দ্বারাই তাহাকে বিচার করিতে হইবে।

অর্ধনারীশ্বরের সাধক বাঙালী নদীসমুদ্রসঙ্গমে তাহার আরাধ্য দেবতাকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে—নদী নারী, সমুদ্র পুরুষ। আর বাংলার বিলসমূহের শ্রেষ্ঠ চলন-বিল নারীও নয়, পুরুষও নয়, সে নপুংসক, তাই সে রহস্যময়, তাই সে অভাবিত সমস্যার আকর। সে স্ত্রীপুরুষের নেতিবাচক, তাহাকে সংসারের জোড় গণনায় মেলে না—তাই সে স্বতন্ত্র এবং বেমানান। সে সংসার আকাশের ত্রিশঙ্কু, একাধারে সে প্রশ্ন ও বিস্ময়, সে নিতান্তই পূর্বাপরহীন। এমন বস্তুকে লইয়া কি করা যায়?

চলন বিলের মাঝে ক্ষুদ্র একটি দ্বীপে বেণীরায়ের ভিটা নামে একটা উঁচু পোড়ো জমি আছে। তার কাছেই আর একখণ্ড উঁচু জমিকে লোকে ডাকাতি কালীর আসন বলিয়া থাকে। কথিত আছে যে এখানে বেণীরায় কালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—কিন্তু বর্তমানে কালী বা কালী মন্দির বা বেণীরায়ের অপর কোন চিহ্ন কিছুই নাই। কেবল দুইটুকরা উচ্চ জমি পড়িয়া আছে। তবু বিলের অধিবাসীদের কাছে ডাকাতি কালীর আসন এখনো জাগ্রত

পীঠস্থান। কালীপূজার সময়ে লোকে এখানে কালীমূর্তি তৈয়ারি করিয়া পূজা করে, একশ এক পাঁঠা বলি দেয়, মহিষ বলি দেয়, অনেকে কানাঘুষা করে যে সমস্ত বলি শেষ হইয়া গেলে অতিশয় গোপনে একটি নরবলি হয়।

ডাকাতি কালীর আসনকে লোকে এমন জাগ্রত পীঠস্থান ভাবে যে এখানে কেহ কোন শপথ করিলে তাহার অন্যথা করিতে ভরসা পায় না। ডাকাতেরা বড় রকম ডাকাতি করিবার পূর্বে এখানে প্রণাম করিয়া যায়, আর ফিরিবার পথে সর্বাগ্রে এখানে আসিয়া দেবীর অনুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ একটি ছাগ বলি দিয়া তবে বাড়ি ফেরে। ডাকাতি কালীর আসন চলন বিলের জীবনে একটি প্রধান আশাভরসার স্থান।

বেণীরায়ের ইতিহাস ও তাহার কালী প্রতিষ্ঠার কারণ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে—"হিঃ ৯৯৭ সালে মানসিংহ বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। উড়িষ্যার পাঠানদিগকে দমন, বেণীরায়ের দস্যুতা নিবারণ, কোচবিহারের মহারাজের সহ সন্ধিস্থাপন এবং যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন এই চারিটি মানসিংহের বাংলাদেশে প্রধান কার্য।

"বেণীমাধব রায় একজন কুলীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। বোধহয় সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। সেইজন্য পরে তাঁহার 'পণ্ডিত ডাকাত' নাম হইয়াছিল। তাঁহার এক পত্নী পরমসুন্দরী ছিল। একজন মুসলমান সর্দার সেই সুন্দরী অপহরণ করায়, বেণীরায় সংসার ত্যাগ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি নানাজাতীয় কতকগুলি হিন্দু চেলা জোটাইয়া একদল ডাকাত বা সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি চলন বিল মধ্যে একটি দ্বীপে সেই দল লইয়া বাস করিতেন। এইস্থলে তিনি 'যবনমর্দিনী' নামে এক কালীমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নানাদেশ হইতে মুসলমান ধরিয়া আনিয়া সেই কালীর সম্মুখে বলিদান করতঃ তাহাদের দেহ চলন বিলে ফেলিয়া দিতেন। কেবল নিহত যবনগণের মস্তকগুলি তিনি পুঞ্জ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বাসদ্বীপকে অদ্যাপি 'পণ্ডিত ডাকাতের ভিটা' বলে। মুসলমানেরা ঐ স্থানকে 'শয়তানের ভিটা' বলিত। পূর্বে শ্যামা রামা যেরূপ দৌরাত্ম্য করিত,

মুসলমানদের উপরে বেণীরায়ের দৌরাত্ম্য তদপেক্ষা বেশি ভিন্ন কম ছিল না। শ্যামা রামা প্রকৃত ডাকাত ছিল, বেণীরায় তদ্রূপ অর্থলিপ্সু ডাকাত ছিলেন না। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার বিশেষ অত্যাচার ছিল বলিয়া মনে হয় না। কোন হিন্দু জমিদার কখনো বেণীরায়কে দমনের চেষ্টা করেন নাই। দরিদ্র হিন্দুর কখনো তিনি কোন অনিষ্ট করেন নাই, বরং অনেক সময়ে তাদের উপকার করিতেন। ধনী হিন্দুদের তিনি ধন হরণ করিতেন বটে, কিন্তু অনাবশ্যক প্রাণহরণ করিতেন না। তিনি কখনো গৃহদাহ প্রভৃতি অনর্থক অনিষ্ট করিতেন না। এমন কি স্ত্রীলোক ও বালকের গায়ে মূল্যবান অলঙ্কার দেখিয়াও তাহা অপহরণ করিতেন না। তিনি স্পষ্ট বলিতেন যে—"আমি হিন্দু ধনীদিগের নিকটে সাহায্য লই মাত্র। কিন্তু সাহায্য নাম করিয়া প্রকাশ্যরূপে লইলে সাহায্যকারীগণ মুসলমান কর্তৃক দণ্ডিত হইবে, এই ভয়ে আমি লুঠ করিয়া থাকি।" বেণীরায়ের আবির্ভাব দেখিয়া, বাড়ির সম্মুখে কিছু অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র রাখিয়া দিলে বেণীরায়ের দল আর গৃহস্থের বাড়িতে প্রবেশ করিত না। তজ্জন্য হিন্দুরা বেণীরায়ের আগমনে বিশেষ ভীত হইত না। কথিত আছে যে রাজীব শাহার বাড়ি বিবাহ হইতেছিল, এমন সময়ে বেণীরায় সদলে উপস্থিত হইলেন। রাজীব সকলকে অভয় দিয়া একাকী বেণীরায়ের নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল—বাবা ঠাকুর আপনাকার প্রণামী অগ্রেই পৃথক করিয়া রাখিয়াছি। বেণীরায় সেই প্রণামী লইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া আসিলেন; বিবাহকার্যের কোনই বিঘ্ন হইল না। বেণীরায় সাতৌঁড়ের সান্যালদিগের কুটুম্ব ছিলেন। তজ্জন্য সাতৌঁড়ের সান্যাল ও কায়েতগণ বহুসংখ্যক তাহার দলে যোগ দিয়াছিল। তন্মধ্যে যুগল কিশোর এবং কায়স্থ চণ্ডীপ্রসাদ রায় সর্বপ্রধান।

মানসিংহ যখন পদ্মার দক্ষিণ পারে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা ঠাকুর ভানুসিংহ বেণীরায়ের বিনাশার্থ সসৈন্যে সাঁতোড়, ও নিকটবর্তী অন্যান্য পরগণার জমিদারগণ তলব মত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সমস্ত জমিদারই হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা কহিলেন, বেণীরায়কে

সদ্ভাবে বশীভূত করাই সহজ এবং হিতকর। বলপূর্বক বিনাশ করিতে চেষ্টা করিলে বহু লোকের অনিষ্ট হইবে এবং উদ্দেশ্য সহসা সফল হইবে না। বেণীরায়ের বৃত্তান্ত শুনিয়া ভানুসিংহের ভক্তি হইল। তিনি তাঁহাকে সদ্ভাবে বশ করাই সঙ্কল্প করিলেন। ঠাকুর ভানুসিংহ দূত দ্বারা বেণীরায়কে জানাইলেন যে, পাঠান রাজত্ব সময়ে মুসলমানেরা বহু অত্যাচার করিয়াছে। আপনিও তদনুরূপ প্রতিফল দিয়াছেন। এখন মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে।" ইহারা হিন্দুদিগের প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল। তীর্থরাজ প্রয়োগে মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারী তপস্যা করিতেন। হঠাৎ তাঁহার মনে বিষয়-বাসনা উদ্রেক হওয়ায় তিনি আত্মগ্লানিতে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে কামনাকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। তিনিই জন্মান্তরে সম্রাট আকবর-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সাম্রাজ্যে মুসলমানগণ আর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না। বরং মুসলমান অপেক্ষা এখন হিন্দুদেরই প্রাধান্য হইতেছে। তাঁহার সহ আপনকার শত্রুতা করা অনুচিত। বিশেষত আপনি সুপণ্ডিত কুলীন ব্রাহ্মণ, আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, একজন মুসলমানদিগকে হিংসা করা ধর্মবিরুদ্ধ। আপনি ব্রাহ্মণগুরু, আমি ক্ষত্রিয়। আমি সহসা আপনকার অনিষ্ট করিতে চাই না। আপনি শান্তি গ্রহণ করিলে, আমি আপনাকে সমুচিত পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি।' বেণীরায় সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। ভানুসিংহ বেণীরায়কে এক পরগণা জমিদারিরূপে এবং ১২০০৲ বিঘা জমি তাঁহার কালীদেবীর দেবত্ররূপে দিতে স্বীকার করিয়া রাজা মানসিংহের দ্বারা সম্রাটের সনন্দ আনাইয়া দিলেন। বেণীরায় তদবধি শান্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিলেন। বেণীরায়ের অনুরোধে ভানুসিংহ যুগলকিশোর সান্যালকে এবং চণ্ডীপ্রসাদ রায়কে জমিদারি দিয়াছিলেন, আর চণ্ডীরায়কে নবাবী দরবারে পেস্কার করিয়াছিলেন।

বেণীরায় নিঃসন্তান মৃত হইলে, তাঁর প্রধান চেলা যুগলকিশোর সান্যাল সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। তাঁহার সন্তানেরাই জেলাবগুড়ায়

শেরপুরের সান্যাল নামে অদ্যাপি জমিদারি ভোগ করিতেছেন। যবনমর্দিনী কালীমূর্তিও শেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ভূমিকম্পে সেই মূর্তি নষ্ট হইয়াছে। বেণী রায়ের দ্বিতীয় শিষ্য চণ্ডীপ্রসাদ রায়ও জমিদারি পাইয়া পাবনা জেলার অন্তর্গত পোতাজিয়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারই সন্তানেরা পোতাজিয়ার রায়, ইহারাই বারেন্দ্র কায়স্থ মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন জমিদার এবং সম্মানিত। যুগলকিশোর ও চণ্ডীপ্রসাদকে পাঠানেরা "কাল্‌জোগালা" ও "কাল্‌চণ্ডিয়া" বলিত। আর যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ বেণীরায়ের দলে ছিলেন, তাঁহারা এবং তৎসংসৃষ্ট কুলীনেরা "বেণীপঠির" কুলীন নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানেরা অদ্যাপি "বেণীপঠির" কুলীন নামে পরিচিত। পণ্ডিত ডাকাত ও তাঁহার চেলাদিগের বীরত্ব, চতুরতা, দয়া এবং প্রতিহিংসা প্রকাশক বহু গল্প এখনও রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলায় শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার সহ তুলনায় রবিন হুডের কার্যকলাপ তুচ্ছ হইয়া পড়ে। সেই সকল গল্প সংগ্রহ করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে।

# পূর্বসূত্র

সেকালের চলন বিল এক প্রকার 'নো-ম্যান্‌স-ল্যাণ্ড' ছিল। এখন চলন বিল শুকাইয়া গ্রামপত্তন হইয়া আবাদী জমিতে পরিণত হইয়া পোষ মানিয়া ভদ্র হইয়াছে, সেখানকার অধিবাসীরাও পূর্বতন অরাজক-বৃত্তি ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা যে সময়কার কাহিনী বলিতেছি তখন এমন ছিল না। তখন চলন বিল পোষ মানে নাই। সভ্যসমাজের প্রান্তবর্তী এই অরাজক জলময় ভূখণ্ড তখন হিংস্র ছিল। যে সব মানুষ এখানে আসিয়া বাস করিত, কিছু দিনের মধ্যেই তাহারাও হিংস্র হইয়া উঠিত। সমাজবন্ধন বলিয়া এখানে কিছু ছিল না। এখানে একটি ছোট গ্রাম, আবার দুই ক্রোশ তফাতে আর-একটি ছোট গ্রাম—আটমাস জলময়, চারমাস শুষ্ক। খরার সময়েও অনাবাদী পড়িয়া থাকে, কেবল গ্রামের কাছাকাছি সামান্য অংশে এক-আধটা চৈতালির ফসল ফলে। চাষ-করা সভ্যতার প্রথম ধাপ, তবু চাষ করিলে লোকে কেন যে চাষা বলে বুঝিতে পারি না।

বিলের মধ্যে ছড়ানো গ্রামগুলিতে সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিযোগিতা ছিল, প্রত্যেক গ্রাম অপর গ্রামের শত্রু। এক দিকে তাহাদের বিরোধ বিলের অনিশ্চিত স্বভাবের সঙ্গে, আর এক দিকে বিরোধ ভিন্ন গ্রামবাসী মানুষের নিশ্চিত শত্রুতার সঙ্গে, এই ভাবে দুইদিকের প্রতিকূলতায় মানুষের স্বভাব দুমুখো ধারওয়ালা তলোয়ারের মতো শানিত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সামান্য একটু উপলক্ষ্য পাইলেই অন্তরের হিংস্রভাব নখেদন্তে, চোখে মুখে প্রোজ্জ্বল ভাস্বরতায় আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিত।

সেকালের চলন বিল বাসযোগ্য আরামের স্থান ছিল না। তবে লোকে কেন আসিত? কাহারা এখানে আসিত? শখ করিয়া এমন স্থানে কেহ

আসিত না। নানা কারণে সমাজ হইতে তাড়া-খাওয়া লোকেরা এখানে আসিয়া বাস করিত। কেহ বা সামাজিক অত্যাচারের ফলে, কেহ বা সামাজিক শাসনের ভয়ে, কেহ বা রাজদণ্ডের ভয়ে চলন বিলের আশ্রয় গ্রহণ করিত। যাহারা আসিত, পূর্বসূত্রে একটা বিদ্বেষ বা অসন্তোষ বহন করিয়া আনিত, আর তারপরে বিলের অনৈসর্গিক অসামাজিক আবহাওয়ায় পূর্বতন অসন্তোষ ও বিদ্বেষের বীজ অঙ্কুরিত, পল্লবিত হইয়া প্রত্যেকে এক-একটি ছোট-খাটো সামাজিক কালাপাহাড়ে পরিণত হইত। এইভাবে চলন বিলের কালো জল ও কালো মাটি অগণ্য কালাপাহাড়ে ভরিয়া গিয়াছিল। চলন বিল ভালো মানুষের স্থান নয়।

ছোট ধুলোড়িতে ডাকু রায় নামে একঘর জোতদার বাস করিত। সে নিজেকে জোতদার বলিত বটে, কিন্তু আসলে তার ব্যবসা ছিল ডাকাতি। ডাকাতে নিজেকে ডাকাত বলিয়া পরিচয় দেয় না; নিজেকে জোতদার বলে, রাজা বলে, সম্রাট বলে, আজকাল ডিক্টেটর বলিতেও শুরু করিয়াছে। কেবল অপরেই তাহাকে ডাকাত বলে—তাহাও আবার আড়ালে।

ডাকু রায়ের পূর্বেতিহাস আমারা একখানি পুস্তক হইতে উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম।

"ভীম ওঝা সম্রাট বল্লালসেনের পুরোহিত ছিলেন। গৌড় নগরের নিকট কালিয়া গ্রামে তাঁহার বসতি ছিল। বল্লালের হড্ডিকা সংস্রব ঘটিলে তিনি কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্তমান পাবনা জেলার পূর্বদক্ষিণ অংশে ছাতক নামক গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানেরা কালিয়াইগোষ্ঠী নামে খ্যাত। তিনি যখন পূর্ববঙ্গে বাড়ি করিয়াছিলেন, তখন পূর্ববঙ্গে আর কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্য তদ্বংশীয়েরা বাঙাল ওঝা নামে পরিচিত হইতেন। ভীমের পৌত্র অনন্তরাম বাঙাল ওঝা রাজা লক্ষণসেনের গুরু ছিলেন। তিনি সিন্দুর ও শাঁখিনী এই দুই পরগনা নিষ্করূপে গুরুদক্ষিণা পাইয়া বহুসংখ্যক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এই স্থানে স্থাপন করিয়া ছিলেন। তদ্বংশীয়দের তুল্য পুরাতন জমিদার বাংলাদেশে আর দেখা যায় না। পাঠান

রাজ্যারম্ভে ইঁহারা রায় উপাধি ধারণ করিয়া ছিলেন। গৌড় বাদশাহদিগের সময়ে বসন্ত রায় আট পরগনার রাজা হইয়াছিলেন ; ইঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং সমৃদ্ধ রাজা ছিলেন। মুসলমান রাজধানী হইতে বহুদূরে থাকায় আপন চত্বরে তাঁহাদের স্বাধীন রাজার ন্যায় সর্ব বিষয়ে প্রাধান্য ছিল। বসন্ত রায়ের পুত্র রাজীব রায়, গয়াতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন কালে রাঢ় দেশ হইতে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণকে তাঁহার মাতা ও ভগিনীদ্বয় সহ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের দুইটি ভগিনী পরমা সুন্দরী ছিল। রাজা সেই শিবচন্দ্রের 'চট্টোপাধ্যায়' উপাধি স্থলে 'মৈত্র' উপাধি করিলেন। তাঁহার দুই ভগিনীকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন। সেই পরিচয়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ঘরে শিবচন্দ্রের বিবাহ দিলেন এবং তাঁহাকে একটি গ্রাম তালুক করিয়া দিলেন। তাঁহারই সন্তানেরা শিবপুরের মৈত্র নামে খ্যাত। শিবচন্দ্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পরিচয় কিছুই জানিতেন না। তজ্জন্য ঘটকগণ ও ভট্টগণ বিদ্রূপ করিয়া কবিতা বাঁধিয়াছিল—

ঘটকের কবিতা—

'খাটোখোটো ঠাকুরটি গলায় রুদ্রাক্ষ মালা,
গাঁইগোত্র কিছু নাই, রাজীব রায়ের শালা।'

ভট্ট কবিতা—

'গঙ্গাপারের মৈত্র ঠাকুর, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা।
পরিচয় মধ্যে কেবল রাজীব রায়ের শালা।'

"শিবচন্দ্রের বিবাহসময়ে অনেকে আপত্তি করায় রাজীব রায় কহিলেন, কাশ্যপ গোত্র কুলীন ব্রাহ্মণ রাঢ়ী হইলেই চাটুজ্জে হয়, বারেন্দ্র হইলেই মৈত্র হয়। শিবচন্দ্রকে বারেন্দ্র করা হইল, তখন ইহার মৈত্র উপাধি হওয়াই উচিত। তাঁহার কথায় ফটিক দত্ত নামক একটি কায়স্থ কর্মচারী কহিল—মহারাজের এ হুকুম সাফ বোধ হয় না। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আমি সাফ করিতে পারি না, তুমি ধোবা হইয়া সমস্ত সাফ করো। তিনি ফটিককে ধোবার সহ

আহার ব্যবহার করাইয়া ধোবা জাতিতে অবনত করিলেন। তদ্দৃষ্টে ভয় পাইয়া আর কেহ কোন আপত্তি করিল না।”

জাতিচ্যুত ফটিক দত্তের পক্ষে জন্মগ্রাম অসহ্য হইয়া উঠিল। গ্রাম ত্যাগের সে সুযোগ খুঁজিতে লাগিল—রাজার বিনা হুকুমে গ্রামত্যাগ করা সহজ নয়। একবার রাজীব রায় ব্রহ্মপুত্রে যোগস্নানের জন্য গেলে ফটিক স্ত্রীপুত্র লইয়া গ্রাম ত্যাগ করিল এবং চলন বিলে আসিয়া আশ্রয় লইল। সে আজ অনেক শত বৎসরের কথা। ফটিকের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র ডাকাতি ব্যবসা ও রায় উপাধি অবলম্বন করিল। কোন্ ডাকাত না রায়?

ডাকু রায় এই বংশের সন্তান। চলন বিলের দুর্দান্ততম ডাকাতদের মধ্যে অন্যতম। তাহাকে ব্যবসার সূত্রে লোকে ডাকু রায় বলিত, আসল নামটা কাহারো মনে ছিল না। ডাকু রায়ের কন্যা বলিয়া কুসমির পরিচয়।

মানুষ যতই কঠিন হোক না কেন যে বিধাতা তাহার প্রকৃতিকে গড়েন, তিনি কোথাও একটুখানি কোমল স্থান রাখিয়া দেন। মানুষের অদৃষ্ট লইয়া কেন তিনি এমন করেন, তাহা কেবল তিনিই বলিতে পারেন। কচ্ছপের পিঠের আবরণটা কঠিন কিন্তু পেটের তলাটা কোমল, সেইখানেই তাহার মর্ম। দুর্ধর্ষ ডাকু রায়ের মর্মস্থান কুসমি। ইটের পাঁজা তৈরি করাই যদি বিধাতার উদ্দেশ্য হইত তবে সব পোড়াইয়া কেবল ঝামা করিলেই চলিত, কিন্তু তিনি চান অট্টালিকা গড়িতে, তাই শক্ত ইটের মাঝখানে একটু করিয়া নরম পলাস্তার দিয়া দেন! নরম না হইলে কঠিনকে আঁটিয়া রাখা যায় না। একা কঠিন বড়ই অসহায়।

ধুলোউড়ি গ্রামে মাধব পাল নামে এক গৃহস্থ ছিল। তাহার সাংসারিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। সেকালের সবচেয়ে বড় ব্যবসা ডাকাতিতে সে তেমন কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে নাই, কাজেই সামান্য জোতজমি ও চাষবাস লইয়াই তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল।

অনেক কাল আগে মাধব পালের এক পূর্বপুরুষ অন্যত্র হইতে চলন বিলে আসে। সেকালে অদৃষ্টের কানমলা না খাইলে কেহ বড় চলন বিল অঞ্চলে বাস করিত না। মাধব পালের পূর্বপুরুষ যে কারণে স্বগ্রাম ছাড়িয়া চলন বিলে আসে তাহা বলিতেছি।

"রাজা দেবীদাস দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের সমকালবর্তী লোক। তিনি গৌড়ের বাদশাহের ক্রোধভাজন হইয়াছিলেন। কি জন্য সেই আক্রোশ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার কল্পিত গল্প আছে, তাহা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। বাদশাহ উমরু নামক সেনাপতির অধীনে একদল সেনা ছাতক (রাজা দেবীদাসের রাজধানী) আক্রমণ জন্য পাঠাইয়া ছিলেন এবং তৎপ্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে, আঠার পুত্র সহ রাজা দেবীদাসের মাথা কাটিয়া আনিও এবং তাহাদের রমণীগণকে দাসীরূপে বিক্রয় করিও; কিন্তু যদি কেহ মুসলমান হয়, তবে তাহাকে সসম্মানে রক্ষা করিও এবং তাহাকে আয়মা দিও। রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র কার্ত্তিক রায় তিন দিন নগর রক্ষা করিয়া যুদ্ধে নিহত হইলে উমরু ছাতক দখল করিলেন। রাজপরিবারগণ বিষপানে জীবন শেষ করিল। রাজপুত্রদের মধ্যে ঠাকুর কেশবনাথ রায় ও ঠাকুর কাশীনাথ রায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহাদের সন্তান পাবনা জেলার আমিনপুরের মিঞা এবং ঢাকা জেলার এলাচিপুরের মিঞা। রাজভক্ত ভোলা নাপিত, নিজের তিন পুত্রকে রাজপুত্র বলিয়া বন্দী করিয়া, তিনজন রাজকুমারকে নিজ পুত্র বলিয়া রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহাদের নাম ঠাকুর কালিদাস, ঠাকুর চণ্ডীদাস ও ঠাকুর নরোত্তম। বর্তমান সমস্ত কালিয়াই-গোষ্ঠীই এই তিনজনের সন্তান। এই জন্য ইহাদিগকে নাপ্তিয়া কালিয়াই বলে।"

কিছুকাল পরে নবাবের ক্রোধ উপশমিত হইলে বা অন্য যে কারণেই হোক ঠাকুর কালিদাস প্রভৃতি পৈত্রিক সম্পত্তির অনেকটা অংশ পুনরায় পাইলেন। তখন তাঁহারা রক্ষাকর্ত্তা ভোলা নাপিতকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ইচ্ছায় একখানা গ্রাম লাখেরাজ করিয়া দিলেন। ভোলার অবস্থা সচ্ছল হইল। বয়ঃপ্রাপ্ত রাজপুত্রদের প্রতি সে সশ্রদ্ধ স্নেহের ভাব পোষণ করিত। কিন্তু

অন্যান্য অনেক গুণের মতো কৃতজ্ঞতাও বংশগত গুণ নয়। ভোলার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্রগণের সহিত কালিদাস প্রভৃতির পুত্রগণের বিবাদ বাধিতে লাগিল। ভোলার পুত্রগণ ভাবে যে তাহারা যথেষ্ট অনুগ্রহ পাইতেছে না, কালিদাসের পুত্র ভাবে যে যথেষ্টর অতিরিক্ত অনুগ্রহ তিনি দেখাইতেছেন। এ রকম ক্ষেত্রে মিলনের সম্ভাবনা কোথায়? কৃতজ্ঞতা নদীস্রোতের মতো, দুইকূলের বন্ধনে তাহার স্থিতি; আবার এক কূল ভাঙনেই অন্যকূলের মন চর পড়িয়া শুকাইয়া কঠিন হইয়া ওঠে। কৃতজ্ঞতার দেনাপাওনা লইয়া সংসারে যত বিরোধ ও ভ্রান্তি দেখা দেয়—এমন অন্য কারণে, বড় নয়।

অবশেষে ভোলার দুই পুত্রের একজন অভিমানে পূর্বদেশে চলিয়া গেল, অন্যজন চলন বিলে আসিয়া বাস স্থাপন করিল। কিন্তু তাহার সাংসারিক অবস্থার উন্নতি ঘটিল না। সামান্য রকমের ক্ষেতখামারের কাজ লইয়াই সে সন্তুষ্ট থাকিল। মাধব পাল এই বংশের সন্তান, তাহার পুত্র মোহনকে আমরা লিচুতলায় দেখিতে পাইয়াছি।

দর্পনারায়ণ একদিন শিশুপুত্র দীপ্তিনারায়ণকে, পুরাতন ভৃত্য মুকুন্দ ও দুই চারিজন বিশ্বস্ত অনুচরকে লইয়া জোড়াদীঘি ত্যাগ করিল। ধুলোউড়ির কুঠির সন্ধান কেমন করিয়া সে পাইল বলিতে পারি না—কিন্তু চলন বিল অঞ্চল তাহার অপরিচত নয়। সে ইতিপূর্বে অনেকবার পাখি শিকারের উদ্দেশ্যে চলন বিলে আসিয়াছে; তাহা ছাড়া চৌধুরীদের জমিদারির কোন কোন অংশ চলন বিলের সীমানাভুক্ত; জমিদারি দেখিবার জন্যও এইপথে তাহাকে যাতায়াত করিতে হইয়াছে। খুব সম্ভবত এই পরিত্যক্ত সুবৃহৎ কুঠিটাকে সেই সময়ে দেখিয়া থাকিবে।

দর্পনারায়ণ জোড়াদীঘি হইতে জলপথে যাত্রা শুরু করিয়াছিল, নৌকা পরদিন কুঠির ঘাটে আসিয়া লাগিল। দর্পনারায়ণ কুঠিতে প্রবেশ করিয়া কুঠি

অধিকার করিয়া লইল। ইহাতে গ্রামের লোক বা তাহার অনুচরগণ কেহই বিস্মিত হইল না, কারণ তখন 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি মানিয়া সকলে চলিত।

ধুলোউড়ির কুঠি একটা বিরাট ব্যাপার। অন্তত তিন-চার বিঘা জমি জুড়িয়া এই বৃহদায়তন শিথিল-বিন্যাস প্রাসাদ। চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত, একদিকে ছোট একটি খিড়কি—সম্মুখে প্রকাণ্ড সিংহদ্বার। কুঠির কোন অংশ একতালা, কোন অংশ দোতালা, উচ্চতম অংশ তেতালা, আবার মাটির নীচে পর পর দুটি তালা; কি প্রয়োজনে কে যে কবে এই প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিল আজ সকলে ভুলিয়া গিয়াছে—তবে মাটির উপরকার তিন তালা ও মাটির নীচেকার দুটি তালা দেখিয়া মনে হয় যে বোধ করি কেহ একই সঙ্গে স্বর্গের সোপান ও নরকের সোপান গড়িতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে—হয়তো হঠাৎ তাহার মনে চৈতন্যের বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়াছিল যে স্বর্গ ও নরক নিম্নে বা উচ্চে নয়—আর কোথাও! তাই অসমাপ্ত প্রয়াস একটা প্রকাণ্ড নিরর্থকতার মতো পড়িয়া আছে।

কুঠির ভিতর দুইখণ্ড বাগান। তাহা ছাড়া প্রাচীরবেষ্টিত অনেকটা জমি ভাঙা ইটের টুকরো, আগাছা এবং সাপ-শূকরের আবাস হইয়া পড়িয়া আছে। দর্পনারায়ণ আসিবার আগে গাঁয়ের লোক কুঠিতে বড় ঢুকিত না, এখন কেহ কেহ সাহস করিয়া ঢুকিয়া থাকে। এই কুঠির ইতিহাস শুধাইলে তাহারা বলে যে পাণ্ডুরাজা বাস করিবার জন্য ইহা তৈয়ারি করিয়াছিলেন, কেহ বলে ইহা নীলধ্বজ রাজার বাগানবাড়ি, আবার কেহ কেহ বা হাতের আঙুলে একটা অজ্ঞেয়তার মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া বলে, কে জানে! কিংবা, কি জানি! কিংবা, ওসব কথায় আমার দরকারটা কি! মোটের উপরে এই কুঠিটাকে তাহারা চিরকাল এমনই পরিত্যক্ত দেখিয়া আসিতেছে। এতদিনে দর্পনারায়ণকে সেখানে প্রবেশ করিয়া বসবাস করিতে দেখিল। ইহার ফলে দর্পনারায়ণের প্রতি গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল! যে-লোক এই কুঠিতে আসিয়া বাস করিতে পারে সে বড় কম লোক নয়।

সন্তপরিত্যক্ত অট্টালিকা সন্তমৃত মানবদেহের মতো, প্রেতাত্মা তখনো তাহার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু সুদীর্ঘকালের অট্টালিকা হইতে জীবনের শেষ চিহ্নটুকুও যেন বিগত, এমনকি সে যেন প্রেতাত্মার দাবিরও বাহিরে। সন্তমৃত মানবদেহে জীবনটাকে ফিরিয়া পাইবার একটা ব্যাকুলতা থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু যে-দেহ বহুকাল প্রাণহীন, অতীতের প্রতি তাহার আকুলতা আসিবে কোথা হইতে? সে হয়তো গোপনে গোপনে ভবিষ্যতের জন্য লালায়িত হইয়া ওঠে। ধুলোউড়ির কুঠি দুর্পনারায়ণের আশ্রয়স্থল হইয়া নূতন করিয়া ইতিহাসের ভূমিকা রচনা করিয়া বসিল।

বিলের ঠিক প্রান্তেই এই প্রাচীন শুভ্র প্রাসাদ জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিশ্চল বসিয়া আছে—সম্মুখে দিগন্ত-বিস্তৃত বিলের একটানা কালো জল; বর্ষার বিলের জল ফাঁপিতে ফাঁপিতে কুঠির ভূগর্ভস্থিত কক্ষগুলিতে গিয়া ঢুকিয়া পড়ে, গ্রীষ্মকালে জলের সীমা কুঠি হইতে অনেকটা সরিয়া যায়, আবার বর্ষার প্রারম্ভে বিলের জল বাড়িয়া কুঠির সীমানায় পায়ে পায়ে প্রবেশ করিতে থাকে। বিল ও কুঠি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লের মতো পরস্পরের দিকে কটাক্ষ করিয়া বসিয়া আছে, একমুহূর্ত অসতর্ক হইলে সর্বনাশ। বিল ও কুঠি পৌরাণিক কালের গজ-কচ্ছপের মতো দ্বন্দ্বালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে, নড়িতে পারে না; মরিতে পারে না, পরস্পরকে ছাড়িতে পারে না। বর্ষাকালে কচ্ছপের প্রতাপে কুঠি আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া যায়, গ্রীষ্মকালে গজের প্রতাপে বিল অনেক দূর সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়! এমনি করিয়া কত কাল চলিতেছে—আরও কতকাল চলিতে পারিত! এমন সময়ে গরুড়ের আবির্ভাবে বিল ও কুঠি দুই-ই সচকিত হইয়া উঠিল।

কোম্পানির ফাটক হইতে খালাস পাইবার পরে দর্পনারায়ণের জীবনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য রহিল রক্তদহের জমিদার পরন্তপ রায়কে উচিত শিক্ষা দিতে

হইবে। তাহার বিশ্বাস এই যে, তাহার অপমান, সম্পত্তিনাশ প্রভৃতির মূলে রহিয়াছে পরন্তপ রায়। কিন্তু ফাটক হইতে বাহির হইয়া দর্পনারায়ণ দেখিতে পাইল যে প্রতিশোধ লইবার পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, তাহার বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছে, অস্ত্রহীন যোদ্ধার মতো সে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান অথচ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্ত্রবলে লেশমাত্র ন্যূনতা ঘটে নাই।

যতদিন বনমালা জীবিত ছিল তাহার স্নিগ্ধ হস্তের স্পর্শে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা অনেকটা মৃদু ছিল। এমন সময়ে বনমালা গত হইল। মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিবার কোন লোক আর রহিল না। তাছাড়া বনমালার অকালমৃত্যুর জন্যও দর্পনারায়ণ পরন্তপ রায়কে দায়ী করিয়া বসিল। তাহার মনে হইল, আজ আমার বিষয়সম্পত্তি পূর্ববৎ থাকিলে বনমালাকে যাইতে দিব কেন? আজ যে যথেষ্ট চিকিৎসা করিতে পারিলাম না, অর্থাভাব তাহার কারণ নয়? অর্থাভাবের কারণ কি পরন্তপ নয়? পরন্তপের উপরে তাহার বিদ্বেষ দাবানলের আকার ধারণ করে। সে এমন একটা গোলকধাঁধার মধ্যে পড়িয়াছে, সেখানকার প্রত্যেকটি পথই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ওই এক পরন্তপ রায়ের কাছে লইয়া গিয়া ফেলে! পরন্তপের স্মৃতি আগুনের বেড়াজালের মতো তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল, পালাইবার পথ নাই, নিভাইবার উপায় নাই; এ কি জ্বালা!

পরন্তপকে দণ্ড দিবার পূর্বে তাহার মৃত্যু হইবে না, এই বিশ্বাস দর্পনারায়ণের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল—এই দণ্ডবিধানকে প্রকৃতির একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলিয়া সে ধারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু নিজের উপায়ের ক্ষীণতা এবং পরন্তপের প্রবল প্রতাপ দেখিয়া এক-একবার তাহার মনে হইত বোধকরি এ জন্মে আর প্রতিশোধ লওয়া ঘটিয়া উঠিবে না। একবার এইরকম নৈরাশ্যের সময়ে তাহার মনে হইল—আমার জীবনে যদি না ঘটিয়া ওঠে, তবে তো দীপ্তিনারায়ণ রহিল। সে পিতার অপমানের প্রতিশোধ লইবে। এই নূতন উপায়টা চোখে পড়িবার পর হইতে তাহার মন অনেকটা

হালকা হইয়া আসিল। কিন্তু তখন আর এক নূতন কর্তব্য দেখা দিল—দীপ্তিনারায়ণকে ধীরে ধীরে প্রতিশোধ-গ্রহণেচ্ছায় দীক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

এইরকম সময়ে দর্পনারায়ণ জোড়াদীঘি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পৃথিবীতে এত স্থান থাকিতে কেন যে সে চলন বিলে আসিয়া বাস করিল তাহার ইঙ্গিত পূর্বে দিয়াছি, কিন্তু আরও একটা কারণ আছে। জোড়াদীঘি ও রক্তদহের মাঝখানে চলন বিলের অবস্থিতি। এখানে আসিয়া দর্পনারায়ণের মনে হইল প্রতিশোধ গ্রহণের পথে এক ধাপ সে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। জোড়দীঘি হইতে চলন বিল এক ধাপ, আর-এক ধাপ অগ্রসর হইলেই রক্তদহ! এইকথা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ সে একপ্রকার উল্লাস অনুভব করিত, ডাক দিত—দীপ্তি!

দীপ্তিনারায়ণ বলিত, কি বাবা?

দর্পনারায়ণ বলিত, চল্ বেড়িয়ে আসি, এই বলিয়া শিশুপুত্রের হাত ধরিয়া সে মাঠের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িত। পিতাপুত্রের মধ্যে আলোচনার একটিই মাত্র বিষয় ছিল, জোড়াদীঘির চৌধুরীদের কাহিনী। দর্পনারায়ণ স্থির করিয়াছিল যে তাহার মনের প্রতিশোধ গ্রহণের বিষ দীপ্তিনারায়ণের চিত্তে সঞ্চারিত করিয়া দিবে। সেই উদ্দেশ্যেই জোড়াদীঘির কাহিনীর পটভূমিতে সে শিশুপুত্রকে মানুষ করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু তাহারা জোড়াদীঘির চৌধুরী এ তথ্য সে কখনো পুত্রকে বলে নাই; ইচ্ছা ছিল পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যথাসময়ে এই তথ্য প্রকাশ করিবে। মুকুন্দ প্রভৃতিকেও এই সংবাদ প্রকাশ করিতে সে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। তাহার আরও ইচ্ছা ছিল ছিল যে দীপ্তি একটু বড় হইলেই তাহাকে ঘোড়ায় চড়া, লাঠি খেলা, বন্দুক-চালনা প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা দিবে, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এসব অত্যাবশ্যক! কিন্তু কবে যে দীপ্তিনারায়ণ বড় হইবে? এক-একদিন সে ক্ষুদ্রকায় মানবকটির দিকে তাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিত!

তাহার গাম্ভীর্য দেখিয়া পুত্র শুধাইত, বাবা কী ভাবছ?

পিতা বলিত, ভাবছি কবে তুই বড় হবি ?

পুত্র বলিত, এই তো বড় হয়েছি।

পিতা বলিত, আরও বড়।

পুত্র পুনরায় শুধাইত, তোমার মতো বড় ?

পিতা মাথা নাড়িয়া জানাইত—হাঁ।

পুত্র গম্ভীরভাবে বলিত,—তোমার মতো হলেই তোমার মতো বড় হব।

শুনিয়া পিতা হাসিয়া উঠিত, পিতার হাসি দেখিয়া পুত্র হাসিতে থাকিত।

দর্পনারায়ণ বুঝিতে পারিত না যে মানবশিশুর বাড় এত ধীরে কেন ? আরও কতকাল যে তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে ? দীপ্তিনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া অবধি কি সে জীবিত থাকিবে ? সে নিশ্চয় জানিত এমন শিক্ষা সে দীপ্তিকে দিয়া যাইবে যাহাতে একদিন না একদিন পিতার অভিপ্রেত প্রতিশোধ গ্রহণ সে অবশ্যই করিবে ! কিন্তু তখনি মনে হইত সেদিন হয়তো সে জীবিত থাকিবে না ! আর যদিই বা জীবিত থাকে—তাহাতেই বা কি ? এখনো তো সে দিন বহু দূরবর্তী ! মধ্যবর্তীকালীন এই পর্বটা তাহাকে কি নিষ্কর্মার মতো কাটাইতে হইবে ? একটা প্রতিদ্বন্দ্বী পাইলে লড়িবার অভ্যাসটা সে সজীব রাখিত। মানব প্রতিদ্বন্দ্বী মেলে বটে কিন্তু তাহার সঙ্গে যুদ্ধে জনবল, ধনবল আবশ্যক ! দর্পনারায়ণের দুইয়েরই অভাব। সে ভাবিত এমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী কি নাই—যাহার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামিতে হইলে ধনবল অত্যাবশ্যক নয় ! জন্মমল্ল দর্পনারায়ণের চিত্ত ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া

প্রকৃতি মানুষের শত্রু না মিত্র, প্রতিযোগী না সহযোগী—এই চিন্তা মানুষকে আদিম কাল হইতে ভাবিত করিয়া রাখিয়াছে। অসহায় মানুষ যে-জগতে

জন্মলাভ করিয়াছিল সে-জগতে জলবায়ু, ঝড়ঝঞ্ঝা, বৃষ্টিবজ্র, গভীর অরণ্য ও দুস্তর পারাবার মানুষের চোখে শত্রুবৎ প্রতিভাত হইয়াছিল, মানুষ নিজেকে প্রকৃতির ক্রীড়নক ও ক্রীতদাস বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। জগতের শক্তিপুঞ্জের সম্মুখে নিজেকে নিতান্ত নগণ্য বোধ করিয়াই সে আদিম জগতের কল্পনা করিয়াছিল। প্রকৃতিকে সে দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল, সে দেবতা রুদ্র ; মানুষের দয়ামায়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলির সহিত সে রুদ্রের সমবেদনার যোগ ছিল না, তাই স্তব করিয়া, স্তুতি করিয়া, উদাত্ত ছন্দে প্রশংসা করিয়া রুদ্রের প্রসাদ আদায় করাকেই সে ধর্ম মনে করিত, রুদ্রের কঠোর শাসন হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় মনে করিত।

আদিম বৈদিক ঋষিগণ কি অসহায় দৃষ্টি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুদ্র দ্বীপটির চতুর্দিকে কি রহস্যের, কি দুর্জ্ঞেয়তার তরঙ্গলীলা নিরন্তর উঠিত পড়িত! সেই সুপ্রাচীন ব্রহ্মাবর্তের আকাশ যেদিন পুঞ্জ পুঞ্জ নীরদমালায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত, দৈত্যের পেশীস্তরসম মেঘরাশির দ্বারা উদ্‌ঘাতিনী আকাশ ভূমিতে যখন বজ্রসনাথ বিদ্যুৎ-চকিত চমক বিস্তার করিতে থাকিত, প্রবল প্রভঞ্জনে যখন আদিম বনস্পতি ধূল্যবলুণ্ঠিতশির হইয়া হায় হায় হাহাকার ধ্বনি তুলিত, করকাসম্পাতী বৃষ্টিধারা যখন ঋষিদের দুর্বল কুটিরের ঝুঁটিশুদ্ধ নাড়া দিয়া অপসারিত ছাদনীর অবকাশ-পথে বাহিরের প্রলয়লীলাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিত, তখন তাঁহারা যুক্তকরে, দুরূহ দুর্বোধ্য ভাষায় জয়যাত্রানির্গত মঘবানের স্তবগান করিতেন! সেই প্রাজ্ঞ শিশুদের চোখে সেই প্রলয়তাণ্ডব এক মহতী শক্তির, এক দুর্জয় দেবতার লীলাখেলা বলিয়া প্রতিভাত হইত! তখন জগৎটারই শৈশব ছিল, অত্যন্ত প্রাজ্ঞরাও শিশু ছিলেন।

আমাদের সেই প্রাচীন পিতামহগণের সহোদর যে-জাতি যুনানীমণ্ডলে বাস করিত, কি দুর্লভ শৈশবই না তাহাদের ছিল! নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে জলস্থল, আকাশ ও পৃথিবী যখন দ্রাক্ষারস-সমুজ্জ্বল সূর্যকিরণে নিঃশেষে পরিপ্লাবিত হইয়া নেশায় নিশ্চল, সুরানীল সিন্ধুতে যখন ঊর্মিল বলিচিহ্নটিও নাই, নৈঃশব্দ্য

যখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, দূরবর্তী ঝরনার ঝঙ্কার যখন স্তব্ধতার রক্তের কল্লোলের মতো পরিশ্রুত, তখন, সেই আত্মলীন দ্বিপ্রহরের বনভূমিতে বনদেবতা Pan আবির্ভূত হইতেন, হতভাগ্য শিকারী বা কাষ্ঠান্বেষী তাঁহার অভাবিত দর্শনে ভীত চকিত হইয়া, panic-গ্রস্ত হইয়া মূর্ছিত হইত! সমুদ্রচারী নাবিকের তরণী কোন অজ্ঞাত দ্বীপের সন্নিকটে আসিয়া গিরিশিখর হইতে প্রস্তরখণ্ড খসিয়া পড়িতে দেখিলে কল্পনা করিত Cyclops নামক দানবে পাথর নিক্ষেপ করিতেছে!

আমাদের প্রাচীন কবিগণ রজতশুভ্র কৈলাস-শিখরকে রজতগিরিসন্নিভ ধূর্জটি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই কৈলাসে যখন ঝঞ্ঝা-উৎক্ষিপ্ত তুষাররাশির শুভ্র পতাকা বিস্তারিত করিয়া দেয়, মুহুর্মুহু তুষারস্তূপের স্খলননিনাদে ধরিত্রীর বনিয়াদ অবধি প্রকম্পিত হইয়া উঠিতে থাকে, তখন ধূর্জটির প্রলয়তাণ্ডব সূচিত হয়! কালী ও গৌরী দুজনেই আদ্যা প্রকৃতি, কিন্তু প্রকৃতির কি পৃথক রূপ দুই মূর্তিতে সূচিত! মানুষ যে জগতে জন্মিয়াছিল তখন প্রকৃতি ছিল তাহার শত্রু, তাহার প্রতিযোগী! তারপরে মানুষ প্রকৃতিকে মিত্র ও সহযোগীরূপে লাভ করিল। সে জগৎ কালিদাস, ওয়ার্ডসওআর্থ, রবীন্দ্রনাথের কবিজগৎ। তারপরে এখন প্রকৃতি মানুষের শত্রুও নয়, মিত্রও নয়, সহযোগীও নয়, প্রতিযোগীও নয়, প্রকৃতি এখন জড় পদার্থে পরিণত। বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতিকে অমোঘ নিয়মের নাগপাশে বাঁধিয়া আনিয়া মানুষের প্রাঙ্গণের পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়াছেন—বলিতেছেন মেঘ আছে বটে, কিন্তু মেঘদূত নাই, কারণ "ধূমজ্যোতিসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ"! প্রকৃতি এখন আর মানববিদ্বেষী Caliban বা মানবনির্ভর Ariel কিছুই নয়—এখন প্রকৃতি কতকগুলি নিয়মের সমষ্টিমাত্র। প্রাচীন কালের বৃদ্ধও শিশু ছিল, বর্তমানের শিশুও বৃদ্ধ! জগতের শৈশব অপসারিত হইবার সঙ্গেই মানুষের সৌন্দর্যদৃষ্টির সত্য জগৎও অপসৃত! মানুষ আজ কি অসীম দরিদ্র, কি শোচনীয় কৃপার পাত্র!

কিন্তু জগতের শৈশব তো একেবারে সাকুল্যে যায় না, কোন কোন দেশে,

কোন কোন সমাজে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের চিত্তে শৈশবের সেই পূর্বরাগ এখনো বিস্মৃত দ্রাক্ষাগুচ্ছটির মতো বিরাজমান, তাহারা, একালের হইলেও তাহাদের মনের বয়স সেকালের। শিকিমের শিল্পীগণ এখনও কাঞ্চনজঙ্ঘার ভয়ানক মূর্তি কল্পনা করিয়া ভীষণদর্শন পুতুল গড়িয়া থাকে। কোন কোন কবি বিজ্ঞানপ্রভাবিত হইয়াও দুর্লভ মুহূর্তে জগতের শৈশবকে অনুভব করিতে সমর্থ হন—রবীন্দ্রনাথ, শেলি, কীট্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থ সেই দিব্যগোষ্ঠীভুক্ত।

যে চলন বিল আমাদের কাহিনীর অন্যতম নায়ক, সেই ক্ষুদ্র জগতে এখনো জগতের শৈশব বিরাজমান; যে-সময়কার কথা বলিতেছি তখন সেই কালে শৈশব-রস আরও ঘনীভূত ছিল। এখন সেখানেও বিজ্ঞানের আলো ষ্টীমারে ও মোটরলঞ্চে প্রবেশ করিতে শুরু করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও এখনো সঙ্কীর্ণায়মান চলন বিলের কোন কোন অঞ্চলে আদিম শৈশব জগৎ রহিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রকৃতি মানুষের সহযোগী নয়, শত্রু। মানুষের সঙ্গে বিলের নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। মানুষ ও বিল দুজনেই অভিজ্ঞ মল্লের মতো পরস্পরের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। মানুষ চাহে বিলকে পোষ মানাইতে, বিল চাহে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে উস্কাইয়া দিতে, কেহ কাহারো কোট ছাড়িতে রাজি নয়। ফলে একের প্রভাব অন্যের উপরে পড়িতেছে, বিল একটু যদি পোষ মানে, মানুষ এক ধাপ আদিমতার দিকে অগ্রসর হয়; বিল খানিকটা যদি শুকায়, মানুষ অনেকটা উত্তাল হইয়া ওঠে; বিলে যদি একটা নূতন ফসল ফলে, মানুষের অনেক কালের স্নেহজ স্বভাব ধ্বসিয়া পড়িয়া যায়; বিল শুকাইয়া দিয়া দুষ্কৃতির নরকঙ্কাল উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, হতভাগ্য শিকারের কঙ্কালখানা মানুষ আরও গভীরতর গর্তে পুঁতিতে শুরু করে; বিল বর্ষাকালে চতুরঙ্গ বাহিনীতে আপনার প্রতাপ উদ্দাম করিয়া দেখায়, মানুষে গ্রীষ্মকালে আপনার শক্তিকে নিরবচ্ছিন্ন শুষ্ক পতাকায় দিকে দিকে বিস্তারিত করিয়া দেয়। বিলে দুইটিমাত্র ঋতু, বর্ষা ও গ্রীষ্ম। শীত গ্রীষ্মের অন্তর্গত।

দর্পনারায়ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পরন্তপ, কিন্তু আজ সে প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার

আয়ত্তের বাহিরে। তাই বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব তো দর্পনারায়ণের স্বভাব ত্যাগ করিবে না, বরঞ্চ যতদিন মানব প্রতিদ্বন্দ্বীকে না পাওয়া যাইতেছে অপর একটা প্রতিদ্বন্দ্বী যে তাহার নিতান্তই আবশ্যক। আসল ভীমের পরিবর্তে লোহভীমই বা মন্দ কি! প্রতিদ্বন্দ্বী-সন্ধানী দর্পনারায়ণের চিত্ত অবশেষে কি দুর্জয় চলন বিলের মধ্যে আপনার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজিয়া পাইল?

ধুলোউড়ির লোকেরা দর্পনারায়ণকে নিজেদের মধ্যে পাগলা-চৌধুরী বলিয়া উল্লেখ করিত। তাহারা দেখিতে পাইত পাগলা-চৌধুরী শীতকালে ঘোড়ায় চড়িয়া সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন প্রয়োজনে বেড়াইত এমন নয়, ঘুরিয়া বেড়ানোটাই একমাত্র প্রয়োজন। সকাল হইতে সন্ধ্যা। এমন দিনের পর দিন। কুঠি হইতে কখনো কখনো সে দশ-পনেরো ক্রোশ দূরে চলিয়া যাইত, শীতকালে চলন বিলের অনেকটা অংশ মাঠে পরিণত হয়। আবার গাঁয়ের লোকে দেখিতে পাইত বর্ষার সময়ে পাগলা-চৌধুরী একখানা ছিপ নৌকায় চড়িয়া নিরুদ্দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, বর্ষাকালে ঘোড়া অচল।

ছিপ নৌকাখানা খুব ছোট, জন দুই স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে, এই পর্যন্ত। ছোট্ট একখানা পাল তুলিয়া দিবার ব্যবস্থাও আছে। দর্পনারায়ণ পালের উপর নির্ভর করিয়াই চলাফেরা করিত, যে দিকে বাতাস সেই দিকই তাহার লক্ষ্য। পালখানা তুলিয়া দিয়া হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—নৌকা দ্রুত গতিতে নলখাগড়ার বন, শাপলার ঝাড় অতিক্রম করিয়া ছুটিত; অনেক সময়ে অতর্কিত বেলে হাঁসের ঝাঁকের উপরে গিয়া পড়িত, হাঁসগুলি পলাইবার সময় পাইত না, চাপা পড়িতে পড়িতে কোন রকমে আত্মরক্ষা করিত, কোনটা বা চাপা পড়িয়া ডুব সাঁতার দিয়া প্রাণে বাঁচিত। গাঁয়ের লোকে দেখিতে পাইত পাগলা চৌধুরীর পালতোলা ছোট্ট ছিপ হাঁসের মতো ভাসিয়া যাইতে

যাইতে দূরত্ববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা বকের আকার লাভ করিত, তারপরে আর দেখা যাইত না, দূরত্বের আবছায়ায় সব একাকার হইয়া যায়। দর্পনারায়ণের পাকা শিকারীর হাত হইলেও কখনো পাখ-পাখালি মারিত না, তবে নৌকায় একটা বন্দুক থাকিত বটে!

বর্ষাকালই চলন বিলের প্রকোপের সময়। নিগূঢ় দুরভিসন্ধির মতো কালো জল মাঠে মাঠে ছড়াইয়া পড়ে, এক গ্রামের সঙ্গে অপর গ্রামের সম্পর্ককে ছিন্ন করিয়া দেয়, মানুষ মানুষ হইতে দূরে সরিয়া যায়; মানবীয় সম্বন্ধের মাঝখানে সর্পিল অজগরের মতো কৃষ্ণবর্ণ জলরাশি আসিয়া পড়িয়া মানুষের মনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে, তখন চলন বিলের সন্তানেরা যে যাহার ছিপ নৌকা লইয়া দলে দলে বাহির হইয়া পড়ে, বলে—ভাই আবার সুদিন এল বলে—খোদা আবার মুখ তুলে চাইল, বলে—মা কালী তোমার সন্তানকে ছেড় না মা! সেখানে হিন্দু-মুসলমান বলিয়া ভেদ নাই, ডাকাত আর ভালোমানুষ এই দুই শ্রেণী। ডাকাতের সময় বর্ষাকাল, বিলের সময় বর্ষাকাল, বিল ডাকাতের ধাত্রী।

শীতকালে যেমন জল সরিয়া যায়, তেমনি ডাকাতের দলও গা ঢাকা দেয়, কেহ কেহ বা কৃষক সাজিয়া একটা ফসল ফলাইয়া দুপয়সা ঘরে আনে, অনেকেই শীতের সাপের মতো নিভৃতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বর্ষার অপেক্ষা করে। শীতকালে গাঁয়ে গাঁয়ে আবার যাতায়াত শুরু হয়, বর্ষার শত্রুর দল শীতের সময়ে মিত্রে পরিণত হয়, বর্ষা আসিতেই তাহাদের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে একথাও তাহারা জানে।

শীতকালে ধান ঘরে ওঠে, অঙিনায় ধান মাড়াইয়া গোলা ভরিতে থাকে, বিচালির স্তূপ ঘরের উচ্চতাকে হার মানায়, সকাল হইতে আগাছার ইন্ধনে খেজুর রস জ্বাল দিবার ধুম পড়িয়া যায়, লুব্ধ বালকের দল তাতরসের আশায় আশেপাশে ভিড় করে, কর্মবিরত গৃহস্থেরা বেলা তিন প্রহর অবধি রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া তামাক খাইবার অবকাশে গল্প করে, সন্ধ্যা বেলায় খড়-পোড়ানো ধোঁয়া গাঁয়ের মাথায় একটা আস্তরণ টানিয়া দেয়, সেই আস্তরণের

উর্ধ্বে সন্ধ্যাতারা ও নিম্নে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া ওঠে। শীতকালের প্রত্যেকটি চিহ্ন গার্হস্থ্যের চিহ্ন, মাটির সঙ্গে মানুষের আদানপ্রদানের চিহ্ন।

কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে এ সমস্ত পরিবর্তিত হইয়া যায়। কালো জল কালো যবনিকা টানিয়া দেয়; কালো জলের কালো পট আদিম মনোবৃত্তির একটা পটভূমিকা রচনা করে—শস্যহীন, ক্ষেত্রহীন, গৃহপালিত পশুহীন, গৃহস্থের গৃহহীন সেই নিঃশব্দের আসরে একখণ্ড আদিম জগৎ সৃষ্ট হয়—সেখানে মানব রুদ্রপ্রকৃতির ও বন্ধনহীন প্রবৃত্তির অসহায় ক্রীড়নক একমাত্র! তখন কেবল বিলের নয়, মানুষের চেহারাতেও পরিবর্তন ঘটিয়া যায়, মানুষ দ্বিপদ হইতে শ্বাপদের স্তরে নামিয়া আসে!

# ডাকাতি

আমাদের কাহিনীর সূত্রপাতের পরে এক বৎসর অতিবাহিত হয়ে আবার শীতকাল এসেছে। মোহন অনেকদিন কুসমির দেখা পায় নি। সে কুসমির সন্ধানে ছোট-ধুলোড়িতে তাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু প্রকাশ্যে গিয়ে দেখা দেবার সাহস তার হল না, তাই সে খিড়কি দরজার কাছে এল। খিড়কি বন্ধ। দরজায় সে গোটা-কয়েক টোকা মারল, মনে ভয় ছিল—পাছে আর কেউ এসে খুলে দেয়, আর ভরসা ছিল যে এইভাবে ইতি-পূর্বেও সে কুসমির সঙ্গে দেখা করেছে, আরও ভরসা ছিল যে, খুব সম্ভব কুসমিও তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য সুযোগ সন্ধান করছে। মানুষের ভরসার চেয়ে ভয়ের কারণই অধিক সফল হয়। কিন্তু মোহনের আজ অদৃষ্ট প্রসন্ন, খিড়কি খুলে কুসমি মুখ বার করল।

মোহন বলল—কুসমি বাইরে আয়।

কুসমি বলল—বাবা জানতে পারলে,—

ভীষণ সম্ভাবনাপূর্ণ বাক্যটা শেষ না করেই সে বাইরে এসে দাঁড়াল, দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

মোহন বলল—চল, কুল খেয়ে আসি, মণ্ডলদের বাড়িতে কুল পেকেছে।

রক্তিমাভ অম্লমধুর কুলের সংবাদে কুসমির জিহ্বা সজল হয়ে উঠল—তবু সে বলল—কিন্তু মোহনদা, বাবা জানতে পারলে আর আস্ত রাখবে না।

মোহন বলল—জানতে পারলে তো! জানবে কি করে?

অম্লমধুর কুল আর পিতৃকুলের মধ্যে আসন্ন পরীক্ষার সময় বারে বারে পিতৃকুলেরই পরাজয় ঘটেছে এমন সংবাদ পৃথিবীর সব সাহিত্যের পাতাতেই পাওয়া যায়, এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। কুসমি ডোরা শাড়িখানার ছোট্ট আঁচল কোমরে শক্ত করে জড়িয়ে মোহনের সঙ্গে চলল।

তখন শীতের প্রথম প্রহরের রৌদ্রে আকাশের নীল দূরত্ব উর্মিহীন সমুদ্রের

জলতলের ন্যায় ঈষৎ চিকচিক করছে ; জল-শুকানো বিলের প্রকাণ্ড শূন্যতার কোনখানে বা সর্ষে-ক্ষেতে সবুজ-ছোঁয়া পীতাভ প্রলেপ, কোনখানে বা আখের বাগিচা, গোরুগুলো দল ছেড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের ঘাস ছেঁড়বার তালে তালে উত্থিত মুচ মুচ শব্দ, নরম মাটিতে তাদের ক্ষুরের রেখাক্ষর, যেখানে মাটি আরও নরম সেখানে কাক-শালিখের পায়ের সঙ্কেত, দূর দিগন্তে যেখান থেকে জলের সীমানা আরম্ভ হয়েছে, সেখানে একখানা ধূসর কুয়াশার মলমল, এখানে ওখানে দূরে দূরে উঁচু মাটির স্তূপের উপর চাষীগৃহস্থের ঘর, জনপদের ছাপ সর্বত্র, তবু সব কেমন জনহীন, সব কেমন যেন শূন্য ; শূন্যতাতেই বিলের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

মোহন ও কুসমি হাত ধরাধরি করে চলেছে।

কুসমি শুধাল—হাঁ, মোহনদা, তোমার উপর বাবার এত রাগ কেন ?

মোহন বলে—তোর বাবা রাগী মানুষ তাই কিনা।

কুসমি প্রতিবাদ করে বলে—কই আর কারু উপরে তো রাগতে দেখি না।

মোহন বলে—কেন পাগলা চৌধুরীর উপরে—

কুসমি পিতাকে সমর্থন করবার মানসে বলে—পাগলা চৌধুরীর সঙ্গে তার ঝগড়া কিনা।

মোহন কুসমির অজ্ঞতায় হেসে বলে—কিন্তু ঝগড়াটা হয় কেন ?

কুসমি উত্তর দিতে পারে না।

মোহন আবার বলে—আমার বাবার সঙ্গে তোর বাবার ঝগড়া কিনা তাই—

কুসমি শুধায়—কেন তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হল ?

মোহন বলে, তা জানিস না, আমার বাবা পাগলা চৌধুরীর দলে।

নির্বোধ কুসমি বলে—তাতে কি হল ?

মোহন যে কুসমির চেয়ে কত বেশি বিজ্ঞ তা দেখবার উদ্দেশ্যে বলে—বাঃ, বাপের সঙ্গে ঝগড়া হলে ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হবে না ? ওসব তুই এখন বুঝবিনে, আগে আমার মতো বড় হ, তখন সব বুঝতে পারবি, নে সরে দাঁড়া, আমি ঢিল ছুঁড়ি—

দুইজনে কুলগাছের তলায় এসে উপস্থিত হয়েছে। কুসমি গাছের দিকে তাকিয়ে দেখে যে মোহন বড় মিথ্যা বলেনি। একটা পুকুরের পাড়ের ঠিক উপরেই প্রকাণ্ড কুলের গাছ, পাতার ফাঁকে ফাঁকে সারিবদ্ধ কুল, কতক শ্যামল, কতক পীতাভ, আর কতক বা তাম্র, যত পাতা তত ফল। মোহন একটা ঢিল ছোঁড়ে, একরাশ কুল ঝর ঝর, ঝুর ঝুর করে পড়ে, ঢালু পুকুরের পাড় বেয়ে কুল গড়ায়, কুল কুড়োবার জন্যে কুসমি ছোটে। 'পড়বি পড়বি' বলে মোহন ছোটে, অবশেষে পুকুরের শুকনো তলিতে এসে কুল, কুসমি ও মোহন তিনে এক হয়ে হুড়মুড় করে পড়ে।

মোহন বলে—কিরে লাগল নাকি ?

কুসমির লেগেছে—কিন্তু এই মাত্র তাকে শুনতে হয়েছে যে সে যথেষ্ট বড় নয়, পাছে এই অপবাদ আবার শুনতে হয়, তাই সে বলে—ইস লাগবে কেন ?

মোহন বলে—এই তো চাই। মেয়েমানুষকে কত সহ্য করতে হবে।

বয়ঃপ্রাপ্ত না হলেও যে সে মেয়েমানুষ তাতে কুসমি একপ্রকার গৌরব অনুভব করে।

মোহন বলে—বড় ভুল হয়ে গেল, একটু নুন আনলে জমত ভালো।

কুসমি কোন কথা না বলে আঁচলের খুঁট থেকে নুন বের করে। এই সময়োচিত কার্যের ফলে নিজের চোখে তার নিজের উপরে শ্রদ্ধা বেড়ে যায়, সে ভাবে বয়স তার যথেষ্ট না হলেও বুদ্ধি কম নয়।

মোহন বলে—ভালো হয়ে বোস, খাওয়া যাক।

তখন সেই শুকনো পুকুরের তলিতে একরাশ কুল নিয়ে দুটি বালকবালিকা খেতে বসে।

এই কুল গাছটা মণ্ডলদের কুল গাছ বলে পরিচিত, পুকুরটাকেও মণ্ডলদের পুকুর বলে, কিন্তু কাছাকাছি কোন মণ্ডল কেন, কারু নিবাস নেই, বোধ করি এককালে এখানে কোন মণ্ডলের বাস ছিল—এখন কেবল নামটা আছে।

দুই জনে পুকুরের ঢালু পাড়ে হেলান দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে, তার পরে

একটু করে হুন ছুঁইয়ে নিয়ে কুল খাওয়া চলে। দুজনের একটা করে কুল খাওয়া শেষ হলে বীচি ছুটো ছুঁড়বার প্রতিযোগিতা চলে।

মোহন বলে—দেখ, আমি কতদূরে ছুঁড়তে পারি। এই বলে সোজা হয়ে বসে বীচিটা ছুঁড়ে দেয়, সেটা কিছু দূরে গিয়ে পড়ে।

তারপরে বলে—এবারে তুই ছোঁড় দেখি।

কুসমি ছোঁড়ে, তার বীচি আর কতদূরে যাবে!

কুসমির মুখ ম্লান হয়।

মোহন সান্ত্বনা দিয়ে বলে—বাঃ রে, অনেক দূরে গিয়েছে তো।

কুসমি খুশি হয়।

তার খুশিতে মোহন খুশী হয়ে ওঠে।

তারপরে আবার দুজনে কুল খাওয়া চলে।

মোহন বলে—দীপ্তিবাবুর জন্যে কয়েকটা কুল নিয়ে যেতে হবে।

কুসমি আঁচলের একপ্রান্তে বাঁধা কয়েকটা কুল দেখায়।

কিছুক্ষণ পরে মোহন বলে—কুসমি ওই কুল কটা বার কর, দীপ্তিবাবুর জন্যে পেড়ে নিয়ে গেলেই চলবে।

কুসমি আঁচলের শূন্য প্রান্ত দেখায়—কখন সেগুলোও খাওয়া হয়ে গেছে, দুজনেই হেসে ওঠে।

তখন দুজনে পাশাপাশি চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকায়।

কুসমি শুধোয়—আমি যা দেখছি তুমি তা দেখতে পাচ্ছ?

মোহন বলে—পাচ্ছি বই কি!

কুসমি বলে—আমি একটা শাদা বক দেখছি।

মোহন এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষে আকাশের দিকে তাকায়—বলে—ওই বুঝি তোর বক? ওটা মেঘ।

কুসমি বলে—মেঘ কেন? বক।

মোহন বলে—তাই বইকি! বক কি ওরকম করে বদলায়?

কুসমি তাকিয়ে দেখে তাও বটে, বকটা হাড়গিলে হয়ে গিয়েছে।

দুজনে হেসে ওঠে।

এবারে মোহন বলে—আমি একটি মানুষের মাথা দেখতে পাচ্ছি।

কুসমি কিছু দেখতে পায় না।

মোহন বলে—এবারে মানুষের ধড়টাও দেখতে পাচ্ছি—

কুসমি এবারে কিছু দেখতে পায় না!

মোহন বলে—এবারে মানুষটা ঘোড়সোয়ার হয়ে গিয়েছে।

কুসমি হেসে বলে—মানুষের মাথা কি ঘোড়সোয়ার হয়ে যায় নাকি?

সে ভাবে তার বকের হাড়গিলে হয়ে যাবার প্রতিশোধ এতক্ষণে দিল।

কিন্তু এবারে আর ঘোড়সোয়ার না দেখে উপায় নেই—ঘোড়ার চার পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

দুজনে সোজা হয়ে বসে, দেখে একটা লোক ঘোড়া ছুটিয়ে পুকুরের দিকে আসছে। দুচার মিনিটের মধ্যে লোকটা পুকুরের পাড়ের উপরে এসে থামল। ঘোড়াটা খুব ছুটেছে—এখান থেকেও তার বুকের স্পন্দন চোখে পড়ছে।

মোহন ও কুসমি দেখতে পায় যে মানুষটা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে, ঘোড়ার জিন আলগা করে দেয়, আর ঘোড়াটাকে পাড়ের উপরে ছেড়ে দিয়ে পুকুরের দিকে নেমে আসে, বোধকরি জলের সন্ধানে। কিন্তু পুকুরটা আগাগোড়া শুকনো, লোকটা জল দেখতে পায় না, এমন সময়ে সে মোহন ও কুসমিকে দেখতে পায়। তাদের কাছে এসে সে শুধোয়, ধুলোড়ি কতদূরে?

মোহন বলে—ওই তো দেখা যাচ্ছে। আমরা ওখানেই থাকি।

লোকটা খুশী হয়ে বলে—বেশ হয়েছে, তোমরা ডাকু রায়কে চেনো?

মোহন বলে—তাকে কে না জানে? ও তার মেয়ে—এই বলে কুসমিকে দেখায়।

লোকটা বলে—বেশ! বেশ! খুকী, আমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে চলো দেখি, আমি অনেক দূর থেকে আসছি, আর খুব জরুরি কাজে আসছি।

মোহন ও কুসমি উঠে পড়ে তার সঙ্গে চলে। যাবার সময়ে দীপ্তির জন্য ফুল নিয়ে যেতে ভুল হয়।

লোকটা ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে চলে, ওরা দুজনে তার পাশে পাশে চলতে থাকে।

ছোট ধুলোড়ির কাছে এসে পড়লে মোহন লোকটাকে বলে—কুসমি আপনাকে ঠিক নিয়ে যাবে—এই বলে সে ধুলোড়ির দিকে চলে যায়। কিছু দূরে গিয়ে দেখে কুসমি ঘোড়সোয়ারকে নিয়ে তাদের বাড়ির কাছে গিয়ে উঠল।

কুসমি দূর থেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে—ওই যে বাবা বসে তামাক খাচ্ছেন—তুমি গিয়ে দেখা করো গে—

এই বলে সে খিড়কি দরজার দিকে অন্তর্হিত হয়।

দ্বিপ্রহরের নিদ্রার অন্তে বৈঠকখানা ঘরের ফরাসের উপরে বসে ডাকু রায় আলবোলাতে তামাক খাচ্ছিল—এমন সময় লোকটা গিয়ে হাজির হয়।

ডাকু রায় নূতন লোক দেখে কণ্ঠে বজ্রের আওয়াজ তুলে শুধোয়—কে? কি চাই?

লোকটা ঘোড়ার লাগাম ঘরের খুঁটির সঙ্গে বাঁধতে বাঁধতে বলে কর্তা, আপনার কাছেই এসেছি।

এই বলে সে ভিতরে ঢুকে পড়ে।

ডাকু রায় বলে—বসো।

শুধোয়—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

লোকটা ফরাসের একদিকে বসে বলে—কর্তা, বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

ডাকু রায় আলবোলার নলে গোটা কয়েক শক্ত টান মেরে বলে—বিপদে না পড়লে আমার কাছে কেউ আসে না তা জানি।

বোধ করি সে একটু খুশী হয়।

বলে—তা বিপদটা কি শুনতে পাই?

লোকটা তখন বলতে আরম্ভ করে—কর্তা, আমি গুরুদাসপুরের রায়বাবুদের কর্মচারী, সেখান থেকে আসা হচ্ছে।

ডাকু রায় বলে—বটে !

কথোপকথনের মাঝে মাঝে ওই 'বটে' অব্যয় প্রয়োগ তার একরকম মুদ্রাদোষ।

লোকটা বলে—রায়বাবু আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন—

ডাকু রায় বলে—বটে !

লোকটা বলে—পরশুরামের দল রায়বাবুদের বাড়িতে আজ ডাকাতি করতে আসবে বলে কাল চিঠি পাঠিয়েছে—রায়বাবু মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

ডাকু রায় বলল—বটে ! তার আমি কি করব ?

লোকটা বিনীতভাবে বলল—এখন কর্তাই ইচ্ছা করলে আমাদের রক্ষা করতে পারেন। পরশুরামের দলের সম্মুখে এক আপনি ছাড়া কেউ দাঁড়াতে পারবে না।

ডাকু রায় বলল—কেন তোমাদের গাঁয়ে কি পুরুষ মানুষ নেই ? গুরুদাসপুর তো বড় গ্রাম বলেই শুনেছি।

রায়বাবুদের কর্মচারী বলল—লোকজন লেঠেল সর্দার আমাদের কিছুরই অভাব নেই, তবে তাদের উপরে সর্দারি করবার লোকের অভাব। আপনি দয়া করে গিয়ে দলপতি না হলে গেরস্থ ধনে প্রাণে মারা যাবেন।

লোকটি বলে যায়—আজ সকালে উঠেই চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় চিঠিখানা পাওয়া গেল। চিঠি পড়ে কর্তার মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি গাঁয়ের প্রধান পরামানিকদের ডাকিয়ে এনে সবিস্তারে সব খুলে বললেন। তারা সবাই বলল—কর্তা, আমরা তো আছিই—কিন্তু আমাদের উপরে সর্দারি করতে পারে—এমন একজন লোক দরকার—কিন্তু তেমন লোক কোথায় ?

তখন আমি কর্তাকে বললাম—হুজুর, ছোট ধুলোড়ির রায় কর্তা ছাড়া আর কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

ডাকু রায় বলল—কেন, তোমাদের রায়-কর্তা কি আমার নাম শোনেন নি ?

লোকটা বুঝল—কথাটা ও ভাবে বলা ঠিক হয় নি, বলল—সর্বনাশ, কর্তার নাম এ মুল্লুকে না শুনেছে কে ? তবে চিঠি পেয়ে রায়বাবুর মাথা কি ঠিক

ছিল? এই দেখুন না কেন, আমি ওবাড়িতে আজ তিরিশ বৎসর কাজ করছি—আমার নাম কদম সরকার, আমার বাবার নাম কমল সরকার, আমার ছেলের নাম বিমল সরকার! রায়-কর্তার মনের এমনি অবস্থা হয়েছে যে বললেন—বিমল সরকার, তুমি এখনি ঘোড়া ছুটিয়ে ধুলোড়িতে যাও। তখনি আবার শুধরে নিয়ে বললেন, কমল সরকার তুমি এখনি যাও—কদম নামটা আর কিছুতেই তাঁর মনে এল না।

ডাকু রায় বলল—গুরুদাসপুর কতখানি পথ?

কদম সরকার বলল—এখন তো বিল শুকনো—সোজা পথে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে পাঁচ ক্রোশের বেশি হবে না—সন্ধ্যা না লাগতেই গিয়ে পৌছতে পারা যাবে।

ডাকু রায় লোকটাকে শুধোল—আপনি এ গাঁয়ে আগে কখনো এসেছেন কি?

সে বলল—না।

ডাকু রায় শুধোল—তবে আমার বাড়ির পথ চিনলেন কি করে?

কদম সরকার বলল—আজ্ঞে, কর্তার ছোট মেয়েটির সঙ্গে পথ দেখা কি না?

তারপরে ডাকু রায়কে খুশী করবার উদ্দেশে বলল—মেয়েটি দেখতে যেমন সুলক্ষণা তেমনি বুদ্ধিমতী! আর হবেই বা না কেন? কর্তার সন্তান তো বটে!

ডাকু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—তার দেখা পেলেন কোথায়?

কদম বলল—একটা পুকুরের কাছে বসে দুজনে কুল খাচ্ছিল।

বিস্মিত ডাকু শুধোল—দুজনে? আর কে ছিল?

কদম সরকার বলল—আর একটি ছোট ছেলে।

ডাকু রায়ের ভুরু কঠিন হয়ে উঠল, সে বাড়ির ভিতর চলল।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে ডাকল—কুসমি—

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কুসমি বলল—কি বাবা?

ডাকু বলল—আবার তুই মোহনের সঙ্গে কুল খেতে গিয়েছিলি কেন?

কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলেই চলত, কিন্তু নির্বোধ বালিকা বুঝল না, নিজের দোষ লাঘব করবার আশায় সে বলল—দীপ্তিবাবু কুল আনতে পাঠিয়েছিল কিনা ?

এবারে ডাকু গর্জে উঠল—বলল—তুই কি দীপ্তিবাবুর ঝি, না, চাকরানী যে তার জন্যে কুল কুড়োতে যাবি ! মোহন নাপিত তার খানসামার কাজ করতে পারে—এরপরে তো তার খানসামাই হবে।

তারপর নিজের মনেই বলতে লাগল—এত বড় সাহস ! ডাকু রায়ের মেয়েকে কুল কুড়োতে পাঠায় ! বেটা হাড় বজ্জাত !

শেষোক্ত অংশ কার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তা বুঝতে পারা গেল না।

ক্রুদ্ধ শিশু যেমন অন্ধভাবে ঢিল ছুঁড়তে থাকে অনেকটা তেমনিভাবেই ডাকু রায় ওই অংশটি নিক্ষেপ করল—বেটা হাড় বজ্জাত !

তারপরে চটি চটপট করে বৈঠকখানায় ফিরে এসে লোকটাকে বলল—না, আমার যাওয়া হবে না।

কদম সরকার কিছুই বুঝতে না পেরে বলল—হুজুর, তা হলে যে আমরা ধনে প্রাণে মারা পড়ব।

ডাকু বলল—মারা পড়বে কেন ? এ গাঁয়ে আরও বীর পুরুষ আছে—তার কাছে যাও !

কদম সরকার কিছুই বুঝতে পারে না।

ডাকু রায় ডাকল—ওরে নৈমুদ্দি, একে কুঠিবাড়ির পথটা দেখিয়ে দে তো।

নৈমুদ্দি বৈঠকখানার আঙিনায় এসে দাঁড়ায়।

ডাকু বলে—সরকার তুমি নৈমুদ্দির সঙ্গে যাও, আমার চেয়েও বড় বীর পুরুষ এই গ্রামে আছে—তাক গিয়ে ধরো—সে তোমাদের যেন রক্ষা করে।

কদম সরকার নূতন করে কাকুতি মিনতি করবার ভাষা সন্ধান করতে লাগল—কিন্তু প্রয়োজনীয় ভাষার আবির্ভাবের পূর্বেই ডাকু রায় অন্তর্ধান করল।

নৈমুদ্দি বলল—সরকার মশাই আর বসে থেকে লাভ নেই। মেঘ একবার চলে গেলে কি ফিরে আসে? এখন চলেন কুঠিবাড়ির বাবু যদি কিছু করতে পারেন।

বেশ বুঝতে পারা যায় যে নৈমুদ্দি অন্তরাল থেকে ভিতর-বাইরের সমস্ত কথাই শুনতে পেয়েছে।

অগত্যা কদম সরকার ঘোড়া খুলে নিয়ে নৈমুদ্দির সঙ্গে কুঠিবাড়ির দিকে চলল।

তাঁতের মাকুটা আগে পিছে ছুটোছুটি করে বস্ত্র বুনে তোলে। গল্পের লেখক গল্পের মাকু, তাকে আগে পিছে ছুটতে হয়, তবেই গল্প বয়ন সম্ভব। ডাকু রায় ও দর্পনারায়ণের সম্বন্ধটা বুঝবার জন্য আমাদের কিছুদিন পিছিয়ে যেতে হবে।

দর্পনারায়ণ কুঠিবাড়িতে আসবার আগে ডাকু রায় ছিল ধুলোড়ির প্রধান। সে কারো বাড়িতে যেত না, সবাই তার বাড়িতে আসত, তাদের মুখেই সে গাঁয়ের সংবাদ পেত। দর্পনারায়ণ কুঠিবাড়িতে এলে সংবাদ সে পেয়েছিল —কিন্তু তেমন গ্রাহ্য করে নি, হয়তো ভেবেছিল, লোকটা আপনি এসে বশ্যতা জানিয়ে যাবে।

একদিন ডাকু রায় তার বৈঠকখানা বাড়ির বারান্দায় প্রকাণ্ড একটা মোড়া পেতে বসে তামাক খাচ্ছে, এমন সময়ে দেখতে পেল একজন অপরিচিত ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে তার বাড়ির সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছে। সে চমকে ওঠে জিজ্ঞাসা করল —কে যায়? অশ্বারোহী কোন উত্তর করল না, একবার মাত্র ফিরে তাকিয়ে যেমন যাচ্ছিল তেমনি চলল। তার এই অবহেলায় ডাকু রায় বিস্মিত হল। বিস্ময়ের কারণ এই যে, ডাকু রায়ের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে কারো ঘোড়ায় চড়ে

বা ছাতা মাথায় দিয়ে যাবার উপায় ছিল না। তার বাড়ির কাছে এসে অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নেমে, ছাতা মাথায় লোক ছাতা বন্ধ করে, ধীরে ধীরে সেলাম করে যেত। ডাকু রায়ের প্রাধান্য স্বীকারের এইগুলো ছিল চিহ্ন। এই প্রথা এতদিন ধরে চলছে যে আজ হঠাৎ তা অস্বীকৃত হতে দেখে ডাকু রায়ের ক্রোধ ও বিস্ময়ের অন্ত রইল না, তবে ক্রোধের চেয়ে বিস্ময়ই সে বেশী অনুভব করল। ক্রোধটা যদি অধিক হত, নিজের অনুচরদের বলত যে ঘোড়া কেড়ে নিয়ে লোকটাকে তাড়িয়ে দে তো রে। কিন্তু বিস্ময়ের আধিক্যে সে হুকুম দিতে ভুলে গেল। যখন আত্মস্মৃতি ফিরে এল, সে তাকিয়ে দেখল যে লোকটা দূরে চলে গিয়েছে। ডাকু তখনি একটা ঘোড়ায় চেপে লোকটার উদ্দেশ্যে ছুটল। ডাকু রায় পাকা ঘোড়সোয়ার।

ডাকুকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখে পূর্বদৃষ্ট ঘোড়সোয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল —তখন সেই শুষ্কজল বিলের মাঠে দুই ঘোড়া আর দুই ঘোড়সোয়ার একজন আর একজনকে অনুসরণ করে ছুটতে লাগল। কিন্তু এমন ভাবে দীর্ঘকাল ছুটবার অবকাশ ছিল না, কিছুক্ষণ পরেই দুজনে জলের সীমানায় এসে পৌছল, একজন কিছু আগে আর একজন তার কিছু পরে।

ডাকু রায় পূর্বোক্তের উদ্দেশ্যে বলল—কেমন, এখন ঘোড়া থামালে কেন? দাও ছুটিয়ে দাও।

পূর্বোক্ত ব্যক্তি বলল—জলে কি ঘোড়া দৌড়ানো চলে? এসো না সাঁতার দেওয়া যাক।

তুমি সম্বোধনে ক্রোধান্ধ হয়ে ডাকু বলল—তুমি কে হে? যাকে-তাকে যে তুমি বলো?

পূর্বোক্ত লোকটি বলল—তাই তো, বড় ভুল হয়ে গিয়েছে—হুজুর বলতে হবে, না, কর্তা বলতে হবে, তা ঠিক করতে না পারায় তুমি বলে ফেলেছি।

লোকটা যদি ডাকুকে আঘাত করত তবু সে বুঝি এত অপমানিত বোধ করত না—বিদ্রূপ তার অসহ্য। কোন আত্মম্ভরী ব্যক্তি বিদ্রূপ সহ্য করতে পারে? আত্মম্ভরিতা মানেই নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে অত্যধিক চৈতন্য, বিদ্রূপের

হালকা হাওয়ায় তাকে লঘু প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলে সে ব্যক্তি সইতে পারবে কেন?

ডাকু রায় চীৎকার করে বলল—তুমি কে হে বাপু? থাক কোথায়?

ঘোড়সোয়ার বলল—হুজুরের পুকুর পাড়ের ওই কুঠিবাড়িটায়।

ডাকু বুঝল যে এই সেই লোক যে কুঠিবাড়িটা এসে দখল করে বসেছে, বলল—ওহো, তুমিই কুঠিবাড়িতে এসে উঠেছ? তা কোথা থেকে আসা হয়েছে শুনি?

দর্পনারায়ণ বলল—কোথা থেকে যে আসা হয়েছে এই প্রশ্নই তো মানুষে চিরকাল করেছে, উত্তর জানা থাকলে কি আর এই দুর্দশা হয়?

ডাকু রায় বলল—বিদ্রূপ করা হচ্ছে বুঝি!

দর্পনারায়ণের উত্তর—হুজুরের মনে এখনো সন্দেহ আছে দেখছি।

ডাকু রায় সোজা বিষয়ান্তরে এসে উপস্থিত হল, বলল—আমার বাড়ির সম্মুখ দিয়ে তুমি ঘোড়ায় চড়ে আসছিলে কেন?

দর্পনারায়ণ বলল—তাতে ক্ষতি কি হয়েছে?

ডাকু রায় গর্জে বলল—বুঝতে পার না? আমার অপমান হয়েছে।

দর্পনারায়ণ বলে—এখন থেকে ওতে আর অপমানিত বোধ করা উচিত হবে না, কারণ এখন তো হামেসাই আমাকে ওই পথে ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে।

ডাকু গর্জন করে বলে—দেখা যাবে কত বড় সাহস তোমার!

দর্পনারায়ণ শান্ত ভাবে বলে—হুজুরের অপমানবোধ উগ্র বলেই আমার সাহসকে অসাধারণ মনে হচ্ছে, নইলে ঘোড়ায় চড়ে পথ দিয়ে যাওয়ার মধ্যে এমন বিশেষত্ব কি?

ডাকু রায় বলল—জানো এখানে সবাই আমার প্রজা, সবাই আমার অধীন।

দর্পনারায়ণ বলল—জানতাম না।

—এখন তো শুনলে।

—সব শোনা কথা কি সত্যি?

ডাকু রায় আবার গর্জন করে—এখানে এসে তুমি আমার শরিক হয়ে বসতে চাও? সেটি হবে না।

—আমিও তো তাই চাই, জমিদারি করবার ইচ্ছা আমার নেই।

ডাকু রায় বলে—আমার ইচ্ছা আছে।

দর্পনারায়ণ বলে—ইচ্ছার দোষ কি! মানুষের কত ইচ্ছাই না হয়!

ডাকু রায় বলল—শোনো, এখানে হয় তুমি থাকবে, নয় আমি থাকব—দুজনের জায়গা এখানে নেই।

দর্পনারায়ণ প্রকাণ্ড মাঠখানা ইসারায় দেখিয়ে বলল—কেন জায়গার অভাব কি? দুজনেরই স্থান হবে।

ডাকু রায় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আচ্ছা দেখা যাবে।

তারপরে ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে প্রস্থান করল।

ডাকু রায় চলে গেলে দর্পনারায়ণ সমস্ত দৃশ্যটা স্মরণ করে অট্টহাস্য করে উঠল।

এই তাদের প্রথম মিলনদৃশ্য, এবং এ পর্যন্ত শেষ মিলনদৃশ্য। তারপর থেকে দুজনে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সুমেরু-কুমেরুর ন্যায় অটলভাবে বিরাজ করতে লাগল।

সুযোগ পেলেই ডাকু রায় প্রকাশ্যে দর্পনারায়ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করত কিন্তু দর্পনারায়ণ ডাকুর নামটা অবধি উচ্চারণ করত না।

ডাকু নিতান্ত অন্তরঙ্গদের জিজ্ঞাসা করত—কুঠিয়াল লোকটা কি বলে?

তারা বলত—হুজুরের নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করবার সাহস তার নেই।

এই স্পষ্ট অবহেলায় ডাকুর অন্ধ আক্রোশ আরও বেড়ে ওঠে, সে দর্পনারায়ণকে অপমানিত করবার পথ সন্ধান করে—কিন্তু পথ কোথায়?

নৈমুদ্দির সঙ্গে কদম সরকার যখন কুঠিবাড়িতে এসে পৌছল দর্পনারায়ণ তখন পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসে ছিপ হাতে মাছ ধরছিল। কুঠির হাতার

মধ্যে একটা মাঝারি পুকুর ছিল, তার দক্ষিণ দিকে একটা বাঁধানো ঘাট, ঘাটের কাছে দুটো আতা গাছ, সেই গাছের তলায় বসে ছিপ ফেলে মাছ ধরা দর্পনারায়ণের একটা বাতিকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কখনো তার ছিপে যে মাছ পড়েছে এমন কেউ দেখে নি, বস্তুত মাছ ধরবার নামে মাছগুলোকে আহার্য দান করাই যেন তার উদ্দেশ্য ছিল। খুব সম্ভব ধুলোউড়ির জীবনের সুদীর্ঘ অবসর কাটাবার জন্যেই এইভাবে সে ঘাটে এসে বসত।

নৈমুদ্দি এসে সেলাম করে দাঁড়াল, কদম সরকার ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করল। দর্পনারায়ণ নৈমুদ্দিকে চিনত, শুধাল—নৈমুদ্দি, খবর কি ?

নৈমুদ্দি কদমের উদ্দেশ্যে বলল—সরকার মশাই, বাবুকে সব খুলে বলুন।

কদম সরকার ঘাটের বাঁধানো চাতালের একান্তে বসে আরম্ভ করল—হুজুর, আমি বড় দুর্ভাবনায় পড়ে আপনার কাছে এসেছি, এখন আপনি মারতে ইচ্ছে করলে মারতে পারেন, রাখতে ইচ্ছা করলে রাখতে পারেন।

এই বলে তার ধুলোউড়িতে আসবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করল।

সমস্ত বিষয় শুনে দর্পনারায়ণ স্বীকার করল যে এক সময়ে লাঠি বন্দুকে ঢাল তলোয়ারে তার সামান্য দক্ষতা ছিল বটে—কিন্তু অনেক দিন হল লাঠালাঠির পর্যায় সে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু কদম সরকার এত সহজে তাকে নিষ্কৃতি দিতে রাজি হল না, সে বলল—সাঁতার-জানা মানুষ কি কখনো সাঁতার ভোলে, জলে পড়লেই সে ভাসতে শুরু করে।

সে আরও বলল—হুজুর ওস্তাদের হাত হাতিয়ারের অপেক্ষায় থাকে। আসল কথা হাতিয়ার হচ্ছে বুকের পাটা, মনের সাহস। হুজুর, আমরা ভীরু কাপুরুষ নই, আমাদের গাঁয়ে হাতিয়ারের অভাব নেই, হাতিয়ার চালাতে পারে এমন বেটা ছেলেও অনেক, কেবল একজন সর্দারের অভাব। এখন হুজুর যদি না আসেন তবে ডাকাতের দল গ্রামকে গ্রাম লুটে নিয়ে যাবে, পরশুরামের দলের নামে সবাই ভয়ে অস্থির।

এবারে দর্পনারায়ণ হেসে বলল, কিন্তু সরকার, আমি যে এত বড় সর্দার তা জানলে কেমন করে, তোমার সঙ্গে তো আমার পরিচয় ছিল না।

কদম সরকার ভাবল কি উত্তর দেবে? ঠিক উত্তর দিতে গেলে ডাকু রায়ের বিরুদ্ধে বলতে হয়, কিন্তু না বলেই বা উপায় কি? কারণ ডাকু রায়ের সাহায্য পাবার আশা তো গিয়েছেই, এখন দর্পনারায়ণকে আর হারানো চলে না। আবার ডাকু রায়ের নামে কি বলতে কি বলবে শেষে ডাকু রায়ের হাতেই না তার প্রাণ যায়! সে একবার নৈমুদ্দির দিকে তাকাল, দেখল তার চোখে সহানুভূতির অভাব নেই, তখন সে যা থাকে কপালে বলে আরম্ভ করলো—হুজুর, ছোট ধুলোড়ির কর্তার কাছে আপনার নাম শুনলাম।

ছোট ধুলোড়ির কর্তা বলতে যে ডাকু রায়কে বোঝায় দর্পনারায়ণ তা জানত।

কদমের স্বীকারোক্তির সূত্র ধরে অনেক কৌশলে সমস্ত বৃত্তান্তটা দর্পনারায়ণ আদায় করে নিল। এবারে তার মনঃস্থির করবার পালা। শেষের ঘটনাটুকু শুনবার আগেই যাওয়ার জন্যে সে এক রকম তৈরী হয়ে ছিল, বিপন্নের আহ্বান, লাঠালাঠির নেশা তার বীর চিত্তকে উত্তেজিত করে তুলেছিল, এমন সময়ে ডাকু রায়ের প্রচ্ছন্ন ধিক্কার তার সঙ্কল্পকে চূড়ান্ত সম্পূর্ণতা দিল। সে কদমের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলল—আচ্ছা, যাবো। তারপরে বলল, তোমার তো ঘোড়া তৈরী।

কদম বলল—হাঁ হুজুর—

তখন দর্পনারায়ণ নৈমুদ্দির দিকে তাকিয়ে বলল—নৈমুদ্দি, তুমি যাবার পথে একবার মুকুন্দকে ডেকে দিয়ে যেয়ো।

নৈমুদ্দি প্রস্থান করল।

দর্পনারায়ণ শুধোল, সরকার, গুরুদাসপুর কতখানি পথ?

কদম বলল, পাঁচ-ছয় ক্রোশের বেশি নয়।

দর্পনারায়ণ আবার বলল—ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে তবে বোধ করি সন্ধ্যার আগেই পৌছানো যাবে।

কদম বলল—অন্তত প্রথম প্রহরের মধ্যেই পৌছব, ওরা দ্বিতীয় প্রহরের আগে আসবে না।

এমন সময়ে মুকুন্দ উপস্থিত হল।

দর্পনারায়ণ বলল—মুকুন্দ আমার ঘোড়াটা তৈরী করে নিয়ে আয়, একটা বন্দুকও দিস, সঙ্গে গুলিবারুদ দিতে যেন ভুলিস না।

মুকুন্দ কোন বিস্ময় প্রকাশ করল না, নৈমুদ্দির কাছে সমস্ত ব্যাপার শুনেছে বলেই মনে হয়।

দর্পনারায়ণ বলল—যা আর দেরি করিস নে, এখনই রওনা হব।

তার পরে কদমকে বলল—সককার, তুমি বসো আমি আসছি।

এই বলে সে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

দীপ্তিনারায়ণ তখন একটা কাঠের বাক্সকে ঘোড়া করে চেপে বসেছে, কিন্তু ঘোড়াটার চলতে তেমন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ পিতাকে আসতে দেখে সে বলে উঠল—বাবা, ঘোড়াটাকে একটু মার তো। চলতে চাইছে না।

দীপ্তি এখন ড়, র, উচ্চারণ করতে পারে, বর্ণমালার কোন বর্ণ ই এখন তার জিহ্বার বাধা নয়।

দর্পনারায়ণ সস্নেহে শুধাল—কোথায় যাচ্ছ ?

দীপ্তি বলল—ডাকাত মারতে।

দর্পনারায়ণ কৃত্রিম আগ্রহ প্রকাশ করে বলল—কোথায় ডাকাত ?

দীপ্তি ঘরের এক কোণে থান দুই লাঠি দেখিয়ে দিয়ে বলল—ওই যে ডাকাত।

দর্পনারায়ণ বলল—তাই তো, ডাকাতই বটে। ওটা কোন গ্রাম ?

দীপ্তি বলল—জোড়াদীঘি।

দর্পনারায়ণের অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল—হায়রে, পিতাপুত্রের মন এমন ছাঁচে গড়ে উঠেছে, যেদিকে অগ্রসর হও না কেন, দুচার ধাপ পরেই জোড়াদীঘিতে এসে পৌঁছতে হবে।

কিন্তু কাঠের ঘোড়া তেমন সচল নয়, কাজেই আরোহীকে কষ্ট করে ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে যেতে হল। ডাকাত দুটোর কাছে পৌঁছে দীপ্তি ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল, তার পরে একখানা লাঠি দিয়ে সজোরে তাদের

মারতে লাগল। ডাকাতের প্রাণ যতই কঠিন হোক না কেন এ আঘাত বেশিক্ষণ সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না, ভেঙে পড়ল। দীপ্তিনারায়ণ বিজয়োল্লাসে হেসে উঠে পিতার দিকে চাইল, তার মনে হল পিতার উল্লাসও বড় কম হয় নি।

এমন সময়ে বাইরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। দর্পনারায়ণ দীপ্তিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—চলো, এবার আমি ঘোড়ায় চাপব, তুমি দেখবে।

বাইরে এসে দেখল, মুকুন্দ ঘোড়া সাজিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পুত্র শুধোল—বাবা কোথায় যাবে ?

পিতা বলল—ডাকাত মারতে।

পুত্র সোৎসাহে শুধোল—জোড়াদীঘিতে ?

পিতা এবার হেসে বলল—না বাবা।

পুত্রের উৎসাহ কমল বলে পিতার মনে হল। পিতা বলল—তুমি মুকুন্দর কাছে থাক বাবা, আমি ডাকাত মেরে আসি।

পুত্র মুকুন্দর কোলে যেতে অস্বীকৃত হল না। যদি সে জানত যে পিতা তার মতো ডাকাত মারতে জোড়াদীঘিতে চলেছে, তবে খুব সম্ভব মুকুন্দর কোলে না চড়ে সে পিতার কোলের কাছে ঘোড়ার পিঠে গিয়ে চাপত। কিন্তু সে ভাবল পিতা তো জোড়াদীঘি যাচ্ছে না, অন্য গাঁয়ের ডাকাত মারবার জন্যে তার কোনোরূপ আগ্রহ নেই, পিতার আগ্রহেরই বা কারণ কি গভীরভাবে বোধ হয় সেই রহস্য সে চিন্তা করতে লাগল।

দর্পনারায়ণ মুকুন্দর উদ্দেশ্যে বলল—তোরা সাবধানে থাকিস, আমি কাল সকালের দিকেই ফিরব।

তার পরে কদমের দিকে ফিরে বলল—সরকার চলো।

পরমুহূর্তেই সপাত করে দুইখানা চাবুকের শব্দ উঠল—দুটি ঘোড়া আটখানা পদধ্বনি ও চৌষট্টি খানা প্রতিধ্বনি তুলে গুরুদাসপুরের দিকে ছুটল। তখন শীতের অপরাহ্ণ শীতল হয়ে উঠেছে।

চলন বিলকে যদি একটি সুবৃহৎ গোলাকার হ্রদ বলে কল্পনা করা যায়, তবে ধুলোউড়ি ও গুরুদাসপুর তার পরিধির পাশে দুটি বিন্দু, আট-দশ ক্রোশের তফাতে, কিন্তু কার্যত তাদের মধ্যে দূরত্ব পাঁচ-ছয় ক্রোশের। বর্ষার সময়ে এক গ্রাম্ থেকে সোজা আর-এক গ্রামে পাড়ি দেওয়া যায়, শীতকালে জনশূন্য মাঠ পার হয়ে পথিকের রাস্তা পড়ে, ঘোড়সোয়ারও যেতে পারে। সেকালে রেল, ষ্টীমার, মোটর গাড়ি ছিল না, তাই ঘোড়ার চলন এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল ; বর্তমানে অশ্বের শক্তির স্থান অশ্বশক্তিতে অধিকার করে নিয়েছে।

এখন শীতকাল। দর্পনারায়ণ ও কদম সরকার গ্রাম ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। দর্পনারায়ণ পাকা সোয়ার, কদম সরকারও কম যায় না, তবে দর্পনারায়ণের তুলনায় নীরেস। কিন্তু তাতে কদম দুঃখিত না হয়ে বরঞ্চ খুশিই হল, কারণ সে বুঝল তাদের বিপদের সহায়রূপে যাকে পেয়েছে সে পাকা ঘোড়সোয়ার। সে আরও ভাবল এত বড় পাকা সোয়ার নিশ্চয় ঢাল-তলোয়ারেও অনুরূপ পোক্ত হবে। ইতিপূর্বে সে দর্পনারায়ণের নামটিও শোনে নি, কিন্তু তার বলিষ্ঠ বীরমূর্তি, আর সংযত অভিজাত ব্যবহার কদমের মনে আশ্বাস দিয়েছিল যে, হাঁ, এর দ্বারা কাজ উদ্ধার হবে বটে। সে ভাবছিল, ঘোড়া দ্রুত ছুটছে, সে ভাবছিল যে তার মনিব ও গাঁয়ের লোক ভাতু রায়কে না দেখে হতাশ হবে, কিন্তু সে হতাশ্বাস কতক্ষণের জন্য ? দর্পনারায়ণের বীরত্বে সকলে কদমের বুদ্ধির তারিফ করতে থাকবে, বলবে, হাঁ, কমল সরকারের ছেলে বটে !

ঘোড়া ছুটছে। শীতকালের সন্ধ্যার অন্ধকার অন্য ঋতুর চেয়ে একটু গাঢ়তর, ধোঁয়ায় এবং কুয়াশায়, কিন্তু বিল অঞ্চলের শীতকালীন সন্ধ্যার অন্ধকার আরও একটু গাঢ় হয়, ধোঁয়া এবং কুয়াশার সঙ্গে এসে মেলে জলাজমির বাষ্প। আকাশে এক-এক পোঁচ অন্ধকারের তুলি পড়ছে, বুনো হাঁসের দল ঝাঁক বেঁধে বেঁধে অন্তরীক্ষে শব্দের তোরণ গেঁথে দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাচ্ছে, হাঁসের

গতির দ্রুতি ও বাদুড়ের গতির মন্থরতা কান অনায়াসে ধরতে পারে, ওই প্রথম প্রহরের শিবাধ্বনির বেড়াজাল দিগন্ত ঘিরে নিক্ষিপ্ত হল।

—কি সরকার হাঁপিয়ে পড়লে নাকি?

দর্পনারায়ণ পাশে ফিরে দেখল কদম নেই, এবারে আরও জোরে বলল—সরকার কোথায় গেলে?

এবারে সে থামল। ঘোড়ার হাঁসফাঁসানি ছাপিয়ে কানে এল আর-একটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ। অল্পক্ষণের মধ্যে কদম সরকার এসে পড়ল। সত্যই সে পিছিয়ে পড়েছিল।

দর্পনারায়ণ শুধোল—কি সরকার, পিছিয়ে পড়েছিলে? কদম বলল—না, কর্তা, আপনি এগিয়ে পড়েছিলেন। আমি আট বছর বয়স থেকে ঘোড়া চাপছি, আমাদের অঞ্চলে পয়লা ঘোড়সোয়ার কদম সরকার, কিন্তু হুজুরের কাছে আজ হার মানলাম।

দর্পনারায়ণ বলল—নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই বলল—আজকাল ঘোড়ায় চড়া তো এক রকম ছেড়েই দিয়েছি, তার পরে জিজ্ঞাসা করল—কি, একটু জিরিয়ে নেবে নাকি?

কদম বলল—না হুজুর, জিরোতে গেলে ঘোড়া আর চলতে চাইবে না, আমার ঘোড়া আজ সারাদিন ছুটছে।

দর্পনারায়ণ বলল—তবে একটু জোর হাঁকিয়ে চলো। কদমের ইচ্ছা বলে যে হুজুর একটু ধীরে হাঁকিয়ে চলুন, কিন্তু বলতে পারল না।

দর্পনারায়ণ বলল—বেশ তবে পাশাপাশি চলো। আবার দুই ঘোড়া ছুটল, এবার পাশাপাশি।

দর্পনারায়ণ শুধোল—এই পরশুরামের দলটা কার? পরশুরাম কে?

কদম বলল—পরশুরাম? তা জানিনে, কেউ জানে না।

দর্পনারায়ণ—সে আবার কেমন কথা! যার ডাকাতের দলের ভয়ে গাঁয়ের লোক অস্থির, তার পরিচয় জানো না!

কদম—পরশুরাম অনেককাল মরেছে।

দর্পনারায়ণ,—তবে আবার ভয় কাকে ?

কদম—হুজুর, ডাকাতের সর্দার মরে, দল তো মরে না।

দর্পনারায়ণ—তার মানে ?

কদম—পরশুরামের নামেই এখনো দলের নাম।

দর্পনারায়ণ—এখন কে সর্দার ?

কদম—তা জানিনে, অল্পদিন হয়েছে।

দর্পনারায়ণ—লোক কেমন ?

কদম—ডাকাতি করে লোক কেমন ?

দর্পনারায়ণ—ডাকাত হলেই কি খারাপ হয়।

কদম—তা হয় না, তবে এ লোকটা নাকি সিন্ধুক নিয়েই খুশি নয়, অন্দর মহলেও হাত বাড়ায়।

দর্পনারায়ণ - বটে ! বটে !

কদম—সেই জন্যই তো ভয় বেশি।

দর্পনারায়ণ শুধু বলল—আচ্ছা দেখা যাবে। দুজন অশ্বারোহীই হাঁপিয়ে পড়েছিল, তাই তাদের কথোপকথন কেমন কাটা-কাটা, ঘোড়ার তালে তালে কথাগুলোও যেন লাফাচ্ছে।

মাঝে মাঝে কদমের ঘোড়া পিছিয়ে পড়ে, দর্পনারায়ণ পিছু ফেরে, সরকারের ঘোড়াতে চাবুক পড়ে—ঘোড়ার মুখে চোখে, জন্তুটা রেগে উঠে প্রাণপণ ছোটে—কিন্তু আজ বেচারা সত্যিই ক্লান্ত।

কথাবার্তা বেশিক্ষণ চলে না ; নীরবে দুজনে ঘনতর ছায়ার মতন ছুটতে থাকে, জোনাকি চমকায়, সামনেপড়া শিয়ালটা ছুটে পালায়, উড়ন্ত পাখির মুখ থেকে ফল খসে পড়ে, হুতুমের হুম-হুম কানে আসে, দল-ছাড়া গোরুর হাম্বাধ্বনি পথের সন্ধান চায়, প্রহরাতীত রাত্রির মালিন্যমুক্ত আকাশে তারার দল আসন নিতে থাকে।

হঠাৎ কদম সরকার চীৎকার করে ওঠে—হুজুর ওই গাঁয়ের আলো !

দর্পনারায়ণ বলে—বটে !

কদম আবার বলে—হাঁ হুজুর, গোয়ালাদের বাড়ির !

গাঁয়ের আলোই বটে ! দু-একখানা খড়ো ঘর দেখা যায়, গোহালের খড়পোড়া গন্ধ আসে, কুকুরের ডাকের ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা মনুষ্যকণ্ঠও যেন কানে এসে পৌছয়—গ্রামই বটে।

এবারে চেনা বাতাসে উৎসাহিত হয়ে কদমের ঘোড়া এগিয়ে গেল—দর্পনারায়ণ পিছনে পড়ল। সে ভাবল, ভালই হল—এবার পথ চেনার দরকার হবে।

বিলের মধ্যে পথ ছিল, কেবল দিক চিনলেই চলত, এবারে পথ পাওয়া গিয়েছে, এবারে চেনা চোখের প্রয়োজন। কদমের ঘোড়া পথ চিনিয়ে চলল।

নৈমুদ্দির কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে ডাকু রায় গুম হয়ে বসে রইল, কারো সঙ্গে কথা বলল না। তারপরে সন্ধ্যার অল্প আগে বন্দুক নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কোথায় গেল কাউকে বলল না, কেউ জানতে পারল না।

এখন গুরুদাসপুর রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একটি বন্দর-স্থান। আমরা যে-সময়ের কথা বলছি তখন গুরুদাসপুর ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল মাত্র। এই গ্রামে একঘর বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল, তেজারতি, মহাজনি করে সে কিছু টাকা করেছিল, গাঁয়ের মধ্যে সে-ই একমাত্র ধনী ব্যক্তি। লোকে তাকে রায় মহাশয় বলত। এই রায় মহাশয়ের বাড়িতেই পরশুরামের দল ডাকাতির নোটিশ পাঠিয়েছিল। সেকালে বড় বড় নামকরা ডাকাতের দল পূর্বাহ্নে বিজ্ঞাপিত করে লুট করতে আসত। বলাবাহুল্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই গাঁয়ের লোক লাঠিসোটা ঢাল তলোয়ার শড়কি বন্দুক নিয়ে তাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করতে ভুলত না। অনেক সময়ে গাঁয়ের লোক জিতত, ডাকাতের দল ধরা পড়ে মার খেয়ে,

মরে দুষ্কার্যের প্রায়শ্চিত্ত করত। আবার ডাকাতের দল জিতলে গৃহস্থের টাকাকড়ি লুটে নিয়ে চলে যেত, মেয়েদের গায়ে কেউ হাত দিত না। ডাকাতদের দেবী কালী, মায়েরা সেই কালীর অংশ, কাজেই মেয়েদের দেহ তারা পবিত্র মনে করত। তখন দেশের মধ্যে চুরি-ডাকাতি লুটপাটের অন্ত ছিল না সত্য। কিন্তু প্রতিকারের ব্যবস্থাও লোকের হাতে ছিল। এখনকার মতো মার খেয়ে থানায় গিয়ে দারোগা বাবুকে ভেট দিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হতে হত না, অপমান তো উপরি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, রায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমবেত, সকলে নীরবে কদম সরকারের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করছে। তাদের এই নীরবতা কিংকর্তব্যজ্ঞানের অভাবে নয়, কর্তব্য তারা স্থির করেই ফেলেছে, আসল কথা, আলোচ্য বিষয়ের বহুবার আলোচনা হওয়াতে এখন বাক্যালাপে ছেদ পড়েছে। ফরাসের মাঝখানে রায় মহাশয় উপবিষ্ট। রায় মহাশয় বৃদ্ধ—কিন্তু এখনও যৌবনের শক্তির শেষ চিহ্ন তাঁর বিশাল বক্ষে, পুষ্ট বাহুদ্বয়ে, জ্যামুক্ত কোদণ্ডের ন্যায় সুদীর্ঘ শরীরে যে বিরাজমান তাতে সহজেই বুঝতে পারা যায় বয়সকালে তিনি শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তখনকার দিনে সকলেই অস্ত্রচালনায় অভ্যস্ত ছিল, কারণ তখন প্রত্যেকে নিজের নিজের দারোগা, পুলিশ, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। পরাধীনতা শুধু ধন ও সম্মান নয়, মানুষের পৌরুষ অবধি হরণ করে। রায় মহাশয় অপুত্রক, কাজেই আত্মরক্ষার জন্যে এখন তাঁকে অপরের উপরে নির্ভর করতে হয়।

এবারে রায় মহাশয় নীরবতা ভঙ্গ করলেন, তিনি বললেন— আরে, আমাদের মেঘা-ই তো যথেষ্ট, ভিন গাঁ থেকে সর্দার আনতে ইচ্ছা আমার ছিল না।

কেউ তাঁর কথার উত্তর দিল না; প্রথমত তাঁর উক্তি সত্য, মেঘা একাই যথেষ্ট, দ্বিতীয়ত শক্তিতে যথেষ্ট হয়েও সামাজিক মর্যাদায় যথেষ্ট নয়, মেঘা জাতিতে বাগদি, কাজেই উচ্চবর্ণের লোকেরা তার সর্দারি মানতে রাজি নয়। রায়ের কথার উত্তর দিতে গেলে পাছে আসন্ন বিপদের মুখে অপ্রিয় আলোচনা উঠে পড়ে—তাই সকলে নীরব হয়ে রইল।

এক কোণে মেঘা দাঁড়িয়ে ছিল, জামের মতো কালো আর উজ্জল তার শরীর, তার উপরে নিরন্তর তাম্বুল সেবনে ঠোঁট দুটি তেলাকুচার মতো লাল। বন্ধুরা ঠাট্টা করে তাকে বলত কুঁচফল। রায় মহাশয় বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি সস্নেহ পরিহাসে বলতেন, মেঘা আমার উজ্জল-নীলমণি। মেঘা এক কোণ থেকে উত্তর করল—হুজুর, আমিও তো ওই কথাই বলি। এত ভাবনা কিসের? একবার সকলে মিলে লাঠি ধরে দাঁড়ালেই হয়। অন্য গ্রাম থেকে সর্দার আনতে যাবো কেন? আমরা কি ভাড়াটে গুণ্ডা?

মানিক চক্রবর্তী গ্রামের পুরোহিত, যেমন রোগা, তেমনি লম্বা, পাকানো দড়ির মতো শীর্ণ—সে বলল—বাবা উজ্জল-নীলমণি; শাস্ত্রে বলেছে—ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্যে—

কিন্তু মানিক চক্রবর্তীর শ্লোক শেষ হতে পারল না, সকলে এক যোগে বাধা দিয়ে উঠল, 'রাখো তোমার শাস্ত্র,' 'রাখুন আপনার শ্লোক', 'শাস্ত্রের চেয়ে এখন অস্ত্রের দরকার বেশি'—

চক্কত্তি হারবার লোক নয়, ওই শেষের উক্তিটাকে উপলক্ষ্য করে সে বলল—তার ব্যবস্থাও ওই শাস্ত্রেই আছে—

মেঘা বাধা দিয়ে বলল—কি ঠাকুর মশাই, শাস্ত্র দিয়ে কি ডাকাত আটকানো যায়?

চক্কত্তি হার মানবার লোক নয়, ঘোর চাপল্যে কিছুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে বলল—ডাকাত তো তুচ্ছ, স্বয়ং যমরাজকে বাধা দেওয়া যায়।

চক্কত্তি বলতে লাগল—ভেবে দেখো না কেন—সেকালের পরশুরাম পরাজিত হয়েছিল মূর্তিমান শাস্ত্ররূপ রামচন্দ্রের হাতে—

এই পর্যন্ত বলে সগর্বে সে সকলের মুখের দিকে চাইল, এই উক্তির দ্বারা ডাকাতের দলটাকেই আটকে দিয়েছে—এমনি তার ভাব।

রায় মহাশয় বলল—এতক্ষণে তো কদমের ফেরবার কথা, রাত তো অনেক হল।

একজন বলল—ডাকু রায় আসবে তো?

মেঘা বলল—রায় কর্তা, কলম সরকারের আসবার আগে পরশুরামের দল না এসে পড়ে!

চক্কত্তি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—না, না, মধ্যরাত্রির পূর্বে তারা আসবে না।

মেঘা বলল—কেন ওটাও শাস্তরে লেখা আছে নাকি?

চক্কত্তি কি যেন বলতে যাচ্ছিল—হয়তো বলতে যাচ্ছিল—বাবা, মেঘা শাস্ত্রে নেই কি—কিন্তু তা আর বলা হয়ে উঠল না, সবাই উৎকর্ণ হয়ে খাড়া হয়ে বলল—দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ!

উপস্থিত ব্যক্তিদের মুখ থেকে নানা রকম প্রশ্ন এক সঙ্গে বেরিয়ে এলো

কে?

সরকার?

তারা?

এত সকালে?

মেঘা বলল—ঠাকুর মশাইর শাস্ত্র কি বলে?

কিন্তু ঠাকুর মশাই কোথায়? ঘরের মধ্যে কোথাও চক্কত্তির কোন চিহ্ন নাই।

মেঘা বলল—চক্কত্তি মশাই বোধ হয় শাস্তরে কি আছে তাই দেখতে গিয়েছেন।

এমন সময় রায় মহাশয়ের একজন দারোয়ান দৌড়ে এসে বলল—হুজুর, সরকার আসছে।

সবাই এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে উঠল—একা?

দারোয়ানজি বলল—না হুজুর, সঙ্গে আর-একজন আছে।

সবাই কতকটা আশ্বস্ত হল। তবু জিজ্ঞাসা করল—কে?

দারোয়ানজি দূর থেকে দেখেছে, চিনতে পারে নি, কিন্তু এত লোকের সমুখে সে ঠকতে চায় না, কাজেই উত্তর দিল—ডাকু রায় সঙ্গে আছে।

সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

চক্কত্তি সকলের আগে বলল—এ যে হতেই হবে, শাস্ত্রে আছে কিনা—

চক্কত্তি শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করেই সকলের অলক্ষ্যে তক্তাপোশের তলে ঢুকে পড়েছিল, আবার শাস্ত্রে আছে মনে করেই সকলের অলক্ষ্যে সেই নিভৃতস্থান থেকে বহির্গত হয়েছে। অস্ত্রের প্রতি তার বিষম অনাস্থা। কিন্তু তক্তাপোশের কুক্ষিতল আর যাই হোক অস্ত্র নয়, কাজেই সেখানে আশ্রয় লওয়াতে চক্কত্তির অস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ পায়—একথা কখনোই বলা চলে না।

এমন সময়ে দুইজন অশ্বারোহী সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। বৈঠকখানায় জনতা একযোগে বেরিয়ে পড়ল—সেই প্রায়ান্ধকার আঁকাশের তলে তারা চীৎকার করে উঠল—সরকার আর ডাকু রায়।

কদম সরকার বলে উঠল—না হুজুর, তিনি আসেন নি।

জনতার বুক দমে গেল।

কদম সরকার বৈঠকখানার পাশের ঘরে দর্পনারায়ণকে বসিয়ে সোজা গিয়ে রায় মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হল, তাঁকে জানাল কি অবস্থায় পড়ে, কি কাজ করতে সে বাধ্য হয়েছে। সমস্ত ঘটনা নিবেদন করে মন্তব্য করল, কর্তা যা করেছি ভালোই করেছি, সর্দারি বিষয়ে কুঠির রায়বাবু ডাকু রায়ের চেয়ে কম যান না।

রায় মহাশয় বলল—সে কথা বিবেচনার সময় আর নেই, চলো আমি গিয়ে দেখা করিগে।

রায় মহাশয় দর্পনারায়ণের নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রণাম করল, সে আগেই শুনে নয়েছিল যে আগন্তুক ব্রাহ্মণ, রায় মহাশয় নিজে কায়স্থ। প্রণাম সেরে উঠে সবিনয়ে বলল—বাবুজি যে দয়া করে এসেছেন, তাতে আমরা নির্ভয় হলাম।

দর্পনারায়ণ হেসে বলল—কাজে লাগবার আগেই অভয় দিলাম!

—হুজুর, যষ্টির আকৃতি দেখেই কি তার প্রকৃতি বুঝতে পারা যায় না?

শাস্ত্রে আছে—চক্কত্তি কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ; কিন্তু তার শাস্ত্রোক্তি শেষ হতে পারল না, রায় মহাশয়ের আদেশে কদম সরকার দর্পনারায়ণকে আহার ও বিশ্রামের জন্য অন্যত্র নিয়ে গেল।

সকলে আবার বৈঠকখানায় এসে বসল। চক্কত্তি পার্শ্ববর্তীকে জিজ্ঞাসা করল—কেমন হে, কি রকম দেখলে ?

অদূরবর্তী মেঘা তার হয়ে উত্তর দিল—আমাদের ভাগ্য ভালো, খুব গুণী লোক মিলে গিয়েছে।

দর্পনারায়ণের চালচলন, বীরবপু ও সবিনয় নীরবতা দেখে লোকের তার প্রতি কেমন একটা বিশ্বাসের ভাব জন্মে গিয়েছিল। যদিও কেউ মেঘার কথার উত্তর দিল না, তবু বুঝতে পারা গেল যে সবাই মেঘার কথাকেই সমর্থন করছে। কিছুক্ষণ পরে স্নান ও জলযোগ শেষ করে দর্পনারায়ণ বৈঠকখানায় এসে বসল। উপস্থিত সকলের সঙ্গে যথোচিত সম্ভাষণ করে সে রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, এই পরশুরাম লোকটা কে ?

রায় মহাশয় বলল—বাবুজি, পরশুরাম বলে এখন আর কেউ নেই, এক সময় ছিল। এই ডাকাতের দলটা তার সৃষ্টি, তাই তার নাম অনুসারে এখনো দলটাকে লোকে পরশুরামের দল বলে !

দর্পনারায়ণ বলে উঠল—কি আশ্চর্য ! লোকটা মরেছে তবু তার নামটা যায় নি।

চক্কত্তি চঞ্চল হয়ে উঠল, বোধ করি কোন শাস্ত্রবাক্য তার মনে পড়ে গিয়েছে।

কিন্তু রায় মহাশয় তার আসন্ন চঞ্চলতাকে চাপা দিয়ে বলল—আমি বাল্যকালে শুনেছি যে লোকটা ছিল হিন্দুস্থানী, নাটোর রাজ-সরকারে বকশির কাজ করত। তারপরে কেন জানি এই মুল্লুকে এসে ডাকাতির দল খুলে বসল।

দর্পনারায়ণ বলল এর কারণ বোঝা তো কঠিন নয়, সে দেখল যে চাকুরির চেয়ে ডাকাতির লাভ বেশি !

তার পরে শুধোল—আচ্ছা, এখন দলের সর্দার কে?

রায় বলল—কে আর ডাকাতের সর্দারের নাম জানতে গিয়েছে—

দর্পনারায়ণ বলল—নামজাদা লোক হলে নিশ্চয়ই জানা যেত!

রায় বলল—সে কথা ঠিক, তা ছাড়া অনেককাল পরশুরামের দলের উৎপাতের কথাও লোকে শোনে নি।

দর্পনারায়ণ বলল—তবে বোধ হয় নূতন সর্দার এসে জুটেছে! অনেকদিন দলের কোন খোঁজখবর নেই, দলের লোক যে-যার বাড়ি চলে গিয়ে চাষবাস শুরু করেছে, এমন সময় নূতন সর্দার এসে ডাক দিল, দলের লোক এসে আবার জড়ো হল। এমন হয় বলে শুনেছি।

অতঃপর সে খাড়া হয়ে বসে বলল—যাক্ গে, কে সর্দার, কেমন তার সর্দারি কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারা যাবে।

তারপরে রায়ের দিকে তাকিয়ে শুধোল—তা এ দিকের আমাদের ব্যবস্থা কেমন?

রায় বলল—আমাদের গাঁয়ে লাঠি, শড়কি, বন্দুকওয়ালার অভাব নেই, কিন্তু মুশকিল এই যে কেউ কারো সর্দারি স্বীকার করতে চায় না, অথচ এক-জনকে সর্দার মেনে না নিলে শিক্ষিত ডাকাতের দলের সম্মুখে দাঁড়ানো অসম্ভব। আমাদের অভাব সর্দারের, তাই তো বাবুজিকে কষ্ট দিতে হল।

দর্পনারায়ণ বলল—এতে আর কষ্ট কি!

তার পরে সে সমবেত ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে ইসারায় মেঘাকে ডেকে শুধোল—তোমার নাম কি বাপু?

মেঘা তাম্বুলোজ্জ্বল ঠোঁট দুটি বিকশিত করে সগর্বে বলল—হুজুর, আমি মেঘা সর্দার!

দর্পনারায়ণ মেঘার বাহুটা টিপে বলল—উহুঁ, তোমার নাম লোহা সর্দার! বেশ! এই তো চাই। আচ্ছা, চলো তো বাপু, বাড়িটার চারিদিক ঘুরে দেখে আসি।

তারপরে সে কদম সরকারকে বলল—সরকার তুমিও চলো।

রায় মহাশয়ের ইঙ্গিতে একজন লোক একটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে এল, তখন সেই তিনজন আর মশালটি অন্ধকারের মধ্যে নিক্রান্ত হল।

তারা চলে যাবামাত্র চক্কত্তি বলে উঠল—নাঃ, লোকটা কাজ জানে!

রায় মহাশয় চক্কত্তির ব্যবহারে ও বাক্যে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, আর সামলাতে না পেরে বলল—কাজ না জানলে তো তোমার মতো যজমানি করত, তুমিও বামুন, ওই ভদ্রলোকও বামুন, তা জানো!

রায় মশায়ের ভৎ'সনায় চক্কত্তি বুঝতে পারে যে সকলের ধৈর্যের সীমা সে অতিক্রম করেছে, এবারে চুপ করা আবশ্যক। এমন প্রায়ই হয়। তখন, যদি সময়টা সন্ধ্যা বেলা হয়, তবে সে সায়ং সন্ধ্যার সময় আসন্ন ঘোষণা করে উঠে পড়ে। কিন্তু আজ তার উঠে স্বগৃহে যাবার সাহস ছিল না। যদিচ সেখানে ডাকাত পড়বার বা ডাকাতে লুট করবার মতো কিছুই নাই, তবু বলা যায় না! বিশেষ অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের বিরুদ্ধে শাস্ত্রে তো নিষেধ নাই।

সকলে নীরব হয়ে বসে চারজনের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করতে লাগল। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ-ডাকা রাত তখন গভীর হয়ে উঠেছে।

এমন সময়ে সবাই দেখতে পেল যে দর্পনারায়ণ ও তার সঙ্গীরা দ্রুত ফিরে আসছে। সকলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠল—খবর কি?

—কি হল?

—আসছে নাকি?

মেঘা উত্তর দিল—ভয় নেই, ওদের মশালের আলো দেখা দিয়েছে।

এটা যে সুসংবাদ, ভয়ের কারণ যে এতে নাই শুনে চক্কত্তি অত্যন্ত বিস্মিত হল, কিন্তু বিস্ময়ের মাত্রা তার এত অধিক হয়েছিল যে সে আর কথা বলতে পারলো না।

রায় মহাশয় শুধোল—কতদূরে আছে?

কদম সরকার বলল—আধ ক্রোশ তো হবে, বোধ হয় এখনো বড় সড়কে পড়ে নি।

দর্পনারায়ণ বলল—এবারে আমাদের তৈরি হওয়া দরকার। আমার পরামর্শ এই যে এগিয়ে গিয়ে ওদের আক্রমণ করার চেয়ে আমরা সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করে থাকি। ওরা বাড়ির কাছে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসে পড়লে বন্দুক চালাব। তাতে ওদের কতক কতক মরবে, দল হালকা হবে। ভয় পেয়ে ওরা ফিরে যেতেও পারে। আর যদিই বা না যায়, তখন আমরা আক্রমণ করতে পারি।

সকলে দর্পনারায়ণের পরামর্শ গ্রহণ করল। তখন মেঘা গিয়ে সদর দেউড়ি বন্ধ করে দিল, খিড়কি দরজা আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি। দরজা বন্ধ হয়ে গেলে লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালারা বাড়ির নীচের তলায় রইল, দর্পনারায়ণ, মেঘা, কদম সরকার আর জন কয়েক লোক নিয়ে দোতালায় গিয়ে উঠল। গাঁয়ে গোটা চারেক গাদা বন্দুক ছিল, বন্দুকগুলো দর্পনারায়ণের দল সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের আমবাগানের মধ্যে আলো দেখা দিল এবং তারপরেই বিকট চীৎকারে রাত্রির নিস্তব্ধতা বিকারগ্রস্ত রোগীর দেহের মতো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল—

কালী মাঈকি জয়।
কালী মাঈকি জয়।

দর্পনারায়ণের পরামর্শ ছিল এই যে এপক্ষ থেকে কোনরূপ চীৎকার করা হবে না, কোন উত্তর দেওয়া হবে না, এমনকি বাড়িতে একটা আলোও থাকবে না। নিঃশব্দে, অন্ধকারে অপেক্ষা করে থাকতে হবে—এই ছিল তার আদেশ।

রায়বাড়ির ছাদের উপরে থেকে দর্পনারায়ণ আর তার সঙ্গীরা দেখতে পেল, ডাকাতের দলের মশালের আলোতেই দেখতে পেল—যে প্রায় জন চল্লিশ-পঞ্চাশ লোক লাঠি-ঠেঙা, ঢাল-শড়কি নিয়ে দ্রুত চলে আসছে, আর ঘন ঘন কালী মায়ের জয়ধ্বনি তুলছে।

ক্রমে তারা রায়বাড়ির পাঁচিলের কাছে এসে পড়ল। বাড়ির স্তব্ধতা ও অন্ধকার দেখেই বোধ করি ওরা থমকে দাঁড়াল। ডাকাতদলের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। ওরা এ পর্যন্ত দেখেছে যে ডাকাত পড়লে বাড়ির লোকে হয় কাঁদাকাটি করে এসে পায়ে পড়ে, নয় এগিয়ে এসে লাঠি নিয়ে দাঁড়ায়। আজ এ দুয়ের কোনটাই না দেখতে পেয়ে ওরা বিস্মিত হল, বুঝল এই নিস্তব্ধ অভ্যর্থনা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার চিহ্ন, বুঝল আজকার অভিজ্ঞতা নূতন তো হবেই এবং সহজও হবে না।

ডাকাতের দল যখন পাঁচিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে; কী করা যায় ভাবছে, এমন সময় দর্পনারায়ণের ইঙ্গিতে একসঙ্গে চারটে বন্দুক গর্জন করে উঠল। ছাদের উপরের অন্ধকার থেকে আলোকিত ডাকাতের দল বন্দুকের সহজলভ্য নিশানা হয়ে পড়েছিল। দর্পনারায়ণ দেখতে পেল জন দু-তিনেক লোক পড়ল। ডাকাতদের বিস্ময় কাটতে না কাটতে আবার এ পক্ষের চারটা বন্দুক গর্জন করে উঠল। দর্পনারায়ণ দেখল—এবারেও জন তিনেক লোক ধরাশায়ী হল। দর্পনারায়ণ স্থির করেছিল যে স্বল্পতম সময়ে যতগুলো সম্ভব লোককে হতাহত করে ফেলে আততায়ীর সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে, কারণ সে আগেই শুনে নিয়েছিল যে ডাকাতদের সংখ্যা পঞ্চাশের কাছেই হবে, আর এ পক্ষে যারা লাঠি-শড়কি ধরতে পারে তারা কোনক্রমেই ত্রিশ জনের উপরে নয়।

এবারে ডাকাতদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। অন্ধকার দোতালাকে লক্ষ্য করে তারা বন্দুক ছুঁড়ল। অন্ধকারের নিশানায় কেউ হতাহত হল না, পরন্তু সবাই বুঝে নিল যে ডাকাতদের বন্দুকের সংখ্যা একটার বেশি নয়।

ডাকাতের দল দেখল যে এইভাবে দাঁড়িয়ে গুলি খেতে হলে শেষ পর্যন্ত পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হবে, তাই তারা সকলে গিয়ে দেউড়ির উপরে পড়ল, দেউড়ি ভেঙে ঢুকবে।

দর্পনারায়ণ অল্প সময়ের মধ্যেই সকলকে যথাযথ আদেশ দিয়ে রেখে ছিল। ডাকাতেরা হয় পালাবে নয় দেউড়ি ভাঙতে চেষ্টা করবে। তার আদেশ ছিল

দেউড়ি ভাঙতে বাধা দেওয়া চলবে না। দেউড়িভাঙা সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে সবাই যখন ঢুকতে থাকবে তখন বন্দুক চালানোর প্রশস্ত সময়। তারপরে যখন ওরা সত্যি সত্যি আঙিনায় ঢুকে পড়বে তখন লাঠি-শড়কি নিয়ে আক্রমণ করতে হবে, তখন নিজ পক্ষের মশাল জ্বালিয়ে নিতে হবে, আর অন্ধকারে থাকবার প্রয়োজন নেই। দর্পনারায়ণ হিসাব করেছিল সে দেউড়ি ভেঙে ঢুকতে ঢুকতে ডাকাতদের যে কয়জন মরবে তাতে দুইপক্ষের জনসংখ্যা প্রায় সমান হয়ে আসবে, চাই কি ডাকাতদের সংখ্যা কমেও যেতে পারে।

ডাকাতদের দমাদ্দম লাঠিসোটার আঘাতে দেউড়ির পুরানো পাল্লা থর থর করে কাঁপতে লাগল, কাঁপতে কাঁপতে কিছুক্ষণ পরে মড় মড় শব্দে খসে পড়ল, অমনি উৎসাহে ডাকাতরা চীৎকার করে উঠল—কালী মাঈকী জয়। কিন্তু সে চীৎকার শেষ হতে না হতে একসঙ্গে চারটে বন্দুক গর্জন করে উঠল, কালীমায়ের জয়ধ্বনি জ্ঞাপন অনেকেরই কণ্ঠে শেষ হতে পারল না। কিন্তু তবু ওদের বাড়িতে প্রবেশ তো বন্ধ হল না। তখন এ পক্ষের মশালগুলো জ্বলে উঠল—দুপক্ষের মশালে দুপক্ষের প্রত্যেকটি লোক পরস্পরের চোখে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠল। দর্পনারায়ণ দেখল, ডাকাতদলের অগ্রভাগে বন্দুক হাতে দলের সর্দার—পরন্তপ রায়।

পরন্তপ রায় দেখল—আত্মরক্ষাকারী দলের মধ্যভাগে ধৃতবন্দুক দর্পনারায়ণ চৌধুরী।

পরস্পরকে দেখে সেই মুহূর্তে তারা দুইজন যেন পাথর বনে গেল, আদেশ দিতে, কথা বলতে, নড়তেও যেন ভুলে গেল, তাদের চোখের পলকও বোধ করি পড়ে নি! নিয়তির লীলা কি নিষ্ঠুর! দুইজনের প্রধানতম শত্রু অজ্ঞাতসারে দুইজনের সম্মুখে এসে বুক পেতে দিয়ে আজ দণ্ডায়মান! দুইজনে নিশ্চল! কিন্তু এক মুহূর্ত মাত্র! পরমুহূর্তেই পরস্পরকে লক্ষ্য করে দুজনের বন্দুক উঠল! দর্পনারায়ণের মনে হঠাৎ ইন্দ্রাণীর মুখ বিদ্যুৎবৎ চমকে গেল,

সে বন্দুক নামাল। আর পরন্তপের বন্দুক ডেকে উঠবার আগেই কার লাঠির আঘাতে হাত থেকে তা খসে পড়ল! আঘাতকারী লাঠিয়াল সেই তুলে নেবা মাত্র পরন্তপ তার চাপদাড়ি ধরে টানল—চাপদাড়ি অনায়াসে খুলে এলো। পরন্তপ অবাক হল, কিন্তু দর্পনারায়ণ হল তার চেয়েও বেশি অবাক! এ যে মুকুন্দ! সে কোথা থেকে এল!

এই ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে অনেকটা সময় লাগল—কিন্তু ঘটে গেল এক-আধ মিনিটের মধ্যেই। সেই মিনিট পরিমাণ সময় গত হতেই দুইপক্ষ পরস্পরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর লাঠির ঠকাঠক শব্দ দেয়ালে মাথাঠুকে চতুর্গুণ প্রতিধ্বনিত হয়ে কঙ্কালের করতালির মতো শ্রুত হতে লাগল।

লাঠালাঠি বাধল বটে কিন্তু বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে ডাকাতদের আর তেমন উৎসাহ নেই, তাদের লাঠি চালানোর মধ্যে আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষার ভাব বেশি ছিল। এমন যে হল তার একটি কারণ তাদের দলের একটিমাত্র বন্দুক বিপক্ষের হস্তগত হয়ে যাওয়া, দ্বিতীয় কারণ ইতিমধ্যেই দলের সাত-আট জনের হতাহত হওয়া। ডাকাতেরা এখন পালাবার উপায় খুঁজছিল। দর্পনারায়ণের লাঠিবাজির সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা ছিল। তার পক্ষকে সে আর তেমন উৎসাহিত করছিল না। কাজেই ডাকাতেরা একে একে ভাঙা দরজা দিয়ে সরে পড়ছিল। মেঘা একবার ডেকে বলল, বাবুজি, ওরা যে পালাচ্ছে।

দর্পনারায়ণ বলল—ওদের আজ খুব শিক্ষা হয়েছে, ছেড়ে দে।

ডাকাতের দল বাড়ির বাইরে পৌছবামাত্র এক নিমেষে অন্ধকারের মধ্যে প্রস্থান করল, হতাহতদের নিয়ে যাবার চেষ্টা অবধি করল না। সৌভাগ্যক্রমে এ পক্ষের কেউ নিহত হয়নি, দু-একজনের মাথায় সামান্য চোট লেগেছিল, এমন কিছু নয়।

ডাকাতেরা পালাবামাত্র সবাই বৈঠকখানা ঘরে এসে বসল, চকিতে মুহূর্তে তক্তাপোশের তলা থেকে বের হল। দর্পনারায়ণ গিয়ে মুকুন্দকে ধরল, শুধোল —হাঁরে মুকুন্দ, তুই কোথা থেকে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

মুকুন্দ বলল—দাদাবাবু, তুমি একটা লেখাপড়া-জানা লোক হয়ে যদি বুঝতে না পার, তবে আমি কেমন করে বুঝব?

দর্পনারায়ণ ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল—তোর কথা তুই বলবি, তাতে আবার লেখা-পড়া জানবার এমন কি দরকার।

মুকুন্দ মাথা চুলকায়।

দর্পনারায়ণ শুধোল—আচ্ছা তোকে না হয় ভূতেই টেনে এনেছে, কিন্তু তোর উপর দীপ্তির ভার দিয়ে এলাম, তাকে একলা ফেলে তুই এলি কেমন করে?

মুকুন্দ নিতান্ত সপ্রতিভভাবে বলল—খোকাবাবু একলা থাকবে কেন? তার ভার তো জিতন-মিতনের উপর দিয়ে এসেছি।

দর্পনারায়ণ বলল—এমন কাজ তুই করতে গেলি কেন? জিতন-মিতন দুজনেই গাঁজা খায় জানিস।

মুকুন্দ বলল—হাসালে দাদাবাবু, গাঁজা না খায় কে?

দর্পনারায়ণ বলল—তা বটে তুইও খাস! কিন্তু এখানে আসতে গেলি কেন বল!

মুকুন্দ আরম্ভ করল—তুমি তো চলে গেলে দাদাবাবু, আমি বড় দুশ্চিন্তায় পড়লাম! ভাবলাম মুকুন্দ থাকতে তোমাকে কিনা শেষে বিপদের মুখে একা আসতে দিলাম! ভাবলাম, না! এখনি রওনা হতে হবে। অমনি জিতন আর মিতনকে ডেকে বললাম—জিতন-মিতন, গাঁজার পয়সা নিবি?

মুকুন্দ বলে চলে—ওদের তো জান দাদাবাবু, পয়সার কথা শুনলে ঘুম ভেঙে যায়, গাঁজার পয়সার কথা শুনলে আম কাঠের উপরে নড়ে ওঠে। দুইজনে হাত বাড়িয়ে দিল। আমি গোটা দুই করে পয়সা দিয়ে বললাম, শোন! আমি দাদাবাবুর পিছু পিছু যাচ্ছি, তোরা খোকাবাবুকে দেখাশুনা করিস।

দর্পনারায়ণ শুধোয়—ওরা কি বলল ?

মুকুন্দ বলে—কী আর বলবে ? জিতন বলল—দেখবো, মিতন বলল—শুনবো। জিতন-মিতন মিলে হল দেখবো শুনবো। ওরা তো নারকোলের মালার আধ-আধখানা বটে—দুজনে মিলে তবে পুরোটা !

দর্পনারায়ণ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—কিন্তু তুই কোন বিবেচনায় এমনটা করতে গেলি ! আমার পিছন পিছন আসতে গেলি ?

মুকুন্দ বলল—তুমি বেড়াতে গেলে কি আমি আসতাম, এ যে বিপদের মুখে আসছ !

দর্পনারায়ণ ধমক দিয়ে বলল—কে তোকে এমন করতে বলল ?

মুকুন্দ বলল—বউমা থাকলে আমাকে না পাঠিয়ে তিনি ছাড়তেন, না তুমিই আপত্তি করতে পারতে !

বাস ! দর্পনারায়ণ চুপ করল—এ উত্তর সে কখনই আশা করে নি, এমন উত্তর আশা করলে হয়তো সে এ তর্কের মধ্যেই যেত না। অন্ধকারের মধ্যে তার চোখ ছলছল করে উঠল, তার একবার মনে হল মুকুন্দর গলাটাও যেন ভারি ভারি।

মনের মধ্যে—দুঃখ থাকলে মানুষে কথায় কথায় অপ্রত্যাশিতভাবে তার সম্মুখে এসে পড়ে। বনের বাঘকেও এড়ানো সম্ভব কিন্তু মনের দুঃখকে এড়িয়ে চলতে কদাচিৎ পারা যায়। রত্নাকরের মতো দুঃখের স্মৃতি বসে থাকে অতর্কিতের মোড়ে, হঠাৎ কখন তার আঘাত এসে পড়ে পথিকের মাথায়—চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে দর্পনারায়ণ শুধোল—তুই বাড়িতে ঢুকলি কি করে ?

মুকুন্দ বলল—কেন, ডাকাতের দলের সঙ্গে।

দর্পনারায়ণ হেসে বলল—আরে তাই তো জিজ্ঞেস করছি, ওদের দলের সঙ্গে মিশে গেলি কেমন ভাবে ? তোকে বুঝতে পারল না ?

মুকুন্দ বলে—পারবে কেমন করে ? আমিও যে ওদের মতো ইয়া

চৌ-গোঁপ্পা লাগিয়ে নিলাম। ডাকাত তো আর গায়ে লেখা থাকে না, থাকে চাপ-দাড়িতে লেখা।

তারপরে একটু হেসে বলে—আর তা ছাড়া দাদাবাবু, তোমার কাছে চাকরি করতে আসবার আগে আমিও তো ডাকাতি করতাম—ওদের হাবভাব সব জানি কিনা!

এমন সময়ে কদম সরকার এসে বলে—হুজুর রাত্রি হয়েছে আর পরিশ্রমও হয়েছে খুব, এবারে বিশ্রাম করতে যেতে হয়।

দর্পনারায়ণ একবার মুকুন্দর দিকে তাকায়। কদম তাকে বিস্ময়ে বলে—আরে মুকুন্দ যে! তুমি এলে কখন? দর্পনারায়ণ বলে—সরকার ওর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিও—ভালোই হল—তুমি তো ওকে চেনো।

এই বলে দর্পনারায়ণ গিয়ে স্নানাহার শেষ করে শয্যা গ্রহণ করে—কিন্তু ঘুম আর আসে না।

সে বিছানায় শুয়ে চোখ বুঁজে পড়ে থাকে। তার তন্দ্রার মেহগনি ফ্রেমের মধ্যে বনমালার আর ইন্দ্রাণীর স্থলপদ্মের মতো কচি মুখ দুখানি দিব্য-মাকুর মতো পর্যায় ক্রমে ছুটাছুটি করে স্মৃতির রেশমী বসন বুনতে থাকে। বন্যা যেমন সোনার পলি ফেলে রেখে এগিয়ে যায়—তেমনি বনমালা আর ইন্দ্রাণী কত সোনার স্মৃতি ঢেলে দিয়ে এগিয়ে চলছে। দর্পনারায়ণ ভাবতে থাকে এক সময়ে ইন্দ্রাণী কাছে এসেছিল, আরও কাছে আসতে পারত—এমন সময়ে কোথা থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে এল বনমালা! ইন্দ্রাণী দূরে গিয়ে পড়ল—কিন্তু সে যে বিদ্যুৎশিখার দূরত্ব! বিদ্যুৎশিখা বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করল জোড়াদীঘির হর্ম্যশিখরে—সব ভেঙে পড়ল! বিদ্যুৎলতার মতো নমনীয়, বিদ্যুৎশিখা যেদিন বজ্রসনাথ বহির্গত হয়—সেদিন কি সর্বনাশ!

দর্পনারায়ণ ভাবে আজ বনমালাও দূরে গিয়ে পড়েছে যার চেয়ে আর দূরত্ব নাই কিন্তু সে যেন ইন্দ্রধনুর দূরত্ব। বিদ্যুৎ আর ইন্দ্রধনু দুই-ই আকাশের, তবু দুইয়ে কত প্রভেদ! বনমালা আর ইন্দ্রাণী দুজনেই প্রেয়সী—তবু তারা কত ভিন্ন!

দর্পনারায়ণ মনে মনে ভাবে অদৃষ্টের ব্যঙ্গ নিপুণ! যে পরন্তপকে আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে সে এতকাল মনে শান দিচ্ছিল—অদৃষ্ট তাকে নিয়ে এসে দর্পনারায়ণের মুঠোর মধ্যে সঁপে দিল কিন্তু তারপরেই শুরু হল ভাগ্যের পরিহাস! দর্পনারায়ণের উদ্যত বন্দুকের সম্মুখে হঠাৎ ইন্দ্রাণীর মুখচন্দ্রমা উদিত হল। নত হয়ে পড়ল বন্দুকের ফণা। তারপরে পরন্তপ কোথায় গেল তলিয়ে, এখন চারদিক ইন্দ্রাণীময়, ভাঙা আয়নায় একটিমাত্র চন্দ্র যেন শতখণ্ডরূপে দেখা দিতে থাকে।

সে বুঝতে পারে না—এ কী রহস্য! ইন্দ্রাণীকে ভালো করে দেখতে গেলে সেখানে দেখা যায় বনমালাকে। আবার বনমালাকে ভালো করে দেখতে গেলে সেখানে ভেসে ওঠে ইন্দ্রাণীর মুখ! এ কী লুকোচুরি! (প্রিয়জনের মুখ স্থিরভাবে কল্পনা করায় যেন কী একটা বাধা আছে। কিসের চঞ্চলতা যেন প্রিয় মুখচ্ছবির স্মৃতিকে দানা বাঁধতে দেয় না। সে কি প্রেমের চঞ্চলতা! হবেও বা। প্রেমের প্রকৃতিই চঞ্চল। তাই তার ভয় ঘুচতে চায় না, আশা মিটতে চায় না, ফুরিয়েও ফুরোয় না, পূর্ণ হয়েও প্রেম অপূর্ণ। প্রেম যখন পূর্ণতা পায় তখন আর প্রেম থাকে না। প্রেম আর যাই হোক শান্তি নয়। যারা প্রেমে শান্তি চায় তাদের আর কি বলব। সমুদ্রে কখনো ঢেউ না থাকতে পারে—কিন্তু জোয়ার-ভাঁটার টান নিরন্তর তো চলেছে তার মজ্জায় মজ্জায়। শান্তি যোগীর, আর চঞ্চলতা প্রেমিকের; তৃপ্তি যোগীর আর তৃষ্ণা প্রেমিকের…)

হঠাৎ দর্পনারায়ণের স্মৃতির রেশমী সূত্র খুট করে ছিঁড়ে যায়। শিয়াল-ডাকা ঝাঁঝাঁ রাত্রির নিরেট নিস্তব্ধতা একখণ্ড কালো পাথরের মতো তার স্তিমিত চৈতন্যে এসে পড়ে ঢেউ জাগিয়ে দেয়—কালকের চিন্তা, আসন্ন কর্তব্যের দায়িত্ব, দীপ্তিনারায়ণের মুখ! সে ঘুমোতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে পাশ ফিরে শোয়—কিন্তু ঘুম বোধকরি আসে না।

পরন্তপ রায় এতক্ষণ ছুটছিল, এবারে গাঁয়ের বাইরে এসে পড়ে বুঝল যে আর কেউ অনুসরণ করছে না, তাই একটা পুকুরপাড়ে বসে পড়ল। সে এমনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে বিশ্রাম তার পক্ষে একান্ত দরকার—কিন্তু শুধু বিশ্রামের প্রয়োজনে না বসলেও চলত, আসল কথা দলের লোকজনদের জন্যে অপেক্ষা করা তার কর্তব্য। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করবার এমন নির্জন স্থান আর মিলবে না মনে করে একটা আমগাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়ে সে বসল।

এতক্ষণে একটু শান্ত হয়ে বসবামাত্র নিজের অবস্থা, দুরবস্থাই বলা উচিত, এক ঝলকে তার মনের মধ্যে খেলে গেল। একটু একটু শীত করতে লাগল, পিঠে হাত দিয়ে সে বুঝতে পেল মোটা মেরজাইটা আগাগোড়া ছিঁড়ে গিয়েছে, ফাঁক দিয়ে পৌষের বাতাস ঢুকছে। পরন্তপ ভাবল লোকজন এসে পড়লেই আড্ডায় ফিরে যাবে, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা তিন দিক থেকে ঘিরে ধরেছে—বাকি দিকে মৃত্যুর পথ উন্মুক্ত, কিন্তু মৃত্যুও আজ তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। তার মনে হল পক্ষপাতিত্বই বটে, কারণ এই অপমানের বোঝা বয়ে বেঁচে থাকা অপেক্ষা তার মৃত্যুই বুঝি ভালো ছিল। ডাকাতি ব্যবসা আজ কয়েক বৎসর হল সে ধরেছে, সব ব্যবসায়ের মতো এ ব্যবসাতেও লাভ-লোকসান হার-জিত আছে। হার-জিত লাভ-লোকসানের মতোই হিসাবের ব্যাপার, তাতে মান-অপমানের প্রশ্ন নেই। কিন্তু আজ তার অপমান এই যে দর্পনারায়ণের দয়ায় জীবনটা বেঁচে গেল। আর কেউ বুঝুক বা নাই বুঝুক পরন্তপ বুঝতে পেরেছিল যে দর্পনারায়ণ তাকে বন্দুকের খোলা নিশানায় পেয়েও নিতান্ত দয়া করেই ছেড়ে দিয়েছে। অথচ তাকে ছেড়ে দেবার কথা দর্পনারায়ণের নয়। দর্পনারায়ণ যদি তাকে হত্যা করত তবু তাকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না একথা অন্তত নিজের কাছে স্বীকার করবার মতো বিচার-বুদ্ধি তার ছিল। কিন্তু ওইতেই বিপদ ঘটল। যতই যুক্তিগুলো

দর্পনারায়ণের পক্ষে সায় দিয়ে দাঁড়াচ্ছিল ততই একটা অন্ধ আক্রোশ সে মনের মধ্যে অনুভব করছিল। কার উপরে? খুব সম্ভব তার নিজের উপরে ছাড়া আর কারো উপরে নয়।

দলের লোকের জন্য অপেক্ষা করতে করতে একটু জিরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে সেখানেই ঘাসের উপরে সে শুয়ে পড়ল। এখানে আর যাই হোক ঘুমানো চলবে না একথা সে জানত। কিন্তু কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে জানতেই পায় নি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠে বসল। তারপরে দাঁড়াতে গিয়েই পড়ে গেল, ডান পায়ে বিষম ব্যথা অনুভব করল। অন্ধকারে হাতড়ে দেখে মনে হল পাখানা যেন ফুলে গিয়েছে। তখন সে বুঝতে পারল যে পায়ে বিষম চোট লেগেছিল, উত্তেজনার সময়ে বুঝতে পারে নি—এখন একেবারে অশক্ত হয়ে পড়েছে।

এতক্ষণে পরন্তপ সত্যসত্যই ভয় পেল। নিজের চেষ্টায় পালানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর দলের লোক। তারা নিশ্চয় তাকে খুঁজে না পেয়ে এতক্ষণে চলে গিয়েছে। তার মনে হল—এখানে অসহায় ভাবে পড়ে থাকা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। সে ভাবল—এখনি ভোর হবে, গ্রামের লোকে তাকে দেখতে পাবে, তার পরের কথা উদ্বেগে আর সে ভাবতেই পারল না। ঘুমিয়ে পড়বার জন্যে নিজের উপরে তার রাগ হল, তার মনে হল, ঘুমিয়ে না পড়লে হয়তো দলের লোকের সন্ধান পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হত না। এখন অসহায় ভাবে মৃত্যুর উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোন পথ তার সম্মুখে ছিল না।

হঠাৎ পরন্তপ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। সে ভাবল—কে এত রাত্রে? একবার মনে হল—হয়তো তারই সন্ধানে তার দলের ঘোড়সোয়ার বেরিয়েছে। এই কথা মনে হতেই তার মন খুশী হয়ে উঠল। ঘোড়ার শব্দ কাছে আসতেই সে চীৎকার করে নিজের পরিচয় দিল, তার দলের লোক সে বিষয়ে তার মনে আর কোন সন্দেহ ছিল না। পরন্তপের কথা শুনতে পেয়ে ঘোড়সোয়ার যেন নামল—কারণ শব্দ আর শুনতে পাওয়া

যাচ্ছিল না। পরন্তপ আর একবার নিজের পরিচয় দিল এবং কিছুক্ষণ পরেই অনুভব করল কে একজন যেন তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তখনি সে চমকে উঠল। অন্ধকারে আগন্তুককে দেখা যাচ্ছিল না—কিন্তু রাত্রিবেলায় অপরিচিত লোক কাছে এলে যে একপ্রকার অস্বস্তি অনুভূত হয়, সেই রকম অনুভব করছিল পরন্তপ।

আগন্তুক শুধাল—তুমি কে?

পরন্তপ বলল—আমি একজন আহত ব্যক্তি।

আগন্তুক বলল—তুমি কিভাবে আহত তা আমি জানতে চাইনে, আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি তাই জানতে চাই।

পরন্তপ ভাবল—এখন তার কর্তব্য কি! একদিকে এখানে অসহায় ভাবে বসে থাকা, ভোরবেলা গ্রামের লোকের হাতে প্রাণহানি ঘটতে পারে, নিদেন অপমান তো নিশ্চয়ই! আর একদিকে আহত অবস্থায় অপরিচিত লোকের সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা! পরন্তপের মনে হল ক্ষতি কি! মৃত্যুর অধিক আর কি হতে পারে?

সে বলল—আমাকে আমার গাঁয়ে পৌঁছে দিতে পারলে পারিতোষিক পাবে—কিন্তু আমি হাঁটতে পারব না।

লোকটি বলল—পারিতোষিকের কথা পরে হবে। ঘোড়ায় চড়তে জান কি? আমার সঙ্গে ঘোড়া আছে।

পরন্তপ বলল—ধরে চড়িয়ে দিতে হবে, পায়ে আঘাত পেয়েছি।

লোকটি বলল—তবে ওঠো।

পরন্তপ লোকটির সাহায্যে ঘোড়ায় চড়ে বসল।

আগন্তুক শুধাল—কোন গ্রাম?

পরন্তপ বলল—এখন যে পথে যাচ্ছ চলো, ভোর হলে বলব।

তখন আগন্তুক লাগাম ধরে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হয়ে চলল।

## পরন্তপের পূর্বকথা

জোড়াদীঘির কয়েদখানা হইতে খালাশ পাইয়া পরন্তপ রক্তদহে ফিরিয়া আসিল। সে যখন ইন্দ্রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, ইন্দ্রাণী খুশী হইল বটে, কিন্তু বিস্মিত হইল না। পরন্তপ তাহার খুশিটা বুঝিতে পারিল না। ভাবিল তাহার আগমনে ইন্দ্রাণীর আনন্দ হয় নাই, নতুবা এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে সে চমকিয়া উঠিত। কিন্তু তাহার বিস্মিত না হইবার যে যথেষ্ট কারণ আছে—তাহা আর কেহ না জানিলেও ইন্দ্রাণী তো জানে।

পরন্তপ বলল—ইন্দ্রাণী আমি আসিয়াছি।

ইন্দ্রাণী বলিল—ভালোই হইল!

ভালোই হইল।

পরন্তপ ভাবিল ইহা তো ভালোবাসার উক্তি নয়।

পরন্তপ বলিল—ইন্দ্রাণী তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?

ইন্দ্রাণী বলিল—তাহা এতদিনে বুঝিতে পারা উচিত।

পরন্তপ ভাবিল—ইহার চেয়ে জোড়াদীঘির কয়েদখানা তাহার পক্ষে বোধ করি ভালো ছিল।

সে চাঁপা ঠাকুরানীর ঘরে গেল।

চাঁপা ঠাকুরানী তখন সম্মুখে আরসি রাখিয়া সুগন্ধি তৈল-সহকারে কেশ বিন্যাস করিতেছিল।

এই চাঁপা ঠাকুরানীকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে, কাজেই তাহার পূর্বকথা একটু সবিস্তারে বলা আবশ্যক।

চাঁপা ঠাকুরানী ইন্দ্রাণীর পরিবারভুক্ত, কিন্তু আত্মীয়-কুটুম্ব নহে। তাহার বয়স ত্রিশের কাছে, কাজেই ইন্দ্রাণী হইতে সে অনেকটা বড়। শৈশব হইতে পিতৃমাতৃহীন ইন্দ্রাণীর সে অভিভাবক স্বরূপ। লোকে সেইরূপ মনে করিত,

ইন্দ্রাণীও অন্যথা মনে করিত না। বস্তুত অভিভাবকের সমস্ত অধিকারই সে প্রয়োগ করিত।

ইন্দ্রাণীর সহিত পরন্তপের বিবাহের ঘটকালি ও কৃতিত্ব চাঁপারই প্রাপ্য। বিবাহের পরে গোলযোগ দেখা দিল। সংসারের অধিকাংশ গোলযোগই মানসিক, বর্তমান ক্ষেত্রেও মনে মনেই তাহার সূত্রপাত হইল।

পরন্তপ ইন্দ্রাণীকে ভালোবাসিয়া বিবাহ করে নাই, তাহার ঐশ্বর্যের সাহায্যে জোড়াদীঘির দর্পনারায়ণের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ সহজ হইবে ভাবিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। আবার ইন্দ্রাণীরও পরন্তপের প্রতি কোন আকর্ষণের কারণ ছিল না। দর্পনারায়ণকে সে শিক্ষা দিতে চায়—অসহায় মেয়েমানুষের পক্ষে তাহা কেমন করিয়া সম্ভব! বীরপ্রকৃতি পরন্তপকে অস্ত্র-স্বরূপে প্রয়োগ করিলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ভাবিয়াই সে তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইন্দ্রাণী জমিদারির মালিক, পিতৃমাতৃহীন, তার উপরে কুলীনকন্যা বলিয়া অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা, তাহার স্বাধীনতা স্থান-কালের বিবেচনায় অনেকটা বেশি ছিল।

যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক নাই, সেখানে পত্নীর সৌন্দর্যই প্রধান অবলম্বন। অনেক সময়ে সৌন্দর্যের খনি খুঁড়িতে গিয়াই প্রেম আবিষ্কৃত হয়, আবার অনেক সময় প্রেমের রঙীন কাঁচ প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য প্রকট করিয়া তোলে। ইন্দ্রাণী অপূর্ব সুন্দরী ছিল, কিন্তু তাহার সৌন্দর্যে তরলতা, অর্বাচীনতা, মোহজনক কিছু ছিল না। কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষাররাশির উপরে প্রভাতের আলোকজাল পড়িলে যে দিব্য শতদল বিকশিত হয়, সেইরূপ একটি অনির্বচনীয়তা তাহার সৌন্দর্যে ছিল। ক্ষুদ্রচিত্তকে ইহা মুগ্ধ করিতে পারে না। যে হতভাগ্য কেবল চোখের সাহায্যেই দেখিতে অভ্যস্ত সৌন্দর্যের মোহ ব্যতীত আর কিছুই সে দেখিতে পায় না।

অপরদিকে, চাঁপার সৌন্দর্যে একপ্রকার তরলতা ছিল, জ্যোৎস্নাভিষিক্ত নদীর স্রোতের মতো তাহা তরল, চঞ্চল এবং সহজপ্রাপ্য। আবার চাঁপার বয়সটাও এমন যাহাতে জীবনের অভিজ্ঞতায় নিজের রূপকে সে অসির মতো

চালিত করিতে পারে, প্রয়োজন হইলে বাহির করিয়া আঘাত করিতে পারে, প্রয়োজন হইলে খাপে পুরিয়া রহস্যময় হইতে পারে, আবার প্রয়োজন হইলে অসিলতা বাহুলতায় পরিণত হইয়া ইস্পাতের বন্ধনে জড়াইয়া ধরিয়া মর্মান্ত অবধি রক্তরাগে চিহ্নিত করিয়া দিতে পারে। চাঁপা অবিবাহিতা। চাঁপা বুঝিল পরন্তপ ধরা পড়িয়াছে। ইন্দ্রাণী তার পরে বুঝিল। পরন্তপ সকলের পরে বুঝিল। আর তাহার মুগ্ধভাব যে অপর দুইজনের কাছে ধরা পড়িয়াছে —তাহা বোধকরি সে বুঝিতেই পারিল না।

ইন্দ্রাণী বুঝিল কিন্তু কিছু বলিল না, কারণ অহঙ্কার পরাজয়কে বরণ করিতে পারে কিন্তু কখনো স্বীকার করে না। তাহা ছাড়া পরন্তপ যে তাহার অস্ত্র, অস্ত্রের কাছে লোকে কাজ চায়, ভালোবাসা চায় না, ভালোবাসি না বলিয়া অস্ত্রকে পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি কাহার? চাঁপা বুঝিল, খুশি হইল, ভাবিল আকর্ষণ করিবে, অথচ ধার দিবে না। প্রত্যেক নারীই ভাবিয়া থাকে ভালোবাসার প্রয়োগ তাহার ইচ্ছাধীন। এই তিনের বিচিত্র সম্পর্ক লইয়া অদৃষ্ট যখন একটি ত্রিভুজ রচনা করিয়া তুলিতেছিল এমন সময় জোড়াদীঘির সহিত দাঙ্গা বাধিয়া উঠিল। অদৃষ্ট তাহার লীলাকে কিছুকালের জন্য এক পথ হইতে অন্য পথে চালনা করিয়া দিল।

জোড়াদীঘির কয়েদখানার নিঃসঙ্গ অন্ধকারে পরন্তপের মনে হঠাৎ ইন্দ্রাণীর সৌন্দর্য দিব্য জ্যোতিতে প্রকাশ হইয়া পড়িল। মহৎ সৌন্দর্যের ইহাই স্বভাব। দূরে না দাঁড়াইলে তাহাকে উপলব্ধি করা যায় না। কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশ হইতে তাহা একটা পাথরের স্তূপ মাত্র। যে দূরে দাঁড়ায় কেবল সেই দেখিতে পায় কার্তিকের শ্বেত ময়ূরটির মতো কলাপ বিস্তার করিয়া দিয়া অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করিতেছে। মহৎ তৃষ্ণা লইয়াই সে ইন্দ্রাণীর কাছে আসিয়াছিল—এমন সময় সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকার আকাশে দিব্য কাঞ্চনজঙ্ঘার অস্তিত্বমাত্র অবশিষ্ট রহিল না। তৃষ্ণার্ত পথিক ঝরনার তীরে আসিয়া বসিল; চাঁদের আলোর নিভৃত রহস্যে জল সেখানে ঝলমল, ছলছল, তাহার কোমল কাকলির আহ্বানের আর বিরাম নাই, যেমন সহজ প্রাপ্য, তেমনি অনায়াসে

রক্ষার যোগ্য। তাহার মনে হইল মন্দাকিনী মিথ্যা, ভোগবতীর চেয়ে অধিকতর সত্য আর কি! তৃষ্ণা নিবারণই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে অনায়াসকে ছাড়িয়া দুরায়াসের জন্য বসিয়া থাকা কেন? তৃষ্ণা ক্ষণিক, কিন্তু জীবনও তো নিত্য নয়! আর বহুতর ক্ষুধাতৃষ্ণার মাল্যই তো জীবন। আকণ্ঠ তৃষ্ণা লইয়া পরন্তপ চাঁপার ঘরে প্রবেশ করিল, চাঁপা তখন চুল বাঁধিতেছিল।

চাঁপা রোহিণী নয়। রোহিণীর চেয়ে সে অনেক বুদ্ধিমতী। রোহিণী ধরা দিবার জন্য ব্যস্ত ছিল, চাঁপা ভাবিয়াছিল ধরা না দিয়া সে ধরিয়া রাখিবে। সে অনুমান করিয়া লইয়াছিল বিবাহিত সীমানার বহির্ভূত প্রেম মৃগতৃষ্ণিকা শ্রেণীর, দূরে হইতেই তাহা সত্য, কাছে হইতে মরীচিকা মাত্র। তত্ত্বের বিচারে সে ভুল করে নাই, কিন্তু তত্ত্বের সীমানার ঘাট হইতে বাসনার অগাধ জলে নামিবা মাত্র সে ডুবিল, প্রথমে কিছুক্ষণ হাতপা ছুঁড়িয়াছিল বটে—কিন্তু না ডুবিয়া উপায় থাকিল না। এমন যে হইল তাহার কারণ চতুর চাঁপার চেয়েও অদৃষ্ট চতুরতর। আরও কারণ এই যে স্ত্রীলোকের জীবনে একটা বয়স আসে যখন হঠাৎ সে তাহার পূর্বজীবনকে অস্বীকার করিয়া অনভিপ্রেত কাণ্ড করিয়া বসে। স্ত্রীলোকের জীবনে এই বয়সটা পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। সে সময় পর্যন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যাহার আয়ত্তাধীন ছিল হঠাৎ তাহার মধ্যে আলোড়ন দেখা দেয়। কথামালার ঘুমন্ত শশকের মতো অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া সে দেখিতে পায় যে যৌবন-সূর্য অস্তগমনোন্মুখ, সে দেখিতে পায় রাত্রির কালো ছায়া জরতীর মসীপ্রবাহের মতো গড়াইতে শুরু করিয়াছে, বাসনার লবণাম্বু কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত শুষ্ক হৃদয়কম্বু কণ্ঠে স্থাপন করিবামাত্র সে অপরিতৃপ্ত কামনার কলধ্বনি শুনিতে পায়, সে তাকাইয়া দেখিতে পায় জীবনের বালুঘটিকায় আর সামান্য কয়েকটি মাত্র বালুকণা অবশিষ্ট আছে—তখনি সে সুদীর্ঘকালের অতৃপ্তিকে এক মুহূর্তে নির্বাসিত করিয়া পান করিবার আগ্রহে মরীয়া হইয়া ওঠে। নারীর এই ভাববিপর্যয় পঁয়ত্রিশের কাছে—

পুরুষের জীবনে এই সীমাটা পঁয়তাল্লিশের পূর্বে হইবে না। চাঁপার সেই বয়স আসন্ন। সাপুড়ে সাপের কামড়ে মরে, বাঘশিকারী বাঘের হাতে মরে, প্রেম-ব্যবসায়ীর অন্তিম দশা প্রায়শই প্রেমের আঘাতেই ঘটিয়া থাকে। চাঁপা ভাবিল বেশ করিয়া খেলাইব, অদৃষ্ট হাসিল, বঁড়শি তখন তাহাকে আকণ্ঠ বিঁধিয়াছে!

এই ত্রিভুজটির তির্যক গতি মন্থর গতিতে চলিতেছিল, এমন সময়ে অদৃষ্টের ধাক্কায় ঘটনা একটি চূড়ান্ত পরিণতির মুখে ছুটিল। জমিদারবাড়ির বাহিরে রাত্রিযোগে পরন্তপ ও চাঁপা মিলিত হইত, আবার রাত্রি শেষ হইবার আগেই তাহারা বাড়ির মধ্যে ফিরিয়া আসিত। যদিচ রাত্রে সদর দেউড়ি বন্ধ করাই রীতি তবু স্বয়ং খোদ কর্তার আদেশে দেউড়ি খোলা রাখা হইত, সেখানে একজন পাহারা দিত। প্রকাশ্য-প্রায় তাহাদের নিশা-যাপন লোকের অগোচর ছিল না, জানিত না কেবল ইন্দ্রাণী। কে তাহাকে বলিবে? এ তো বলিবার মতো নয়. বিশেষ সকলেই তাহাকে ভালোবাসিত, স্নেহ করিত, এমন পীড়াদায়ক কাহিনী কে তাহার কাছে বিবৃত করিবে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা কানাঘুষায় তাহার কানে গিয়া পৌঁছিল।

একদিন শেষ রাত্রে পরন্তপ ও চাঁপা দেউড়ির কাছে আসিয়া দেখিল দেউড়ি ভিতর হইতে বন্ধ। বিস্মিত পরন্তপ হাঁকিল—দেউড়ি খোলো।

ভিতর হইতে উত্তর আসিল—হুকুম নেহি, হুজুর।

পরন্তপ হাঁকিল—কে হুকুম দিল?

ভিতর হইতে অর্জুন সিংহ উত্তর দিল—মাইজিকা হুকুম, হুজুর।

পরন্তপ ও চাঁপা দুজনেই ইন্দ্রাণীর প্রকৃতি বিলক্ষণ অবগত ছিল, কাজেই বুঝিল দরজা সত্যই বন্ধ হইয়াছে, দিনের বেলাতেও খুলিবে না, বুঝিল যে এখন একটিমাত্র পথ তাহাদের সম্মুখে খোলা—সে পথ বাহিরের দিকে, তাহারা বুঝিল যে রক্তদহের জীবনযাত্রা তাহাদের পরিসমাপ্ত। তখন তাহারা দুইজনে একই দুর্ভাগ্যের যুগল ছায়ার মতো রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল। রক্তদহের কেহ তাহাদের সন্ধান জানিতে পারিল না, সন্ধান করিল না, সন্ধান করিবার পক্ষে ইন্দ্রাণীর নিষেধ ছিল।

*

চলন বিলের রাজসাহী জেলার প্রান্তে পারকুল বলিয়া একটি গ্রাম ছিল, এখনও আছে। পরন্তপ ও চাঁপা পারকুলে আসিয়া আশ্রয় লইল। এখানে আসিবার প্রধান কারণ এই যে সংসারে অচল লোকের স্থান চলন বিল। যাহাদের আর কিছুই নাই, কেবল বীর্য আছে, চলন বিলে তাহাদের সবই আছে—অথবা ইচ্ছা করিলেই অল্পদিনে সবই অর্জন করিতে পারে।

কি সূত্রে, কি ভাবে তাহারা পারকুলে আসিল, কেমন করিয়া বাসস্থান সংগ্রহ করিল, খাওয়া-পরার কি ব্যবস্থা করিয়া লইল, এ সমস্ত বিবরণ চিত্তাকর্ষক হইলেও আমাদের কাহিনীর পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। এক বৎসর পরে যখন আমরা তাহাদের দেখা পাই, দেখি যে তাহারা গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ পরিবার। এখানে আসিয়া যে পোড়ো বাড়িটা তাহারা অধিকার করিয়া লইয়াছিল তাহাকে মেরামত করিয়া বাসোপযোগী করা হইয়াছে, আঙিনায় গোরু আছে এবং মরাইয়ে ধান ও কলাই সঞ্চিত, চাকর ও মজুরে জন তিন-চার লোক খাটে। যাহারা রাত্রির অন্ধকারে চোরের মতো অসহায়ভাবে গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহাদের অবস্থার এমন সমৃদ্ধি কেমনভাবে ঘটিল কেহ শুধাইলে হয় আমরা নিরুত্তর থাকিব নয় য়িহুদি-গণের পূর্বপুরুষ আদম ও ইভের কথা স্মরণ করাইয়া দিব। যাহার বীর্য আছে তাহার সবই আছে। পৃথিবী বীর্যশুল্ক। নিরীহের নিকটে সে কৃপণের স্বর্ণভাণ্ডার। সংসার ভালো মানুষের স্থান নয়। পরন্তপ আর যাই হোক ভালোমানুষ নয়।

এখানে আসিয়া প্রথমে সে পরশুরামের দলের অস্তিত্ব অবগত হইল, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই অবগত হইল।

পরন্তপ ছিপ-নৌকাযোগে বিলের মধ্যে টহল দিয়া বেড়াইত, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত হাওয়া খাইতেছি। কিন্তু বস্তুত হাওয়ার চেয়ে অধিকতর মূল্যবান বস্তু সে খাইত বা খাওয়ার ব্যবস্থা করিত। যে-উপায়ে সে এক-বৎসরের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল তাহার একমেটে নাম ডাকাতি।

উহাকে দোমেটে করিলে বলে ব্যবসা আর তাহার উপর রঙচঙ করিয়া সাজ পোশাক পরাইয়া চোখ কান নাক মুখ বসাইলে নাম গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। কিন্তু সবই ডাকাতির রকমফের মাত্র। সংসারে সবাই ডাকাতি করিতেছে। ডাকাত নয় কে? বড় ডাকাত ছোট ডাকাতকে অবজ্ঞা করে আর ছোট ডাকাত বড়কে ঈর্ষা করে। এই অবজ্ঞা ঈর্ষার আঘাতে যে আলোড়ন ওঠে তাহারি নাম রাজনীতি।

একদিন ডাকাতি সারিয়া ফিরিবার পথে পরন্তপ বিলের-কাঁধি নামক এক গ্রামে পৌঁছিল। তখন সন্ধ্যা আসন্ন। পরন্তপ ভাবিল ফিরিবার আগে কোন গৃহস্থের বাড়িতে বসিয়া তামাকু সেবন করিয়া লইবে। এই ভাবিয়া সে একজন সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাড়িতে উপস্থিত হইল। সে লক্ষ্য করিল যে বাড়িতে বড় উদ্বেগের ভাব। সে শুধাইল—তাহারা এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে কেন? গৃহস্বামী বলিল—মহাশয়, আজ আমাদের বড়ই বিপদ। আজ রাত্রে আমার বাড়িতে ডাকাতি হইবে বলিয়া চিঠি আসিয়াছে।

পরন্তপ শুধাইল—কাহার দল?

গৃহস্থ বলিল—পরশুরামের দল।

তারপরে সে বলিল—পরশুরামের দল এদিকের সবচেয়ে দুর্দান্ত ডাকাত। আজ আর আমাদের রক্ষা নাই।

পরন্তপ হাসিয়া বলিল—এত ভয় পাইতেছেন কেন? সংসারে যেমন পরশুরাম আছে, তেমনি তাহাকে জয় করিতে পারে এমন রামের অভাব নাই।

সে বলিল—আপনাদের গাঁয়ে লাঠি ধরিতে জানে এমন যে-সব পুরুষ মানুষ আছে তাহাদের এখানে আসিতে আদেশ করুন। আমি আপনাদের সর্দার হইলাম, দেখি পরশুরামের দল কি করিতে পারে?

পরন্তপের কথা শুনিয়া ও তাহার বীরোচিত আকৃতি দেখিয়া গৃহস্থ সাহস পাইল। সে গ্রামের লোকদের ডাকিয়া পরন্তপের প্রস্তাব শুনাইল। সকলে সানন্দে রাজি হইয়া লাঠিসোটা, ঢাল-তলোয়ার লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। যথাসময়ে গভীর রাত্রে পরশুরামের দল আসিয়া পড়িল। তাহারা দুর্জয়—কিন্তু

আজ পরন্তপের সাহসের গুণে তাহারা সুবিধা করিতে পারিল না, বেগতিক দেখিয়া পলায়ন করিল। গ্রামের লোক পরন্তপকে অসীম কৃতজ্ঞতা জানাইল। ভোরবেলা সে পারকুলে ফিরিয়া আসিল।

কিছুদিন পরে একটি লোক পরন্তপের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরন্তপের মনে হইল তাহাকে যেন সে আগে একবার দেখিয়াছে—কিন্তু কবে, কোথায় স্মরণ করিতে পারিল না; সেই লোকটি নিজের পরিচয় দিয়া জানাইল যে সে পরশুরামের দলের একজন প্রধান ব্যক্তি। সে বলিল যে তাহাদের নেতা পরশুরামের কিছুদিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। এখন সকলেই সর্দার হইতে চায়, কেহ কাহাকেও বড় বলিয়া স্বীকার করে না, ফলে এখন দলটি ভাঙিয়া যাইতে বসিয়াছে। সে বলিল—আপনি যদি আমাদের দলের সর্দার হইতে স্বীকার করেন তবে আমরা সকলেই আপনাকে মানিতে রাজি আছি।

পরন্তপ জিজ্ঞাসিল—আমার পরিচয় পাইলে কিরূপে?

লোকটি বলিল—বিলের কাঁধির যদু চাকির বাড়িতে ডাকাতির কথা ভুলিতে পারি?

তখন পরন্তপের মনে পড়িল সেদিন রাত্রে মশালের আলোয় তাহাকে একবার যেন সে দেখিয়াছিল।

লোকটি বলিল—সেদিন রাত্রে বাধা পাইয়া আমরা সন্ধানে জানিলাম যে আপনারই সর্দারির গুণে যদু চাকির বাড়ি রক্ষা পাইয়াছে। তখন হইতে আমরা আপনার খোঁজ করিতেছি। আপনার সর্দারি মানিতে সকলেই রাজি হইয়াছে—এখন আপনি সম্মত হইলেই হয়।

পরন্তপের অসম্মত হইবার কোন কারণ ছিল না—সে রাজি হইল। এতদিন যাহা সে করিতেছিল তাহা ডাকাতির বেনামদার, এবারে নামটা গ্রহণ করিল। সেকালের ডাকাত বলিয়া নাম পড়িলে তাহারা লজ্জা বোধ করিত না, জমিদারের আমলাগিরির চেয়ে তলোয়ারবাজিকেই তাহারা শ্রেয় মনে করিত। তলোয়ারের চেয়ে যে কলমের ধার বেশি এ প্রবাদ তাহাদের সৃষ্টি যাহারা কলম ছাড়া আর কিছু চালাইতে শেখে নাই।

পরন্তপ পরশুরামের দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পরে ডাকাতের দলটি চলন বিল অঞ্চলের, এমন কি রাজসাহী পাবনা অঞ্চলের, শ্রেষ্ঠ দল হইয়া উঠিল। ব্যবসার গুণে পরন্তপের এবং ডাকাতগণের শ্রীবৃদ্ধি হইল। কোন ডাকাতের না শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ?

পরশুরামের দলের নেতা বলিয়া পরন্তপ সাধারণের মধ্যে পরশুরাম নামে পরিচিত হইল।

বৎসর দুই পরে চাঁপার একটি মেয়ে হইল। চাঁপা মেয়েটির নাম রাখিল সুজানি।

ইদানীং কিছুকাল হইল চাঁপার সঙ্গে পরন্তপের মন কষাকষি চলিতেছিল। বাহ্যত কোন বিবাদ ছিল না, আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছিল। নদীতে জলের ঠিক নীচেই চর পড়িয়া যায়, বাহির হইতে বোঝা যায় না, কিন্তু একখানা ছোট ডিঙি চলিতে গেলেও বাধিয়া যায়। এখন মেয়েটি হইবার পরে শুষ্ক বালুর চর মাথা তুলিল, নৌকা চলাচলের সম্ভাবনাও আর রহিল না। প্রথম হইতেই পরন্তপ মেয়েটিকে বিষচক্ষে দেখিল, আবার সেই সূত্রে চাঁপার সহিত প্রকাশ্য সঙ্কট দেখা দিতে আরম্ভ করিল। পরন্তপ সুজানিকে কখনো কোলে লইত না, কখনো কাছে ডাকিত না; বরঞ্চ সর্বদাই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া অনাদর প্রকাশ করিত। শিশু হইলেও সুজানি পিতার অনাদর বুঝিতে পারিত, সে দূরে দূরে থাকিত, তাহাতে পিতার ক্রোধ আরও বাড়িত, রাগিয়া বলিত—খানকির মেয়ে আর কেমন হবে।

পরন্তপ বলিত,—আমি ওকে ডাকাতনি বানাব। চাঁপা বলিত—নিজে ডাকাত হয়েও কি সাধ মেটে নাই ?

পরন্তপ রাগিয়া বলিত—আমি ওকে ডাকাতের সঙ্গে বিয়ে দেবো।

চাঁপা বলিত—আগে বড় তো হোক, তখন দেখা যাবে কে কার সঙ্গে বিয়ে দেয়।

পরন্তপ উত্তর করিত—তুমি ভাবছ আমি ততদিন অপেক্ষা করব, আমি এই বছরেই বিয়ে দিয়ে ফেলব। কে ঠেকায় দেখি।

সুজানির বয়স দুই বছরও পূর্ণ হয় নাই।

একদিন ডাকাতি হইতে ফিরিয়া মত্ত অবস্থায় পরন্তপ সুজানিকে আছাড় মারিল। চাঁপা কাঁদিয়া উঠিল, পরন্তপ হাসিয়া উঠিল। সুজানির শক্ত প্রাণ, এখনও অনেক দুঃখ-কষ্ট তাহার অদৃষ্টে আছে তাই সে মরিল না, দুইদিন অচৈতন্য থাকিয়া মাসখানেক ভুগিয়া সারিয়া উঠিল।

চাঁপা বুঝিল মেয়েকে এখানে রাখিলে বাঁচানো সম্ভব হইবে না—কিন্তু পাঠাইবেই বা কোথায়? এমন সময়ে পরন্তপ আবার ডাকাতি করিতে বাহির হইয়া গেল। এই সব উপলক্ষ্যে সে দশ-বারো দিন, কখনো মাসাধিক কাল অনুপস্থিত থাকিত। চাঁপা ভাবিল—এই উপযুক্ত অবসর।

সুজানির উপরে পরন্তপের রাগের কারণ বুঝিয়া ওঠা সহজ নয়। হয়তো চাঁপার উপরে তাহার বিদ্বেষ আছে তাহাই মেয়ের উপরে গিয়া পড়িল। হয়তো সে ভাবিল যে মেয়ে ইন্দ্রাণীর গর্ভে জন্মিলে জমিদারির মালিক হইতে পারিত আজ সে ভিখারিনীর বেশে, সমাজের উপেক্ষিতা হইয়া আসিয়াছে—তাই তাহাকে সে বিষচক্ষে না দেখিয়া পারিল না।

বিলের কাঁধির যদু চাকি মাঝে মাঝে পারকুলে পরন্তপের বাড়ি আসিয়া রক্ষাকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যাইত। আসিবার সময়ে সে হাতে করিয়া বাড়িতে তৈয়ারি ঘি, ক্ষীর ও ফলমূল আনিত, রক্ষাকর্তাকে ভেট দিয়া যাইত। চাঁপার সঙ্গে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছিল। এবারে যদু চাকি আসিলে চাঁপা তাহাকে বলিল—চাকি, সুজানিকে নিয়ে গিয়া মানুষ করো—এখানে থাকলে আমি বাঁচাতে পারব না—

যদু চাকি জানিত, চোখেও দেখিয়াছে শিশুটির উপরে কি রকম অত্যাচার হইয়া থাকে। সে সহজেই রাজি হইল। চাঁপা সুজানিকে সাজাইয়া গুছাইয়া দুধ পান করাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চাকির কোলে তুলিয়া দিল। সুজানি কাঁদিল না—ভাবিল এ একটা নূতন মজা হইতেছে। যদু চাকি তাহাকে লইয়া চলিয়া গেলে চাঁপা ঘরে আসিয়া মেজের মধ্যে লুটাইয়া পড়িল।

পরন্তপ ফিরিয়া আসিয়া সুজানিকে না দেখিয়া শুধাইল—খানকির বিটিটা কোথায় ?

চাঁপা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—তার হয়ে গিয়েছে। পরন্তপ হাসিয়া বলিল—বাঁচা গিয়েছে। এবারে আর একটা গেলেই বাঁচি।

যদু চাকি মাঝে মাঝে আসিয়া চাঁপাকে সুজানির সংবাদ দিয়া যাইত। একবার আসিয়া বলিল—মা, আমি তো ওকে আর রাখতে সাহস করি না।

চাঁপা বলিল—কেন বাবা ?

যদু বলিল—জান তো বাবু মাঝে মাঝে আমার বাড়ি পায়ের ধুলো দেয়, একদিন গিয়ে প্রায় সুজানিকে দেখে ফেলেছিল, অনেক কষ্টে ব্যাপারটা ঢাকা দিই, কোন দিন দেখে ফেলবে সেদিন ওর আমার দুজনেরই প্রাণ যাবে।

চাঁপা বলিল—বাবা, এখানে আনলেও তো রক্ষা করতে পারব না।

যদু বলিল—তবে ওকে আমার বোনের বাড়ি পাঠিয়ে দিই, সেখানে কষ্ট হবে না।

কষ্ট হইবে না শুনিয়া চাঁপা কাঁদিল, বলিল—যা হয় করো।

যদু ফিরিয়া গিয়া সুজানিকে তাহার বোনের বাড়ি রাখিয়া আসিল।

যদু চাকির বোনের বাড়ি আতাইকুলা গ্রামে। গ্রামটিও চলন বিলের ধারেই। যদুর বোনের শ্বশুরবাড়ির অবস্থা মন্দ নয়। সে শিশুটিকে পাইয়া খুশী হইল। যদু বলিল—মোতিয়া, আমি মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাব। সে যাইবার পূর্বে সুজানির ইতিহাস মোতিয়াকে বলিল, নিষেধ করিয়া দিল এসব কথা আর কাহাকেও যেন সে না জানায়। মোতিয়া জানাইবে আর কাহাকে, সে বিধবা এবং নিঃসন্তান।

মোতিয়ার বাড়ির পাশে একঘর সমৃদ্ধ গৃহস্থ ছিল। সে তাহাদের স্বজাতি। বুড়া বনোয়ারী ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখিয়া মোতিয়াকে বলিল—বউ, মেয়েটিকে আমাকে দাও, আমার নন্তুর সঙ্গে ওকে বিয়ে দিই। বয়সে বেমানান হবে না।

নণ্ড বৃদ্ধের একমাত্র সন্তান। বয়স বছর আষ্টেক, কাজেই সত্যই বেমানান হইবার কথা নয়।

নণ্ডর সঙ্গে সুজানির বিবাহ হইয়া গেল। তখনকার দিনে শিশুর বিবাহ প্রচলিত ছিল—এখনো কোথাও কোথাও যে না হয় এমন নয়।

বিবাহের বছরখানেকের মধ্যেই নণ্ড ওলাউঠায় মরিল। বনোয়ারীর স্ত্রী পুত্রবধূকে অপয়া, রাক্ষসী, স্বামীখাকী আখ্যা দিয়া তাড়াইয়া দিল। সুজানি যেমন না বুঝিয়া যদু চাকির বাড়িতে গিয়াছিল, যেমন মোতিয়ার বাড়িতে এবং পরে বনোয়ারীর বাড়িতে আসিয়াছিল, তেমনি কিছুই না বুঝিয়া আবার মোতিয়ার বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এবার এত সহজে রক্ষা পাইল না, কারণ নণ্ডর মা তাহাকে দেখিলেই ঝাঁটা লইয়া আসিত। মোতিয়া বাধা দিলে রাগিয়া বলিত, নিজে স্বামীখাকী কিনা তাই স্বামীখাকীর উপরে এত দরদ! নিজের পেটের ছেলে হলে বুঝতে আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে।

মোতিয়া বুঝিতে পারিল সুজানিকে এখান হইতে সরাইতে হইবে। কিন্তু সরাইবে কোথায়? যদু চাকির বাড়িতে পাঠানো আর চলে না, ইতিমধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে ভাবিল দূর গ্রামের কোন সমৃদ্ধ গৃহস্থ যদি মেয়েটি লইতে চায়, তবে তাহাকে দান করিয়া দিবে, এখানে থাকিলে সুজানির শান্তি নাই, তাহারও অশান্তি।

পাশের গাঁয়ের একটি মেয়ের সঙ্গে মোতিয়া সই পাতাইয়াছিল। একদিন মোতিয়া তাহাকে বলিল—দেখিস তো সই কেউ যদি সুজানিকে নিতে চায়।

তারপরে বলিল—কাছাকাছি কাউকে দিচ্ছি না, খুব দূর দেশের লোক হলেই তবে দেব, যাতে ওর দুঃখের কাহিনী আমার কাছে আর না আসতে পায়।

সই সন্ধান করিতে রাজি হইল। মোতিয়া স্থির করিল—যাহাকেই দিই না কেন, সুজানির বৈধব্যের ইতিহাস তাহাকে জানাইব না। পাপের জন্য বিধাতা আমাকে যেন শাস্তি দেন।

এমনি ভাবে সুজানির তিন বৎসর কাল জীবনের মধ্যেই মানব জীবনের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার বন্যা বহিয়া গেল। তবে বন্যার জলের মতোই কোন চিহ্ন রাখিয়া গেল না, যেটুকু পলি জমিল তাহাতে অজ্ঞাতসারে তাহার জীবনকে হয় তো সরসতর, সুন্দরতর করিতেই সাহায্য করিল।

যদু চাকি সত্যই বলিয়াছিল সুজানি কষ্ট পাইবে না, আর তাহার উক্তিতে চাঁপার ক্রন্দনও সমান সত্য। সংসার এমন বিচিত্র স্থান যে স্বতোবিরুদ্ধের এখানে সত্য হইয়া উঠিতে বাধা নাই।

সুজানিকে বিদায় করিয়া দিবার পরে চাঁপা নিঃসম্বল হইয়া পড়িল। দুরন্ত সংসারসমুদ্রে একখানি কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করিয়া সে এতকাল ভাসিতে ছিল, এবারে তাহাও গেল। চাঁপা ডুবিতে শুরু করিল।

সুজানি বিদায় হওয়াতে পরন্তপের অত্যাচার আরও বাড়িল—আগে চাঁপা উত্তর দিত, এখন সে মৌন অবলম্বন করিল। রাগের কথার উত্তর না পাইলে রাগ আরও বাড়ে, চাঁপার উত্তর না পাইয়া পরন্তপের ক্রোধ ও অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িল। ভিতরের দুঃখে এবং বাহিরের অত্যাচারে চাঁপার আচরণে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। অবশেষে সে বদ্ধোন্মাদ হইল। পাগল লইয়া ঘর করা পরন্তপের স্বভাব নয়, অথচ চাঁপাকে সে বিদায় করিয়া দিতেও পারিল না, কাজেই তাকে ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখার সিদ্ধান্ত করিল। উন্মাদিনী চাঁপা একাকী একটি কক্ষে অবরুদ্ধ হইল। তাহাকে খাদ্য ও পানীয় দিবার জন্য দুইজন দাসী নির্দিষ্ট হইল। চাঁপা কাঠি দিয়া সুজানির মূর্তি আঁকিয়া আঁকিয়া ঘরের দেয়াল ভরাইয়া ফেলিল। কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিবার হুকুম ছিল না, চাঁপাও কাহারও সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিত না। পিরামিডের অভ্যন্তরে সমাধিস্থ সৌন্দর্যময়ীর মতো সে মৃতের জীবন যাপন করিতে লাগিল।

ক্রমে পূর্ব দিকে একটা পাণ্ডুরাভা দেখা দিল, আশেপাশের শিশির-ভেজা গাছপালার আকার মূর্তি-পাওয়া ভূতপ্রেতের মতো অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, ফিঙে ডাকল, দোয়েল ডাকল, অবশেষে কাক ডেকে উঠল, হুতুমের হুম হুম থেমে গেল, বেনে বউ হাতুড়ি রেখে দিল, শীতের পূর্ব আকাশে এখন মৃতের মুখমণ্ডলের দীপ্তিহীন পাণ্ডুবর্ণ। এতক্ষণে ডাকুরায় ও পরন্তপ পরস্পরকে প্রথম দেখতে পেল। সারারাত্রি দুজনে পথ চলেছে—কিন্তু অন্ধকারের নিবিড়তায় কেউ কাউকে দেখতে পায় নি।

পরন্তপ দেখল—ঘোড়ার লাগাম ধরে যে লোকটি পাশে পাশে চলেছে তার বিপুল বলিষ্ঠ দেহ, মাথার চুল শাদা, গোঁফদাড়ি কামানো, রঙ কালো, ভ্রূ আছে কি না বোঝা যায় না। সে দেখল, তার গায়ে হাতকাটা পিরান, ধুতি মালকোচা-মারা, পায়ে নাগরা।

ডাকুরায় দেখল—অশ্বারোহীর বয়স চল্লিশের অধিক হবে না, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে মানানসই বীরবহ; দেহায়তন লাঠিয়ালের, কুস্তিগিরের স্থূলতা তাতে নেই। ডাকুরায় দেখতে পেল, অশ্বারোহীর পিঠের জামা ছিন্ন, সেখানে কালশিরে এবং রক্তের চিহ্ন, চোখে মুখে পরিশ্রান্তির অবসাদ। তার বিশ্বাস হল, কাল যে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে অশ্বারোহীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু তখনো সে বুঝতে পারল না—অশ্বারোহীই পরন্তপ রায়। পরন্তপ রায়ের নাম জনশ্রুতিতে সে শুনেছিল।

এবারে সে অশ্বারোহীকে সম্বোধন করে বলল—সাহেব, এখন তো ভোর হল, এবারে কোথায় যেতে হবে বলা হোক।

সেকালের লোকে অপরিচয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে সাহেব বলে সম্বোধন করত। বাবু বলাতে শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা হয়, বাবু সাহেব বলাতেও তাই, কাজেই এ দুয়ের মধ্যে আপোসমূলক সম্বোধন করে কাজ চালানো হত।

অশ্বারোহী বলল—সাহেব, আপনি আমার জন্তে অনেক করেছেন, আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনে, এবারে বোধ হয় আমি নিজেই যেতে পারব।

ডাকু বুঝল, অশ্বারোহীর পরিচয় দিতে অনিচ্ছা, তাতেই তার পরিচয় পাওয়ার ইচ্ছা বেড়ে গেল, বলল—বিলক্ষণ, আপনার অবস্থা যে রকম দেখছি, দুপা হাঁটতে পারবেন না, যাবেন কি করে?

অশ্বারোহী বলল—কিছু যদি মনে না করেন, তবে প্রস্তাব করি যে ঘোড়াটি আমার কাছে থাক, লোক দিয়ে আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব।

ডাকু বলল, ঘোড়ার জন্ত ভাবছিনে, ভাবছি এই যে উপকারীকে পরিচয় দিতে অনিচ্ছার কারণ কি?

পরন্তপ দেখল—এর পরে আর পরিচয় না দেওয়া চলে না। তার পরিচয় না দেবার একমাত্র কারণ পরাজয়ের গ্লানিকে স্বনামে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু তা ছাড়া আর তো উপায়ও নেই।

পরন্তপ বলল—সামনেই পারকুল গাঁয়ে আমার বাস।

ডাকু রায় বলে—উঠল—তবে সাহেবই পরন্তপ রায়।

পরন্তপ স্বমুখে পরিচয় দেওয়ার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বলল—ঠিকই বুঝেছেন। কিন্তু আমার উপকারীর পরিচয় তো এখনো পেলাম না।

ডাকু বলল—উপকারীর উপকারই পরিচয়—যদি সত্যিই উপকার কিছু করে থাকি।

তারপরে একটু থেমে বলল—আমার নাম ডাকু রায়, নিবাস ছোট ধুলোড়ি।

ডাকু দর্পনারায়ণের আসবার পর থেকে কখনো বড় ধুলোড়ির উল্লেখ করতো না। এবারে দুজনে পরস্পরকে নমস্কার প্রতিনমস্কার করল।

পরন্তপের কাছে ডাকু রায়ের নাম অজ্ঞাত নয়, দুজনেই সমব্যবসায়ী। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে দুজনের ব্যবসার এলাকায় একটু প্রভেদ আছে। পরন্তপের প্রধান এলাকা স্থল, ডাকুরায়ের প্রধান এলাকা জল, একজন 'ল্যাণ্ড পাওয়ার', একজন 'সী-পাওয়ার'—এই ভাবে দুইজনে অঞ্চলকে ভাগ করে

নিয়েছে। এত দিনে তাদের জনশ্রুতিতে পরিচয় ছিল, ঘটনাচক্র এবার দুজনকে একত্র এনে ফেলল।

ডাকু রায় বলল—পারকুল তো সামনেই।

পরন্তপ বলল—বড় জোর আর ক্রোশখানেক হবে। তারপর সে বলল—আজ মহাশয়কে আমার আতিথ্য স্বীকার করতে হবে।

ডাকু বলল—বিলক্ষণ, তাতে আর আপত্তি কি।

পরন্তপ বলল—আপনার যোগ্য আয়োজন করতে পারি এমন সম্ভাবনা নেই, কিন্তু অতিথির গুণেই অতিথেয়তার ত্রুটি ঢেকে যাবে।

ডাকু বলে—কি যে বলছেন! আপনার সঙ্গে বহুকাল হল পরিচয় করবার ইচ্ছা। সুযোগ পাই নি, আজ ঘটনাচক্রে অনেক কালের আশা পূর্ণ হল।

তখন দুজনে এই ভাবে পরস্পরকে আপ্যায়িত করতে করতে পথ চলতে লাগল। তখনো রোদ ওঠে নি, কিন্তু বেশ ফর্সা হয়েছে। গাছের থেকে টুপ টুপ করে শিশির পড়ে পথের ধুলোয় টোপ খেয়েছে, পাশের শটি-ভাটির বন থেকে ভেজা গন্ধ উঠছে, অদূরে খালের উপরে ভাঙে ভেজা মলমলের মতো ধূসর কুয়াশা ঝুলছে, চাষীরা লাঙল কাঁধে নিয়ে কেবলি বেরিয়েছে, অনেকে এখনো ঘরের দাওয়ায় বসে হুঁকোয় শেষ টান দিচ্ছে, মুখে ঠুসিদেওয়া গোরুগুলোর ধুলো শুঁকে মরাই সার, খালের মধ্যে মাছ ধরবার থরা পাতা হয়েছিল, তাতে জলের স্রোত বাধা পেয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করছে, একটা মাছরাঙা এই ভোরেই এসে হাজির। মাঠে সর্ষে ফুলের পীতিমা শিশিরের প্রলেপে শ্বেতাভ। একটা বাবলা গাছের তলায় দুটো হাঁড়িচাঁচা লাফিয়ে লাফিয়ে চরছে। এই মাঠখানা পার হলেই পারকুল গ্রাম, গাছের ফাঁকে ফাঁকে ধোঁয়ার রেখা গ্রামের অস্তিত্ব জানাচ্ছে।

ডাকু রায়ের যখন নিদ্রাভঙ্গ হল তখন অপরাহ্ণ। গত রাত্রির নিদ্রাহীন ক্লান্তির উপরে আহারান্তের নিদ্রা তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল,

সে ভেবেছিল একটু গড়িয়ে নেবে, তাড়াতাড়ি বিশ্রাম সেরে নিয়ে বাড়িতে ফিরবে। এখন বাইরে তাকিয়ে দেখল সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে, বাড়ি ফিরবার সময় আর নাই। তখন সে আর উঠবার ত্বরা করল না, শুয়ে গড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল।

প্রথমেই তার মনে হল কেন সে দর্পনারায়ণের পিছু পিছু গুরুদাসপুরে রওনা হয়েছিল। গোড়ায় সে ভেবেছিল যে ডাকাতদের বিরুদ্ধে রায় মশাইকে সাহায্য করবে! কিন্তু দর্পনারায়ণ সেখানে আগে গিয়ে পৌঁছবে, তার অধীনে লাঠি ধরবার চিন্তামাত্রেই তার মন বিদ্রোহ করে উঠল। তখন সে ভাবতে ভাবতে চলল যে দর্পনারায়ণের যেন পরাজয় ঘটে, তাতে তার শত্রুরও যেমন মুখ ছোট হবে, তেমনি গেরস্তরও শিক্ষা হয়ে যাবে, ভবিষ্যতে আর কেউ তাকে অবহেলা করে দর্পনারায়ণকে ডাকবে না। কিন্তু গুরুদাসপুরের কাছে এসে লোকমুখে খবর পেল যে ডাকাতের দল বেদম মার খেয়ে ফিরে গিয়েছে, লোকটি আরও জানাল যে ধুলোউড়ির বাবু এসেছিল বলেই আজ গ্রাম রক্ষা পেল, নইলে পরশুরামের হাত থেকে বাঁচবার উপায় ছিল না। খবর শুনে ডাকু ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল, ভাবল আর এগিয়ে কি হবে। সে বাড়ির দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিল, এমন সময়ে মনে হল—তাও বটে, ফিরে গেলেই কি অপমানের প্রতিশোধ দেওয়া হবে। দর্পনারায়ণ পরাজিত হলে হয়তো তার রাগ পড়ে যেত, কিন্তু তার কৃতিত্বের গৌরবকাহিনী ডাকুর মনকে সংসারের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করে তুলল। তার মনে হল—সংসারশুদ্ধ লোক তাকে ফাঁকি দেবার জন্য উদ্যত। তার মনে পড়ল আজ সকালে যে গেরস্ত ডাকুর ভাগের ধান দিতে এসেছিল মাপে সে কম করে এনেছিল! আবার মনে হল কয়েক বছর আগে সে একখানা ছিপ নৌকো কেনবার দুদিন বাদেই তার তলে ফুটো দেখা দিয়েছিল, এমনি আরও কত কি তুচ্ছ ঘটনা! এখন দর্পনারায়ণের হাতের অপমানের সূত্রে সে-সব মাল্যাকারে গ্রথিত হয়ে উঠতে লাগল। তার মনে হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য সক্রিয়, ডাকু রায়কে অপমানিত করা, ডাকু রায়কে ফাঁকি দেওয়া। তখন সে ভাবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে

তাকেও সচেতন হয়ে উঠতে হবে, আর তার প্রথম ধাপটি হচ্ছে দর্পনারায়ণকে হীন প্রতিপন্ন করা, আবশ্যক হলে হত্যা করা। সে স্থির করল যে পরাজিত ডাকাতদলের সঙ্গে সে যোগ স্থাপন করবে, তাতে করে উভয় পক্ষেরই বলবৃদ্ধি হবে, তারপরে সুযোগ আসতে আর কত বিলম্ব? বেশি বিলম্ব দেখলে সুযোগ খুঁজে নিলেই হবে। এই ধারায় চিন্তা করতে করতে সে অন্ধকারের মধ্যে চলতে লাগল—এবং দৈবাৎ খোদ পরন্তপ রায়ের সঙ্গে কেমন করে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেল, সে সব কথা পাঠকের অবিদিত নেই।

ডাকু ভাবল বিধাতা তার প্রতি প্রসন্ন, তাই তিনি অতর্কিতে পরন্তপের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। তার মনটা খুশি হয়ে উঠল। অবশ্য এখনো সে পরন্তপের কাছে আসল কথাটা পাড়ে নি, সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, ভেবেছিল বিশ্রামান্তে বলবে। সে সময় তো এল, কিন্তু পরন্তপ আসে কই? বুনো শুয়োর যেমন কাদার মধ্যে গড়ায় তেমনি ভাবে প্রশস্ত শয্যার উপরে সে গড়াগড়ি দিতে দিতে দরজার দিকে চেয়ে রইল।

দরজার ফাঁক দিয়ে মাঠের মধ্যে একটা কাঁঠাল গাছ দেখা যাচ্ছে, তার পুবদিকের ডালের পাতাগুলো হলদে হয়ে উঠেছে, অন্যদিকের ডালগুলোর পাতা এখনো ঘনশ্যাম। ডালের উপরে দুটো হাঁড়িচাঁছা পাখি পরস্পরকে তাড়া করে খেলা করছে, নীচের শুকনো পাতার রাশে বাতাসে মরমরানি শব্দ, আরো দূরে নদীর ওপারে সন্ধ্যার ছায়া। ডাকু রায় কালের চিহ্নহীন এই দৃশ্যটির দিকে চেয়ে রইল। মানুষ যতই বিজ্ঞ অভিজ্ঞ হোক না কেন প্রকৃতির স্পর্শ পেলেই সে শিশুর মতো হয়ে পড়ে, এ বিষয়ে ডাকাতে আর সাধুতে প্রভেদ নাই।

এমন সময় সে পদশব্দে চমকে উঠল, দেখল পরন্তপ ঘরে প্রবেশ করেছে। ডাকু উঠে বসল।

পরন্তপ বলল—উঠলেন কেন, বিশ্রাম করুন না।

ডাকু বলল—বিশ্রাম করতে গিয়েই জো যাওয়া হল না।

পরন্তপ হেসে বলল—তা আমি জানতাম। আপনি যখন আজই যাওয়ার কথা বললেন, আমি থাকবার জন্যে পীড়াপীড়ি না করে আপনাকে বিশ্রাম

করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, জানতাম কালকার রাত্রিজাগরণের পরে ঘুমিয়ে পড়লে আজ আর রওনা হতে পারবেন না।

ডাকু তার কথা শুনে বলল—হলও তাই। এখন ভাবছি ভোর রাত্রে রওনা হয়ে পড়ব।

পরন্তপ বলল—আপনার কাছে আমি প্রাণটার জন্তে ঋণী।

ডাকু কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্তে বলে—আপনাদের গ্রামটি ছোট হলেও সুন্দর।

পরন্তপ তাকে খুশি করবার আশায় বলে—তাই বলে আপনাদের ধুলোউড়ির মতো নয়।

ডাকু রায় সোজা হয়ে বসে বলল—ধুলোড়ি এক সময়ে ভালোই ছিল রায় মশায়, কিন্তু স্বর্ণলঙ্কার আর সে দিন নেই।

—কেন? লঙ্কায় কি হনুমানের আবির্ভাব হয়েছে নাকি? বলে পরন্তপ হো হো করে হেসে ওঠে।

হাসিতে বাধা দিয়া ডাকু বলে—এক রকম তাই। বুঝলেন রায় মশায়, বেশ ছিলাম সকলে, কিন্তু ওখানে একটা লোক এসে বসবার পর থেকে দলাদলি আরম্ভ হয়ে গাঁয়ের মানুষ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

—বটে? গাঁয়ে বসে আপনার উপরেও ছড়ি ঘোরাতে পারে এমন লোকও আছে নাকি?—বিস্মিত হয়ে পরন্তপ শুধোয়।

পরন্তপ আবার শুধোয়—লোকটা কে? নাম কি?

ডাকু নিরীহের মতো বলে—দর্পনারায়ণ চৌধুরী?

—দর্পনারায়ণ চৌধুরী? চমকে ওঠে পরন্তপ।

ডাকু মনে মনে হাসে, ভাবে তোমার উপরেও ছড়ি ঘোরায়, শুধু আমার উপরে নয়।

পরন্তপ জিজ্ঞাসা করে—কতদিন হল লোকটা ওখানে এসেছে।

—বছর দুই হবে। তারপর প্রশ্ন করে—কেন লোকটাকে চেনেন নাকি?

কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর থেকে পরন্তপ বলে—আপনি এইমাত্র আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনার কাছে মিথ্যা বলব না, কাল রাত্রে ওই লোকটার জন্তেই আমাদের পরাজয় হয়েছে। তারপর শুধোয়—আচ্ছা বলতে পারেন ও লোকটা ওখানে এল কি করে?

ডাকু রহস্য ফাঁস না করে বলে—ওর তো কাজই লাঠিবাজি করে বেড়ানো, খবর পেয়ে এসেছে।

ডাকু যেমন পূর্বেতিহাসের অনেকটা চেপে গেল, পরন্তপও তেমনি তাদের পরিচয়ের জোড়াদীঘি পর্ব প্রকাশ করল না। দর্পনারায়ণের পূর্বপরিচয় দিতে গেলে তারও পূর্বপরিচয় বেরিয়ে পড়বার আশঙ্কা। বলিষ্ঠ প্রকৃতি হৃতগৌরবের উল্লেখ করতে সঙ্কোচ বোধ করে।

ডাকু হেসে বলল—তাহলে দেখছি দুই নদীই একই সমুদ্রে এসে মিশল।

পরন্তপ ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বলল—হাঁ, লোকটা আমাদের দুজনেরই শত্রু।

এই কাজটুকুই কঠিন ছিল। এখন দুজনের স্বার্থ সমান স্বীকৃত হওয়ার পরে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির হওয়া নিতান্ত আনুষঙ্গিক মাত্র।

ডাকু বলল—চলুন না রায় মশায়, একবার ছোট ধুলোড়িতে পদধূলি দেবেন।

পরন্তপ বলে—অমনি দর্পনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গেও দেখা হবে, কি বলুন?

ডাকু বলে—মন্দ কি! পুরাতন বন্ধু, দেখাসাক্ষাৎ তো হওয়াই উচিত।

পরন্তপ হেসে বলে—এবারে দেখা হবে শ্মশানে। ডাকু বাধা দিয়ে বলে —কিম্বা রাজদ্বারে?

দর্পনারায়ণের পূর্বেতিহাস মনে পড়ায় পরন্তপ বলে ওঠে—রাজদ্বার তার দেখাই আছে।

তারপরেই আত্মসম্বরণ করে বলে,—মানে তাকেই দেখতে হবে।

ডাকু বলে—রাজদ্বারে আর যেতে হবে না, আমরা দুজনে একত্র হলে তাকে শ্মশানদর্শনই করতে হবে।

তার স্পষ্টভাষণে পরন্তপের মনের সন্দেহ দূর হয়ে যায়—সে আগ্রহে তার হাত দুখানা চেপে ধরে বলে—আপনি আমার জীবন দান করেছেন, আপনাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমার সমস্ত সাহায্য আপনি পাবেন!

তারপরে যেন নিজের মনে বলে উঠল—নাঃ, আর সহ্য হয় না!

ডাকু যেমন আশা করেছিল, এ পর্যন্ত তেমনি তো ঘটল, সে বুঝল মিত্ররূপে পরন্তপকে পাওয়া গেল, তাতে আর ভুল নেই, আর দুজনের লক্ষ্য যখন অভিন্ন তখন কোনদিন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতেও পারে। কিন্তু ডাকু রায় হিসেবি লোক, ওইখানে পরন্তপের সঙ্গে তার প্রভেদ, আর সেই জন্যেই পরন্তপের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক সে, বস্তুত হিসেবী ডাকাত ও হিসেবী মাতালের মতো ভয়াবহ জীব নেই। মদ শয়তানের স্বরূপ, সেই মদকে যারা নিয়ন্ত্রিতভাবে পান করতে অভ্যস্ত তারা শয়তানের পিতামহ।

হিসেবী ডাকু বুঝল যে আর এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করা উচিত হবে না, তাই সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলল - একবার দয়া করে ছোট ধুলোড়িতে পদার্পণ করলে বড়ই সুখী হব।

পরন্তপ বলল—সে কি কথা! আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন, আমার তো ওখানে যাওয়া কর্তব্য, দয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

নদী যেমন বিলে প্রবেশ করে স্তিমিতগতি হয়ে হারিয়ে যায়, কোথায় গেল লক্ষ্য করা চলে না, তেমনি তারপরে দুজনের আলোচনার প্রসঙ্গ সংসারের হাঁড়িকুঁড়ি, কাঁথাকম্বল ও দৈনন্দিন ছোটখাটো সুখদুঃখের কথার মধ্যে ঢুকে পড়ে বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে পড়ল। নৈশ আহারের পূর্বে দুজনে যখন উঠল, তখন স্থির হল যে শেষরাত্রে ডাকুরায় রওনা হয়ে যাবে। ডাকু বলল—তখন আর আপনাকে জাগাব না, শীগগীরই আপনি যাবেন, তখন আবার দেখা হবে।

ভোর রাত্রে নির্ধারিত সময়ে ডাকু ঘোড়া খুলে রওনা হল। তখনও চারিদিক অন্ধকার, গ্রাম সুপ্ত, স্বপ্নের পাশ ফিরবার শব্দের মতো মাঝে মাঝে পাখির পাখার শব্দ! অশ্ব মন্দগতি। ডাকুর মনে হল সে যেন একটা স্বপ্নের আবহাওয়ার মধ্যে চলেছে। কিন্তু এই কথা মনে হবার আরও একটু কারণ

ছিল। কাল রাত্রে সে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু সেটা কি সত্যই স্বপ্ন? আর যদি স্বপ্ন না হয় তবে বাস্তব বলে স্বীকার করতে হয়, সে যে আরও অসম্ভব! সে দৃশ্য দেখবার সময়ে সে কি জাগ্রত ছিল, না নিদ্রিত? তার মনে হয়েছিল হঠাৎ জানালার বাইরে একটি মনুষ্যমুখ দেখা গেল। প্রথমটা সে লক্ষ্য করে নি, কিন্তু কেমন যেন একটা অনুভূতি হল যে একটা দৃষ্টি যেন তার মুখের উপরে নিক্ষিপ্ত। বিদ্যুতের আলো মুখে এসে পড়লে নিদ্রিতের নিদ্রা যেমন ভেঙে যায়, তেমনি তার ঘুম ভেঙে গেল। সে তাকিয়ে দেখল একখানা মুখ। মুখের সবটা দেখা যাচ্ছিল না, মাঝে মাঝে লোহার শিকের কালো দাগ—কিন্তু যতটা দেখা যাচ্ছিল তাতে সে বুঝতে পারল মুখখানি স্ত্রীলোকের, আর সে মুখ বড় সুন্দর।

ডাকু উঠবে ভাবল—কিন্তু কেন জানি না ওঠা হল না। সে ভাবল কি জানি হয়তো ওটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়—কিন্তু তার বেশ মনে আছে চোখে হাত দিয়ে সে অনুভব করল চোখের পাতা বন্ধ নয়। ডাকুর কৌতূহল হল, ভাবল দেখাই যাক না কি হয়। সে ভাবল জেগেছি জানালে মূর্তি হয়তো চলে যেতে পারে। কারণ তাকেই যে সন্ধান করতে এসেছে তার স্থিরতা কি; বরঞ্চ সেটাই তো অসম্ভব। ঘরের মৃন্ময় দীপালোকের আবছা আলোতে সে মুখখানি বড় সুন্দর, আর বড় করুণ বলে ডাকুর মনে হল, আর সবচেয়ে বিস্ময়জনক মনে হল তার চোখের দৃষ্টি—চোখ দুটি কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত, পথ-হারানো ভাইবোনের মতো চোখ দুটি কেমন যেন উদাসভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দীপালোকের দুধেলা আলোয় সবই কেমন তার রহস্যময় মনে হল। রাত্রির অন্ধকারে সুন্দরকে সুন্দরতর, কুৎসিতকে অধিকতর কুৎসিত দেখায়, দিনের আলোয় সবই সমান। ডাকু বুঝল—এ মূর্তি সুন্দরী। হঠাৎ তার মনে হল মূর্তির ওষ্ঠাধর যেন নড়ছে, যেন সে কিছু বলতে চায়, ডাকু কান পেতে রইল। তারপরে স্বপ্নে-শোনা শব্দের মতো শুনল··· জানো? জানো! নামটা শুনতে পেল না! আবার শুনে চমকে উঠল? ও বলে কি? ওকি কুসমি বলল নাকি? তা কি করে সম্ভব? এবারে

স্পষ্ট শুনতে পেলো—স্বজনি! কুসমি নয়। ডাকু নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়েও চিন্তা কমে কই? স্বজনি কে? তার সঙ্গে এই রমণীর সম্বন্ধ কি? আর তাদের দুজনের সঙ্গে ডাকুর যোগ কোথায়? তাছাড়া এই রহস্য-ময়তার হেতুই বা কি? হঠাৎ তার মনে হল যে পাগল নয়তো! ভালো করে দেখবার জন্যে চোখ ফিরিয়ে দেখে যে জানলা শূন্য—কেউ কোথাও নাই! তার একবার মনে হল—সমস্তটাই একটা স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্নই বা কি করে হয়? সে যে জাগ্রত! এই রকম চিন্তা করছে এমন সময়ে তৃতীয় প্রহরের শিবাধ্বনি উঠল। রাত্রি গতপ্রায় বুঝতে পেরে ডাকু রায় শয্যা ত্যাগ করল! হাতমুখ ধুল, এবং আস্তাবল থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে যাত্রা করল! যাত্রা করল বটে—কিন্তু ওই মুখ, তা স্বপ্নেরই হোক আর বাস্তবেরই হোক, তার সঙ্গ ছাড়ল না। শুকতারা যেমন পথিকের সঙ্গ ত্যাগ করে না, পথিক যখনই তাকায় দেখে যে তার সঙ্গেই আছে, তেমনি করে ওই স্বপ্নস্বরূপ মুখচ্ছবি ডাকুর সঙ্গ নিয়ে চলল।

## এ পক্ষ

পূর্বোক্ত ঘটনার পরে তিন বৎসর গিয়েছে, আমাদের গল্প আরম্ভ হবার পরে সবশুদ্ধ চার বৎসর।

একদিন সকালবেলা ডাকু রায়ের মা তার কাছে বসে বলল—খোকা, কুসমির বিয়ের যা হয় একটা ব্যবস্থা কর।

অত্যন্ত পাষণ্ড ডাকাতরাও মায়ের কাছে চিরকাল খোকাই থাকে।

ডাকু এরকম প্রশ্নের মুখে আগেও অনেক বার পড়েছে, সে বলল—মা, তুমি তো বিয়ের কথা বলেই খালাস। কিন্তু এই বিলের মধ্যে আমি বর কোথায় পাই বল তো।

ক্ষান্তবুড়ি, ওই নামেই ডাকুর জননী পাড়ায় পরিচিত, বলল—কেন, চলন বিলের মেয়েদের কি বিয়ে হচ্ছে না।

ডাকু বলে—হবে না কেন? কিন্তু অত খোঁজাখুঁজি করবার আমার সময় হয় কই?

ক্ষান্তবুড়ি বলে—তোর সময় হবে না বলেই কি আমার সময় বসে থাকবে? আমি কবে মরে যাব—তখন মা-মরা মেয়েটাকে দেখবে কে? তোর তো সংসারের দিকে মন দেওয়ার সময় নেই।

ডাকু হেসে বলে—তুমি মরতে যাবে কেন মা! কে তোমাকে মরতে দিচ্ছে!

ক্ষান্ত সস্নেহে বলে—সংসারে মা কি চিরদিন থাকে? তবে কুসমির মা গেল কেন?

তারপরে একটু থেমে আবার বলে—তখন তোকে বললাম খোকা, আর একটা সংসার কর। তুই কান দিলি না। আমার কথা শুনলে মেয়েটার জন্যে আজ আমার এত দুশ্চিন্তা হতে যাবে কেন? আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারতাম।

ডাকু বলে—মা, মরবার জন্যে তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন? সংসারে তোমার কি অসুবিধেটা হচ্ছে শুনি।

স্নেহ-ভালবাসার এ উত্তর-প্রত্যুত্তরের কি আর জবাব আছে! মা পুত্রের নিকটে সরে এসে তার গায়ে আদরে হাত বুলিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ দুজনে নীরব থাকবার পরে মা বলল—আচ্ছা ও পাড়ার মোহন ছেলেটা তো মন্দ নয়, তোর যখন এদিক ওদিক খুঁজবার সময় নেই, আমি বলি কি ওর সঙ্গেই কুসমির বিয়ে দে না কেন—দুটিতে বেশ মানাবে—

ডাকু মাতার কথায় বিরক্তি প্রকাশ করে একটু সরে বসল, বলল—মা কী যে বলছ—ওরা যে নাপিত।

মা হেসে বলল—ওরকম অপবাদ শত্রুরা দেয়, নাপিত হতে যাবে কেন বালাই। এক গাঁয়ে সকলের বাস—কার কি জাত তা কি ভিনগাঁয়ের লোকের কাছ থেকে শুনতে হবে?

ডাকু বলল—আচ্ছা, নাপিত নাই হল—কিন্তু ওরা যে আমার শত্রু!

ক্ষান্ত বলল—বিয়েটা হয়ে গেলেই তোর আপনার লোক হবে। তা ছাড়া সংসারে কেউ শত্তুর বা আপন হয়ে জন্মায় না—ব্যবহারে আপন পর হয়। এই তো দেখলাম বাছা কত আপন পর হল, কত পর আপনার হয়ে উঠল।

ডাকু হেসে বলল—মা তোমার সঙ্গে কথা বলে পেরে উঠবে কে?

মা বলল—ভগবান তো তোদের মতো আমাদের হাতে লাঠি-শড়কি দেন নি—কেবল কথা দিয়েছেন।

ডাকু আবার হেসে বলে—ওরকম কথা পেলে লাঠি-শড়কি ছাড়তে রাজি আছি।

বুড়ি বড় দুষ্টু, বলে—আমার মতো কথা বলতে চাস? আচ্ছা তবে আগে আমার কথামতো কাজ কর।

তারপরে সে যেন নিজের মনেই বলে চলে—বৌমাকে সেই যে তুই রাগ করে বাপের বাড়ি রেখে এলি, আর আনবার নামটা করলিনে।

ডাকু বলে—তোমার কথা একেবারে অগ্রাহ্য করি নি, মাঝে মাঝে যেতাম তো বটে।

ওসব কথা যেন বুড়ির কানে ঢোকে না—সে পূর্বসূত্র অনুসরণ করে বলে যায়—একবার ফিরে এসে বললি যে একটা মেয়ে হয়েছে। আমি বললাম, বাবা এবার ওদের নিয়ে আয়, বৌয়ের উপরে রাগ করবি কর—মেয়েটা কি দোষ করল। কিন্তু তুই নড়লিনে। তারপরে যখন গেলি সব শেষ হয়ে গিয়েছে। তবু ভালো যে মা-মরা মেয়েটাকে সেখানে রেখে না এসে নিয়ে এসেছিলি! তখন ওর বয়স কতই বা ছিল—তিন-চার বছরের বেশি হবে না।

তারপরে কুসমির শৈশব জীবনের কথা মনে পড়ায় বৃদ্ধা তন্ময় হয়ে বলতে থাকে—মেয়েটা কি কম দুষ্টু! আমাকে প্রথম প্রথম বলত 'মোতি মাচি!' আমি যত বলি, আমি তোমার মাসি নই দিদি, ও তত বেশী করে বলে 'মাচি'।

ডাকু বলে—মা কুলীনের ঘরের মেয়ের মামার বাড়িতে মানুষ হওয়াই তো রীতি, তুমি অত দুঃখ করছ কেন?

মা বলে—তুই তো ওই এক কথা শিখেছিস, কুলীন, কুলীন!

ডাকু বলে—ওটা কি কম সুবিধে মা! কুলীন বলেই তো ওকে এতদিন বিয়ে না দিয়েও নিজের কাছে রাখতে পেরেছি। নইলে এতদিন কবে শ্বশুর-বাড়ি পাঠাতে হত।

মা বলে—তাই বলে কি চিরদিন রাখবি? ওর তো বোধকরি বছর বারো বয়স হল।

ডাকু বলে—মা তোমার এক-এক সময় এক-এক রকম হিসাব। বিয়ের হিসাবে ওর বয়স বারো। আর যখন আমি ওকে শাসন করতে যাই তুমি বল—ছোট শিশুকে অমন করে শাসন করতে নেই।

কান্ত বলে—তলোয়ারের ধার তোর কথায় লেগেছে দেখছি।

তারপরে বলে—বাবা, মেয়েদের বিয়ের বয়সটাই আসল বয়স। বাকি হিসাবগুলো তো আদরের হিসাব। চল্লিশ বছরের মাগীও মায়ের কাছে খুকি!

বুড়ি একটু থামে, আবার বলে—মাঝে মাঝে আমার মা যখন এখানে

আসত, আমাকে চালভাজা দিয়ে বলত, খুকি খা! বৌমা শুনে আড়ালে হাসত। একদিন আমার চোখে পড়ায় শুধোলাম, বৌ হাস কেন? বাপ-মায়ের কাছে কি ছেলেমেয়ে বুড়ো হয়, খোকা-খুকিই থাকে।

তারপরে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বলে—তুই তো এখনও আমার খোকা।

ডাকু বলে—সেই জন্তেই কুসমি তোমাকে ক্ষেপায়, বলে, দিদি তোমার খোকার জন্তে দুধ-ভাতু রেখে দাও।

কান্ত বলে—তুই শুনেছিস দেখছি—

ডাকু বলে—মা, সংসারে থাকতে গেলে অনেক শোনাই শুনতে হয়।

তখন স্নেহানুরোধের স্বরে আবার বলে—খোকা, এবারে বাবা একটু উদ্যোগ কর, মেয়েটার বিয়ে হল দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে মরি।

ডাকু হাসে বলে—ওই জন্তেই তো ওর বিয়ে দিচ্ছি না—জানি ওর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তুমি প্রাণে ধরে মরতে পারবে না।

বুড়িও হাসে, বোধকরি খুশীই হয়, অসম্ভব স্নেহের প্রলাপও মানুষকে আনন্দিত করে তোলে। বুড়ি বলে—আচ্ছা আমি না হয় তোর জন্তে চিরকাল বেঁচেই থাকব, তুই একটু উদ্যোগ কর।

ডাকু বলল—মা, মেয়ে বড় হয়ে উঠলে যে বিয়ের চেষ্টা করতে হয় তা কি জানি না। কুসমির বিয়ের জন্তে এবারে খোঁজখবর আরম্ভ করব ভাবছিলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে দেখছ তো মা কুঠিয়াল লোকটা কি রকম উৎপাত শুরু করে দিয়েছে।

কান্ত বলে—সত্যি কথা বলি বাছা, আমি তো চৌধুরীবাবুর দোষ দেখি না। যতদূর জানি লোকটাকে নির্ঝঞ্ঝাট বলেই মনে হয়। বিলে এসে বসলেই লোকে খুনখারাপি করে, চৌধুরীবাবু তা না করে চাষবাসের দিকে মন দিয়েছে—সে তো ভালোই বলতে হবে।

ডাকু বলে—মা তুমি সরল মানুষ, কোন কাজের কি ফল হবে তা বুঝতে পার না। এমনিতেই তো চলন বিল ভরাট হয়ে উঠছে—ছেলেবেলায় যেখানে অথৈ জল দেখেছি যে-সব জায়গায় এখন গ্রাম বসে গিয়েছে।

তারপরে আরও জায়গা যদি বাঁধ দিয়ে চাষবাসের যোগ্য করে তোলা হয়, তবে চারদিক থেকে লোক এসে চলন বিলকে চাষের ক্ষেত করে তুলবে না? এমন হলে এখানকার লোকের ব্যবসা-বাণিজ্য চলা যে ভার হবে—আমাদের যে না খেয়েই মরতে হবে।

এখানকার লোকের ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে কি বোঝায় মাতাপুত্রের সে বিষয়ে সংশয়মাত্র না থাকলেও পাঠকের থাকা অস্বাভাবিক নয়; চলন বিলের ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে সেকালে বোঝাত ডাকাতি। ডাকু রায়ের ব্যবসার ইঙ্গিত তার নামটাই বহন করছে।

মা বলল—না খেয়ে মরবে কেন বাছা, লোকে এক ব্যবসা ছেড়ে আর-এক ব্যবসা ধরবে, চাষবাস শুরু করবে—সে তো ভালো।

ডাকু বিরক্ত হয়ে বলল—আমাদের ব্যবসাই বা কি মন্দ।

মা বলল - মন্দ কেন বাছা! তবে কালের বদলে ব্যবসার বদল হলে ক্ষতি কি?

ডাকু বলল—কালের বদল হলে তো দুঃখ ছিল না, এ যে মানুষের বদল। আর তার একমাত্র উদ্দেশ্য আমার অবস্থার অবনতি ঘটানো।

ক্ষান্ত বলল—কি জানি বাছা, আমি অতশত বুঝিনে। তবে কি জানিস, যেদিন থেকে ওই বাউণ্ডুলে লোকটাকে তুই জুটিয়েছিস, সেদিন থেকে যত গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে।

ডাকু শুধোয়—বাউণ্ডুলে লোক আবার কে? রায় মশায়ের কথা বলছ—কি যে বলো মা, রায় মশায় অতি সদাশয় ব্যক্তি।

মা বলল—কি জানি বাবা, লোকটার মতিগতি আমার ভালো লাগে না। ও আসবার পর থেকেই ধুলুড়িতে গণ্ডগোল।

ডাকু বলে—মা তুমি এখনি তো আপন-পর সম্বন্ধে কত কথা বললে! বুঝতে পার না, রায় মশায় আমার আপন লোক।

ক্ষান্তবুড়ি বলে—কেন জানি না, বাবা, লোকটার মতিগতি আমার ভালো লাগে না। ওর এখানে ঘন ঘন আসা আমার পছন্দ হয় না।

এমন সময়ে মৈমুদ্দি এসে খবর দিল যে পারকুলের রায় মশায় এসেছেন।

ডাকু বলল—মা, উঠলাম।

খানিকটা অগ্রসর হয়ে ফিরে এসে বলল, মা ভালো করে পাকসাক করতে বলো, রায় মশায় বড় লোক, তার অমান্য না হয় যেন।

ডাকু বাহির-বাড়ির দিকে চলে গেলে ক্ষান্ত বুড়ি পাকঘরের দিকে রওনা হল।

রাত্রের আহারান্তে বৈঠকখানায় প্রশস্ত ফরাসের উপরে ডাকু রায় ও পরন্তপ মুখোমুখি আসীন—পাশে আর-একজন ব্যক্তি, নবাগন্তুক; মাঝখানে ছোট বড় গোটা তিনেক বোতল ও তিনটি কাঁচের গেলাস। তিন জনে যুক্তি করতে বসেছে।

মদ বিনা যে যুক্তি-পরামর্শ তা নিতান্তই অসার। মদে একাগ্রতা দেয়, তন্ময়তা দেয়, তখন মগজের রন্ধ্র থেকে যুক্তিগুলো আপনি পিলপিল করে বেরিয়ে আসতে থাকে। আগে ইউরোপীয় সমাজের কথাই ধরা যাক—তারাই এখন সমাজের প্রধান। খাদ্য এবং মদ্য বিনা তাদের কোন সভা-সমিতি সিদ্ধ হয় না। মদ্য নিবারণের উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান কর, তাতেও মদ চাই। অনেকটা বিষের দ্বারা বিষক্রিয়া নাশের চেষ্টার মতো। ইউরোপীয় সমাজে যা afterdinner speech বা ভোজান্তিক ভাষণ নামে পরিজ্ঞাত তা আর কিছুই নয়, মদিরার স্বর্ণ জাদুযষ্টির স্পর্শে বক্তাদের ব্রহ্মরন্ধ্রভেদী বাক্যময় বনস্পতির অকালিক আবির্ভাব মাত্র। মদ্যই এখানে অভূতপূর্বের ঘটক। কিন্তু কেবল ইউরোপীয়গণ এই গৌরবের একমাত্র অংশীদার মনে করলে ভুল হবে। এ দেশের তান্ত্রিক, কাপালিক, অঘোরপন্থী প্রভৃতি নিত্যধামযাত্রীদের নৈমিত্তিক এবং অপরিহার্য পাথেয় মদ্যের গণ্ডূষ, অবশ্য গণ্ডূষটা অনেকক্ষেত্রেই অগস্ত্যের সমুদ্রধারী গণ্ডূষ। তান্ত্রিকগণের

ভৈরবীচক্র যে প্রবাহের স্রোতে আবর্তিত হয়ে মহাসুখের পথে যাত্রা করে কে না জানে যে সেই প্রবাহ সুরায় সুরধুনী ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব উদার তত্ত্ব স্মরণ রাখলে ডাকুরায়ের বৈঠককে কোনমতেই অদ্ভুত বা অন্যায় বলে মনে হবে না। ওই বোতল তিনটি চিন্তাজগতের চাবিকাঠি। চাবি ছাড়া সিংহদ্বার খুলবার চেষ্টা তো অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা।

ডাকু সযত্নে তিন গেলাস মদ ঢেলে দুটি পাত্র অপর দুজনের নিকটে এগিয়ে দিয়ে তৃতীয় পাত্রটি সযত্নে হাতে তুলে নিল এবং তারপরে পাত্রের উপরে নানারকম মুদ্রার ভঙ্গীতে জপ করতে নিযুক্ত হল। বৃথা মদ্য ও মাংস গ্রহণ এবং বৃথা নরহত্যা করা ডাকুর স্বভাববিরুদ্ধ।

পাত্র তিনটি তিনজনের যথাস্থানে গিয়ে আশ্রয় পেল—তখন আর-একবার তিন পাত্র পূর্ণ হল—আবার সেগুলো যথাস্থানে প্রবেশ করল। এইভাবে একটা বোতল শেষ হল। ডাকু বোতলটা উলটিয়ে দেখল যে একটি ফোঁটাও আর পড়ল না, তখন সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে বোতলটাকে মেঝেতে নিক্ষেপ করল—সখেদে বলে উঠল—সংসারের নিয়মই এই। কিছুই চিরস্থায়ী নয়—আর সেই জন্যেই তো মহাপুরুষেরা সংসারে মন দিতে নিষেধ করেছেন।

তার কথা শুনে তৃতীয় ব্যক্তি বলল—জে! বাবু সাহেব ঠিক কথাই বলেছেন। আমার চাচার মস্ত মদের ভাটি ছিল। দেনার দায়ে সেই ভাটি নীলাম হয়ে গেলে চাচা সংসার ছেড়ে মস্তানা হয়ে বেরিয়ে গেল। সবাই বলল—ও করিম, ও কর কি? চাচা বলল—আর কী সুখে সংসারে থাকা! সবাই শুনে বলল—ঠিক বলেছ, তুমি এগোও, আমরা আসছি।

তাদের নৈরাশ্যজনক আলাপ শুনে পরন্তপ বলে উঠল—এখনো দুটো বোতল আছে, এখনি পীর-ফকিরের কথা কেন? আগে ও দুটো ফুরোক তখন দেখা যাবে। তাছাড়া, এই বলে সে ডাকুর দিকে তাকাল, বলল—কুঠিয়াল লোকটাকে নিকেশ না করেই সন্ন্যাসী হবেন?

ডাকু রায়ের এতক্ষণে সংসারের নিম্নস্তরের বিষয় মনে পড়ে গেল, সে হঠাৎ

পরন্তপের পা দুটো সবলে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করল, বলল—দোহাই দাদা! দোহাই বাবাঠাকুর! যেমন করেই হোক তোমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

পরন্তপ বলে—আহা, ছাড়ুন! ছাড়ুন!

ডাকু বলে—ভোঁ কুরো ভাঁ করো, কালা কালা নাহি ছোড়ে গা।

এই বলে সে গুন গুন করে গান ধরল

নাকের নীচে গোঁফ রয়েছে, কাঁঠাল গাছে ফল
কলুর বাড়ি লাগল আগুন, তেল কোথায় বল!

গান শেষ করে বুকের উপরে গোটা দুই কিল মেরে চীৎকার করে উঠল—আহা কি গীতই না লিখে গিয়েছে! শুনলেই মোহপিঞ্জর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা হয়!

নবাগন্তুক মাথা নেড়ে বলল—জে!

ডাকু বলল—জে বললেই হবে না চাচা! আসল কথাটার উত্তর দাও দেখি—তেল কোথায় বল?

নবাগন্তুক এমন গূঢ় রহস্যভেদ করতে হবে আগে জানে নি, তাই চুপ করে রইল!

ডাকু ভালো করে উঠে বসে বলল—আগেই জানতাম—এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ম্লেচ্ছের কাজ নয়—এ যে সাধনার গুহ্যতত্ত্ব!

তার পরে বলল—বুঝিয়ে দিচ্ছি! মন দিয়ে শোনো। কিছুক্ষণের জন্য তোমার চাচার কথা ভুলে যাও। এই দেখো গোঁফও আছে, গাছে কাঁঠালও আছে, কেবল গোঁফে দেবার তেল নেই।

নবাগন্তুক বলল—জে।

ডাকু বলল—জে! জে করলেই হয় না। ভালো করে সবটা বুঝে নাও! এদিকে কলুর বাড়িতে আগুন লেগেছে—কাজেই তেল কোথায় বল!

তেল যে কোথায় তা নবাগন্তুকের বুদ্ধির অগম্য, তাই সে চুপ করে

রইল। কিন্তু চুপ করলেই ডাকু নিরস্ত হবে এমন তার মনের অবস্থা নয়। সে ক্রমাগত স্বর চড়ায় আর দাবি করে "তেল কোথায় বল।"

নবাগন্তুক থতমত খেয়ে চুপ করে থাকে—কিন্তু ডাকুর দাবি কমে না, অবশেষে সে বিরক্ত হয়ে চীৎকার করে ওঠে, তবে রে শালা, নেড়ে, তেলের খবর না জেনে হিঁদুর বাড়িতে এসেছিস কোন সাহসে? আজ তেলের খবর দিয়ে তবে বেরুবি—

এই বলে সে লাফিয়ে উঠে নবাগন্তুকের গলায় গামছা বাধিয়ে টানতে থাকে।

সে মূঢ়ের মতো পরন্তপের দিকে তাকিয়ে শুধোয়, বাবুজি, এ কোথায় আনলেন?

পরন্তপ বলে ভয় নেই। দাঁড়াও আমি ঠিক করে দিচ্ছি—এই বলে সে একটা বোতল খুলে ডাকুর মুখে ঢেলে দেয়, বলে, রায় মশায়, এই দেখুন তেল!

ডাকু অনেকটা পরিমাণ 'তেল' গিলে ফেলে বলে—আঃ!

তার পরে—নবাগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বলে—দেখে নে শালা, দেখে নে, তেল কোথায়!

ততক্ষণে সে বোতলের অর্ধেকটা গিলে ফেলেছে। ডাকু করুণ মিনতিতে আর্তনাদ করে ওঠে, মা মা, তোমার অধম ছেলেকে কোলে নাও মা।

এই বলে সে দড়াম করে তক্তপোশের উপরে শুয়ে পড়ে, তক্তপোশ মড়মড়, দেয়াল থরথর ও ঘরের চাল মচমচ করে ওঠে। শোবামাত্র তার নাক ডাকতে শুরু করে! পরন্তপ বোঝে আজ সারারাত্রির মধ্যে তার জাগবার সম্ভাবনা নেই। দুজনে অনেক বিনিদ্র রাত্রির সহচর কিনা।

পরন্তপ বলে—রোস্তম খাঁ, নাও এই বোতলটা তুমি নাও।

এই বলে অর্ধশূন্য বোতলটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে পূর্ণ বোতলটা টেনে নেয়।

রোস্তম খাঁ বলে—বাবুজি এ কোথায় আনলেন?

পরন্তপ বলে—ঠিক জায়গাতেই এনেছি। বাকিটুকুও খেয়ে নাও, ওই

সুরে তোমারও মনের সারেঙ বেজে উঠবে। এখনো পুরোমাত্রা পড়ে নি বলেই এসব তোমার অদ্ভুত ঠেকছে।

পরন্তপের উক্তির সত্যতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই বোধকরি রোস্তম খাঁ বোতল শূন্য করতে মনঃসংযোগ করল।

পরন্তপ বলল—আজকে এমনি চলুক, কালকে শলাপরামর্শ হবে।

রোস্তম বলে—আজকে এমনি চলুক, কালকেও এমনই চলুক, সারাজীবনই এমনই চলুক না কেন? শলাপরামর্শ তো বেয়াকুবে করে!

তারপরে সে আরম্ভ করল—আর এত পরামর্শেরই বা আছে কি?

একটু থেমে আবার বলে—জানেন বাবুসাহেব পুকুরে থাকলেই পানি, বোতলে থাকলেই দারু। আমি তো এই বুঝি। তাই বলি এর মধ্যে এত বুঝবার আছেই বা কি?

ক্রমে তার কথা জড়িয়ে আসতে লাগল, তখনো সে বলছে এত পরামর্শের আছেই বা কি? কি বলেন বাবু সাহেব।

এই রকম বকতে বকতে অবশেষে সে নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন সেই প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠে নিঃসঙ্গ বসে পরন্তপ নিজের ভাগের বোতলটি শেষ করতে লাগল। পরন্তপ মদ খায়, সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি—কিন্তু সে কখনো নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে না। নেশার বশীভূত মানুষ, কিন্তু যে-মানুষ সেই নেশাকেও বশীভূত করতে পারে তার মতো ভয়ঙ্কর লোক বিরল। মাতাল জুগুপ্সাকর, হিসাবী মাতাল ভয়ঙ্কর।

পরের দিন দুটি খাসিকে মধ্যাহ্নভোজন উপলক্ষ্যে সমাধা করে অপরাহ্ণের দিকে তিনজনে আবার পরামর্শের জন্যে সমবেত হয়েছে। আগের দিন রাত্রে তিনজনে পরামর্শ করবার জন্য মিলিত হয়েছিল, তার পরিণাম দেখেছি আজ তারা একটু গড়িয়ে নেবার নাম করে বসল—বাজে কথা বলতে বলতে কাজের কথা উঠে পড়ল।

ডাকু রায় বলল—রায় মশায়, আজ সকালবেলা আপনি আমাদের বিলের প্রশংসা করছিলেন কিন্তু বিল যে আর থাকে না, সব যে চাষের ক্ষেত হয়ে গেল।

পরন্তপ বলল—রকম তো তাই দেখছি।

ডাকু বলল—বিল গেলে আমাদের গ্রাসও যাবে, শেষে দেখছি লাঠি ছেড়ে লাঙল ধরতে হবে।

পরন্তপ সোজা হয়ে উঠে বসে বলল—সেই জন্যই তো খাঁ সাহেবকে নিয়ে এসেছি।

রোস্তম অদূরে বসে ছিল—এবারে এগিয়ে এসে বলল—জে! পানি শুকোলে আর বিলের থাকে কি?

ডাকু বলে—থাকে চাষের ক্ষেত। বাকি জীবনটা যে মূলোর ক্ষেতে জল দিয়ে কাটাতে হবে তা ভাবি নি!

পরন্তপ এবারে রোস্তম খাঁকে লক্ষ্য করে বলল, খাঁ, পারবে তো?

রোস্তম বলে—হুজুরদের হুকুম হলে সবই পারি।

পরন্তপ বলে—তবে শোনো। আজ বছর দুই হল—ওই কুঠিবাড়ির বাবু বিলের খানিকটা অংশ বাঁধ বেঁধে ঘিরে নেওয়ার চেষ্টা করছে। গত বছরেও জল এসেছে, উত্তর দিকের বাঁধটা ভেঙে। কিন্তু এবারে যেরকম তোড়জোড় দেখছি, জল আটকাবে।

এবারে ঘটনার সূত্রকে কোলে টেনে নিয়ে ডাকু আরম্ভ করল—কুঠিয়াল লোকটার মতলব আমি জানতে পেরেছি। এবারে বর্ষায় যদি জল না আসতে পারে তবে সে ওখানেও লোক নিয়ে এসে বসাবে। তারপরে সেই সব লোকের সাহায্যে বিলের আরও খানিকটা জমি দখল করে নিয়ে বাঁধ দেবে। আবার সেখানে লোক বসাবে। পরের বছর আবার তারা আরও খানিকটা জমি বাঁধ দিয়ে ঘিরে নেবে। রায় মশায়, এই ভাবে বছর পাঁচ-দশ চললেই সব ফর্সা! চলন বিলের নামটুকুও আর থাকবে না। আমাদের ব্যবসা বন্ধ!

এই পর্যন্ত বলে একটু থামল, তারপরে আবার শুরু করল—আরও

বিপদ দেখুন, যে-সব নূতন লোক বসাবে তারা হবে কুঠিয়ালের আপনজন। তাদের সাহায্যে আমাদের ভিটেছাড়া করতে কতক্ষণ! কেউ বাদ যাবে না। ছোট ধুলুড়ি, পারকুল, মানগাছা কোনখানে কেউ থাকতে পারবে না।

মানগাছা বিলের ধারের আর-একটি গ্রাম। সেখানে রোস্তম খাঁ-র বাড়ি।

এবার রোস্তম খাঁর পালা। সে দুজনকে লক্ষ্য করে বলল—বাবু সাহেব —এমন হলে অবশ্য বিপদ, কিন্তু শয়তানকে এতদূর যেতে দেবেন কেন? কুঠির বাবু বাঁধ বাঁধবে—আমরা মিলে বাঁধ ভাঙব। এবারে যখন বর্ষার পানি এসে ধাক্কা দেবে—তার সঙ্গে আমরাও যোগ দিই না কেন? বানের তোড় আর মানুষের জোর একসাথ হলে কি না করতে পারে? একবার জল ঢুকে পড়লে এ বছরে আর কিছু করবার থাকবে না।

ডাকু বলল—তাতে আর বিপদ দূর হল কই? আসছে বছর আবার সে বাঁধ বাঁধবে।

রোস্তম বলল—আগামী সালে আবার বর্ষার জলের সঙ্গে আমরাও এসে হাজির হব—আবার বাঁধ ভেঙে দেব। এমনি করেই চলবে—একই বাঁধ বাঁধা—আর ভাঙা! বাবুজি আপনাকে আর মূল্যের ক্ষেতে পানি ঢালতে হবে না।

এই বলে পান-খাওয়া তরমুজের বীচির মতো কালো দাঁতের সার বের করে সে হাসল।

পরন্তপ বলল—এ বুদ্ধি ভালো! এখন বাঁধ ভাঙতে গেলে অযথা মাথা ফাটাফাটি হবে, তা ছাড়া আবার গড়ে তুলতেই বা কতক্ষণ! কিন্তু বর্ষার জল এসে যখন ধাক্কা মারবে, তখন সামান্য একটু চেষ্টা করলেই বাঁধ ধ্বসে পড়বে— আর-একবার জল ঢুকে পড়লে সারা বছর কিছু করবার থাকবে না।

ডাকু বলল—সেই ভালো, আপনাদের পরামর্শেই রাজি।

তখন রোস্তম বলল—তা হলে বাবুজিরা একবার গা তুলুন—বাঁধটা দেখে আসি, কি রকম শক্ত করে গড়েছে, কতজন লোক লাগবে—আগে থাকতেই জেনে রাখা দরকার।

তখনো তাদের পেটের মধ্যে খাসির ভগ্নাংশগুলো গজগজ করছিল—খাসি দুটোকে স্বদেহে বহন করে তারা তিনজনে বাঁধ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

ধূলোউড়ির কুঠি থেকে আধ ক্রোশ দূরে বিলের মধ্যে একটা উঁচুমাটির দাঁড়া আছে, বোধ করি এক সময়ে গ্রাম ছিল—এখন সুধু তার উচ্চতর কিয়দংশ বর্তমান। এই দাঁড়াটাও অবিচ্ছিন্ন নয়—মাঝখানে একটা ছেদ আছে। সেই ফাঁক দিয়ে বর্ষার জল ঢুকে পড়ে। ফাঁকটা পাঁচশ হাতের বেশি হবে না। ওইটুকু বাঁধ বেঁধে আটকাতে পারলে বর্ষার জলের পথ বন্ধ হয়। এখন চৈত্রমাসে সব শুকনো।

পরন্তপ লোকজন সংগ্রহ করে ওই ফাঁকটা মাটি তুলে বেশ শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে। সে স্থির করেছে এবারে বর্ষার জল না ঢুকলে আগামী সালে ওখানে লোক বসাবে। যাদের দিয়ে বাঁধ বাঁধিয়েছে—তাদের মধ্যেই জমি বিলি করবে কথা হয়েছে। বাঁধটা দুমানুষ উঁচু হবে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে পূর্বোক্ত তিনজনে কথা হচ্ছিল।

রোস্তম খাঁ একটা তুড়ি মেরে বলল—বাবুজি, এই ব্যাপার! এ যে বাবুয়ের বাসা! ভাঙতে কতক্ষণ? আর কয়জন লোকই বা লাগবে। আপনারা কিচ্ছু ভাববেন না। আমি লোকজন নিয়ে আসব।

ডাকুরায় বলল—খাঁ সাহেব, লোকজন যে তারও আছে।

খাঁ বলল—থাকবেই তো—নইলে লাঠালাঠি বলে কেন বাবুজি! আর তা ছাড়া তাদের শুধু মানুষই আছে—আমাদের সহায় হচ্ছে পানির তোড়।

উঁচু বাঁধের আর-একদিকে কচি-কণ্ঠে আলাপ হচ্ছিল—বাঁধের আড়ালের জন্ত একপক্ষ অপর পক্ষকে দেখতে পাচ্ছিল না। দুই পক্ষই এত তন্ময় ছিল যে কেউ কারু কথা শুনতে পাচ্ছিল বলে মনে হয় না।

বাঁধের অপর দিকের কথাবার্তা অনেকটা এই রকম—

আচ্ছা কুসমি—তুই কটা তারা দেখতে পাচ্ছিস ?

কুসমি জলজলে সন্ধ্যা-তারাটি দেখে সপ্রতিভভাবে বলল—ওই একটা।

মোহন তাচ্ছিল্যের সুরে বলল—মাত্র ?

তখন কুসমি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আকাশে তারার সন্ধানে লেগে গেল।

কুসমির অনবধানতার এই সুযোগে মোহন তার মুখখানা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। এখন তার কিশোর বয়স, কুসমি এখনো বালিকা। মোহনের চোখে কুসমি বড় সুন্দরী, তার মুখখানি মোহনের ভালো লাগে, কেন সে বলতে পারে না। মোহন দেখছে—খোঁপা-পলাতক চুলগুলো কুসমির কানের উপরে এসে কতক বা হাওয়ায় দুলছে, কতক বা ঘামে লিপ্ত। মোহনের মনে হল কুসমির গাল দুটি আগের চেয়ে অনেক পুরস্ত হয়ে উঠেছে—কণ্ঠে দুটি রেখা পড়েছে, রঙটা কচি গাবের পাতার মতো উজ্জ্বল স্বচ্ছ, যেন আর-একটু ভালো করে তাকালেই ভিতরটা দেখা যাবে। মোহনের মনে হয়—ওর সঙ্গে বসে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। মোহনের ইচ্ছা ওর চোখ দুটো আর-একবার দেখে, কিন্তু তারা-গোনা শেষ না হলে সে উপায় নেই, কাজেই মোহন চমকে ওঠে—বাঃ রে, ওর ঠোঁট দুটো কেমন তাজা, কেমন কচি, কেমন লাল, রঙ-ধরে-ওঠা করমচার মতো !

মোহন দেখে কুসমির ঊর্ধ্বোত্থিত চোখ দুটো ঊর্ধ্বাকাশে তারকাসন্ধানী। সে কি করছে ভালো করে বুঝতে পারবার আগেই কুসমির ঠোঁট দুটোর উপরে চুমো খায়—ঠিক সেই মুহূর্তে কুসমি বলে ওঠে—আর-একটা। মোহন সঙ্গে সঙ্গে আর-একবার চুমো খায়।

এবারে কুসমি বলে ওঠে—মোহনদা, তুমি ভারি অসভ্য ! কেন এমন করলে ?

মোহন বলে—বাঃ তুই যে বললি—আর-একটা।

অপ্রস্তুত কুসমি বলে—সে কি তোমাকে বলেছি—আর-একটা তারা দেখেছিলাম···কিন্তু প্রথমবার।

মোহন বলে—রাগ করিসনে কুসমি, প্রথমবার ভুল হয়ে গিয়েছিল।

কুসমি বলে—তোমারি দোষ !

মোহন কবি হলে বলতে পারত—না, সখি, দোষ তোমারই। তোমার মুখখানি বড়ই সুন্দর, স্থানটি বড়ই নির্জন, আর দুজনেরই বয়স বেহিসাবী কাজের অনুকূল। কাজেই একা আমাকে দোষী করলে চলবে কেন? খুব জোর বলতে পার যে—দোষ তোমারও। কিন্তু যে-হেতু বেচারা কবি নয়, বোকার মতো হাত কচলাতে লাগল। তার অপরাধ-বোধে কেন জানি কুসমির আরও বেশি রাগ হল- সে কেবলি বলতে লাগল—তুমি ভারি দুষ্টু, তোমার কাছে আর কখখনো আসব না। তার চোখের জল গালের উপরে গড়িয়ে এসে দুটো তারার মতো ঝলমল করতে লাগল। বেচারা মোহন তখন যদি বুদ্ধি করে বলতে পারত যে কুসমি, তোর গালে আরও দুটি তারা দেখতে পাচ্ছি—তবে সব মান-অভিমান বোধ করি সেই মুহূর্তেই হাসির হাওয়ায় ভেসে চলে যেত ! কিন্তু তা হবার নয়।

কুসমি রাগ করে বাঁধের গা বেয়ে উঠতে লাগল—বাড়ি ফিরবার তার ওই সোজা পথ। বাঁধের মাথার কাছাকাছি উঠেই সে থমকে দাঁড়াল—এবং একটা অস্ফুট আর্তরব করেই তাড়াতাড়ি নেমে এল—প্রায় গড়িয়ে নামল বললেই হয়।

মোহন কাছে এসে শুধাল—কি ?

কুসমি ঠোঁটের উপরে তর্জনী স্থাপন করে বলল—চুপ ! বাবা !

মোহন বলল—তবে ওদিক দিয়ে ঘুরে চল ! পূর্ব মুহূর্তের রাগের কথা বিস্মৃত হয়ে কুসমি মোহনের হাত চেপে ধরল—তখন দুজনে সন্তর্পণে মাঠ ভেঙে বাড়ির দিকে চলল।

মোহন শুধোল—দেখেছে ?

কুসমি বলল—না।

কে বলবে এক মুহূর্ত আগে তাদের মধ্যে রাগারাগি হয়েছিল ? কৈশোরের রাগারাগি, মান-অভিমান পরিণত বয়সের অনুরাগের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি মধুর।

বাঁধের বিপরীত দিকে কথা হচ্ছিল। পরন্তপ শুধোল—আপনার একটিই তো সন্তান? ভাকু বলল—হাঁ, সন্তান বলতে ওই একটি মেয়ে।

পরন্তপ বলল—বিয়ে হয়েছে কি?

ভাকু বলল—না, তবে এবারে চেষ্টা করতে হবে।

পরন্তপকে শুধোল—আপনার সন্তানাদি?

পরন্তপ বলল—আমি তো সংসার করি নি। তার কথা শুনে ভাকু বলল—ভালো করেছেন, মশায়, ভালো করেছেন—অমন ঝঞ্ঝাট আর নেই। দেখুন না কেন, আমার একটা বই মেয়ে নয়, তাকে নিয়ে কি করব ভেবে পাইনে, কেমন করে মানুষ করব, কোথায় বিয়ে দেব—চিন্তায় ঘুম হয় না।

রোস্তম খাঁ সমর্থন জানিয়ে বলল—জে! তিন জনে সোজাপথে বাড়ির দিকে ফিরছে।

*

কুসমি ভেবেছিল যে লুকিয়ে বাড়িতে ঢুকবে, কেউ দেখতে পাবে না কিন্তু খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখে কান্তবুড়ি দাঁড়িয়ে আছে, পাশ কাটিয়ে পালাবার উপায় নেই।

কান্তবুড়ি কুসমিকে দেখে শুধোল—কোথায় গিয়েছিলি রাক্কুসি, আমি যে তোকে খুঁজে মরছি।

কুসমি বলল—রাক্কুসি চরাবরা করতে যাবে না? এই বলে সে সানুনাসিক স্বরে আবৃত্তি করল—হাঁউ মাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ।

বলল—কটা মানুষ খেলি?

কুসমি বলল—কি বিপদেই না আজ পড়েছিলাম, জটাই বুড়ি, একটা মানুষ আজ আমাকে কামড়ে দিয়েছিল আর কি?

কুসমি কান্ত বুড়িকে ঠাট্টা করে জটাই বুড়ি বলে ডাকে।

কান্ত বুড়ি কৃত্রিম ভয়ের স্বরে বলল—সাবধানে চলাফেরা করিস নাতনি, কারণ রাক্ষসে যেমন মানুষ খায় মানুষেও তেমনি রাক্ষস খেয়ে থাকে।

কুসমি বলল—তাই তো আজ দেখলাম। অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেছি।

ভগবান জানেন কুসমির কথা একেবারে মিথ্যা নয়।

এবারে পরিহাসের লঘুভাব পরিত্যাগ করে ভাকুর মাতা বলল—হাঁরে, কুসমি, তুই যে একা একা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াস, তোর যে বিয়ের বয়স হয়েছে।

কুসমি বলে—সেই জন্তেই তো ঘুরি, জটাই বুড়ি।

ক্ষান্ত বলে—কেন নিজের বর নিজে খুঁজছিস বুঝি।

কুসমি বলে—আর করি কি, তোমরা যখন খুঁজবে না।

তারপরে একটু থেমে বলে—তাছাড়া, বিয়ে হলে তো একা একা বিদেশে পাঠিয়ে দেবে, তাই এখন থেকে সইয়ে নিচ্ছি।

ক্ষান্ত বুড়ি পা দুখানা ভালো করে মেলে দিতে দিতে বলে, ভয় নেইরে, কাল তোর বাপকে তোর বরের সন্ধান করতে বলেছি।

কুসমি বলে—তা তো বলবেই, আমি থাকাতে বাড়ির দুধ-ঘি ছানা-মাখন সবটা যে তোমার ভাগে পড়ছে না।

তারপরে কৃত্রিম দুঃখের সঙ্গে বলল—আমার মা থাকলে কি এত তাড়াতাড়ি বিদায় করবার কথা ভাবতে পারতে?

ক্ষান্ত বলল—তাই বই কি! বৌ থাকলে কবে তোকে বিদায় করে দিত। আমি ঠাকুরমা বলেই এতদিন চুপ করে আছি।

কুসমি অন্ধকারে মুখ ভেঙিয়ে বলে উঠল—তুমি ঠাকুরমা না ছাই—তুমি একটি আস্ত জটাই বুড়ি।

ক্ষান্ত বলল—আজ এইখানে বসে গল্পই করবি, না পাকের ঘরে একবার যাবি?

কুসমি বলল—আমি তো সেই দিকেই যাচ্ছিলাম, তুমি তো মাঝ পথে আটকালে।

দুজনে হেসে উঠল। কুসমিকে আজ পারবার উপায় নেই।

মাকে কুসমির মনে পড়ে না। অনেকবার সে চেষ্টা করেছে মায়ের মূর্তি মনে আনতে, পারে নি। অনেকবার ভেবেছে, আহা ঘুমের মধ্যে কত কি মাথামুণ্ডু স্বপ্ন দেখি, একবারটির জন্যে যদি মাকে দেখতে পেতাম। কিন্তু কই স্বপ্নে তো মা তাকে দেখা দিল না। দুরদৃষ্টের স্বপ্নেও সান্ত্বনা নেই। অনেক দিন সে দৃঢ়সঙ্কল্প করে বসেছে যে আজ কল্পনাকে চালিত করে মায়ের মূর্তি আবিষ্কার করবে—কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কল্পনা অধিক দূর এগোতে পারে নি, যেমন চোখের দৃষ্টি বিলের পরপার পর্যন্ত যেতে পারে না, মাঝখানেই ধোঁয়ায়, কুয়াশায় মেঘে আর বাষ্পে বাধা পায়। তবু তো পরপার বলে একটা বস্তু আছে—তেমনি তার মা দৃষ্টিগোচর না হয়েও আছেন—এই ভেবে সে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করে।

বয়সের তুলনায় কুসমিকে কিয়ৎ পরিমাণে অতি-পরিণত মনে হতে পারে—এ অভিযোগ অস্বীকার করবার উপায় নেই। বস্তুত নিঃসঙ্গ-প্রায় বিলবিচারিণী বালিকাটির মনের পরিণাম অল্প বয়সেই কিছু বেশি এগিয়েছে,—তার কারণ প্রকৃতির কোলে মানুষ হলে পরিণতি দ্রুত হয়। তপোবন-কন্যা শকুন্তলা কিছু পরিমাণে যে অকাল-পরিণত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেই বয়সে ছলাকলায় যে পারদর্শিতা সে দেখিয়েছে তা কোন জনপদ-কন্যার দ্বারা হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ। অবশ্য দ্বীপায়নী মিরান্দার কথা অনেকে তুলবেন। সে-ও তো নিঃসঙ্গ, সে-ও তো প্রকৃতি-লালিতা, তবে তার এমন অপরিণতি কেন? কিন্তু সে কি বাস্তবিকই নিঃসঙ্গ ছিল? আমি তা মনে করি না। পিতার প্রভাবের দ্বারা সে এমন সর্বতোভাবে আবিষ্ট ছিল যে কি নিজের দিকে, কি প্রকৃতির দিকে তাকাবার অবকাশমাত্র তার ছিল না। জাদুকর পিতা সহস্ররূপে যেন কন্যাকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল। পিতৃ-পরিচর্যার উচ্চ প্রাকার মিরান্দার দৃষ্টিরোধ করে রেখেছিল, দুস্তর সমুদ্রও তেমন নিশ্চিত বাধাসৃষ্টি করতে পারে নি, বেচারা মিরান্দা পিতৃময় জনতার মধ্যে নিজের আসন্ন যৌবনের বার্তা জানতেই সুযোগ পায় নি—তাই সে এমন

অপরিণত-প্রায় ছিল। একান্তভাবে জনপদকন্যা নয় বলেই কুসমি অকালে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া আরও অনেক কারণ পাঠকের অগোচরে এই পরিণতির তালকে দ্রুততর করে দিয়েছিল। মোটের উপর কুসমিকে আমাদের ভালোই লাগে।

## ৩ পঙ্ক

দীপ্তিনারায়ণ কতকগুলো ইটের আর কাঠের টুকরো নিয়ে একটা বাড়ি তৈরি করতে বসেছে। কিন্তু বাড়ি তৈয়ারি করা যে এত কঠিন আগে কি সে জানত? ইটের পর ইট সাজিয়ে খানিকটা উঁচু হয়ে উঠলেই হঠাৎ সব কেন যে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে দীপ্তি তা বুঝতে পারে না। দু-তিনবার এইভাবে তার বাড়ি ভেঙে পড়বার পরে সে মুখ তুলে বিশাল কুঠিবাড়ির দিকে চাইল! কুঠিবাড়ি কত বড় আর কত কাল ধরে এমনি দাঁড়িয়ে আছে, নড়বার পড়বার নাম করে না,—ভেবে দীপ্তির বিস্ময়ের অন্ত থাকে না, তার ছোট বুকটার মধ্যে কেমন যেন বিশ্বাস জমে উঠতে থাকে শুধু ইট-কাঠ দিয়ে এবাড়ি তৈয়ারি হয় নি, তার সঙ্গে মন্ত্র-তন্ত্র আছে, নইলে তার এতটুকু বাড়ি ভেঙে পড়ে আর এত বড় বাড়ি খাড়া হয়ে থাকে কোন জাদুতে! সে ভাবে ও মন্তরটা শিখে নেবে বুড়ো রাজমিস্ত্রি সাবুরাজের কাছে থেকে।

সাবুরাজ ধুলোউড়ির একমাত্র রাজমিস্ত্রি, মাঝে মাঝে কুঠিবাড়িতে পলাস্তারা মারবার জন্যে আসে—দীপ্তি তাকে দেখেছে। দীপ্তি ভাবে বুড়োকে দেখলেই 'জান' বলে মনে হয়। রোগা খিটখিটে চেহারা, চিবুকের উপরে একগুচ্ছ শাদা দাড়ি, পাকা গোঁফ অত্যন্ত ছোট করে ছাঁটা, চোখের ভুরু মায় চোখের পাতার লোমগুলি অবধি পেকে গিয়েছে, পরনে একখানা ডুরে তবন, কাঁধে গামছা, ডানহাতে 'করনি'। সাবুরাজের সঙ্গে আসে জন দুই ছোকরা বয়সের রাজ। তারা আসে, দেয়ালের সঙ্গে খাড়া করে বাঁশ বাঁধে, বাঁশের আগায় একটা ভাঙা ঝুড়ি আর একটা ঝাঁটা বেঁধে দেয়। তখন সাবুরাজ উপরের দিকে তাকিয়ে তিনবার সেলাম করে বাঁশ বেয়ে উপরে উঠে যায়—হাত-পা একবারও কাঁপে না। দীপ্তি ভাবে মন্তর না জানলে এমন কখন সম্ভব হত না। ওরকম বুড়োর তো সোজাপথে পড়ে মরবার কথা! আর সে উঠে যায় কিনা বাঁশের ভারা বেয়ে, অত উঁচুতে একখানা সরু বাঁশের উপরে

কেমন স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে থাকে! মন্তর জানে সে নিশ্চয়। দীপ্তি স্থির করে—এবারে দেখা হলেই সাবুরাজের কাছ থেকে বাড়ি খাড়া রাখবার মন্তরটা শিখে নেবে।

কিন্তু সে তো আজ হচ্ছে না, আজ বাড়ি খাড়া রাখবার উপায় কি? ইটের স্তূপের কাছে বসে সে ভাবতে থাকে। একবার তার মনে হয় মোহনদা-ই বা আসে না কেন? মোহনদা এলেও যে কাজ চলতে পারে।

বাস্তবিক মন্ত্রের বদলে মোহনের সাহায্যও কম কার্যকরী নয়। দীপ্তি বাড়ি তৈয়ারি করতে আরম্ভ করলে মোহন সাহায্য করে। সাহায্য এমন আর কি? ইটের পরে ইট সাজাতে কি আর দীপ্তি জানে না? খুব জানে, কেবল স্তম্ভটাকে শক্ত করে ধরে রাখবার জন্যে মোহনের দরকার হয়। মোহন হাত দিয়ে ইটের স্তূপটাকে ধরে রাখে। দীপ্তি ভাবে মোহনের গায়ে খুব জোর। অবশ্য মোহনের মতো বয়স হলে তার গায়েও অমনি জোর হবে, তখন আর মোহনের সাহায্যের আবশ্যক হবে না। কিন্তু তার চেয়েও ভালো হয় সাবুরাজের কাছ থেকে মন্তরটা শিখে নিতে পারলে।

সে ভাবে মন্তরটা শিখবার আরও একটা অতিরিক্ত কারণ এই যে আজকাল মোহন আর বড় আসে না, কেবলি ঘন ঘন কুসমির কাছে যায়। ওতে দীপ্তির বড় বিস্ময় লাগে। সে ভাবে মোহনদার এত বয়স হল তবু সে মেয়েমানুষের কাছে থাকতে ভালোবাসে কেন? দীপ্তি তো তার দাসী অম্বিকাকে এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচে! দীপ্তি লক্ষ্য করেছে, আগে যখন তারা তিন জনে মাঠের মধ্যে ঘুরত মোহন দীপ্তির কাছে কাছেই থাকত—এখন একটু সুবিধে পেলেই ওরা দুজনে আলাদা হয়ে একদিকে চলে যায়। এই সব কথা মনে পড়ে দীপ্তির হাসি পায়, ভাবে, মোহনদার ছেলেমানুষি যেন দিন দিনই বাড়ছে।

দীপ্তির একদিনের কথা মনে পড়ল। তিনজনে বিলের শুকনো তলিতে ঘুরছিল, এমন সময়ে মোহন বলল—দীপ্তিবাবু তুমি এখানে বসো, ওখানে জলে পদ্মফুল ফুটেছে, তোমাকে এনে দিচ্ছি। দীপ্তি বসে রইল, কিন্তু ওরা আর

ফেরে না, এদিকে সন্ধ্যা হয়-হয়, ডাকাডাকি করল, কেউ উত্তর দিলে না। তখন দীপ্তি বাধ্য হয়ে চলল পদ্মফুলের দিকে। কিছুদূর গিয়ে সে দেখতে পেল যে বিলের মাঝে এক জায়গায় অনেক পদ্মফুল ফুটেছে—কিন্তু মোহন আর কুসমি কই? শেষে ভালো করে তাকিয়ে দেখে, একি ছেলেমানুষি, দীপ্তি হাসি চাপতে পারে না, মানুষে নাকি এমন কাজও করে থাকে, ছিঃ ছিঃ, দীপ্তি দেখতে পায় যে একরাশ পদ্মফুল সামনে রেখে মোহন কুসমিকে ফুল দিয়ে সাজাচ্ছে! পদ্মর মালা গেঁথে তার হাতে, গলায়, কোমরে পরিয়েছে, এবারে মাথায় দেবার জন্যে পদ্মফুলের মুকুট তৈয়ারি করছে। দীপ্তি ভাবল এমন করেও ফুলগুলো নষ্ট করে—তার চেয়ে কচি কচি বীজগুলো খেলে কি মজাই না হত!

এমন সময়ে চমকে উঠে সে শুনতে পায়, কি দীপ্তিবাবু, তোমার বাড়ি কতদূর?

দীপ্তি বলে—মোহনদা, তুমি না এলে বাড়ি খাড়া থাকে না—একটু ধর তো, দেখো আমি কত তাড়াতাড়ি তৈয়ারি করতে পারি।

দীপ্তি দ্রুত ইঁটের পরে ইঁট সাজিয়ে উঁচু করে করে তোলে, মোহন শক্ত করে চেপে ধরে রাখে। দীপ্তি বলে—মোহনদা, এই তো হল দুটো থাম্বা—এর উপরে এবারে একটা কাঠের বরগা বসাতে হবে—তাহলেই বাস! এই বলে সে হাতে তালি দিয়ে ওঠে, মোহন একটু চমকে উঠতেই স্তম্ভ দুটো হুড়মুড় করে পড়ে যায়।

মোহন বলে, এবারে তোমার দোষ নেই দীপ্তিবাবু, ভূমিকম্পে পড়েছে।

দীপ্তি আবার গাঁথতে উদ্যত হলে মোহন বলে—দীপ্তিবাবু, আজ সারাদিন কি বাড়ি গাঁথা নিয়ে থাকলেই চলবে? ঘোড়ায় চড়বে কখন?

ঘোড়ায় চড়বার নাম শুনেই দীপ্তি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে বলে, চলো, এই বলে সে মোহনের হাত ধরে টানতে শুরু করে। বাড়ি তৈয়ারি করবার সঙ্কল্প সে এক মুহূর্তে ভুলে যায়।

মোহন মনে মনে হাসে, ভাবে ছেলেমানুষ আর কাকে বলে—এক মুহূর্তে

সব ভুলে যায়। তারপরে দীপ্তির আশু বিস্মৃতির সঙ্গে নিজের নিষ্ঠার তুলনা করে একপ্রকার গৌরব অনুভব করে। ভাবে আমার যত কাজই থাক না কেন, কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলে কখনো বিস্মৃতি হয়েছি! কই, বলুক দেখি কুসমি, কখনো তার কাজে অবহেলা করেছি! কুসমির প্রতি দায়িত্ব-পালনকে সাধারণভাবে দায়িত্বপালনের প্রতীক কল্পনা করে নিয়ে সে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে থাকে। ঔদার্যের আতিশয্যে দীপ্তির প্রতি সে সহৃদয়তা অনুভব করে—বলে, বয়সে সব ঠিক হয়ে যাবে—এখনো ছেলেমানুষ কিনা!

মোহনের হাত ধরে টেনে দীপ্তি মাঠের দিকে এগোতে থাকে—এমন সময়ে মুকুন্দ এসে উপস্থিত হয়ে বলে, মোহন, দাদাবাবু তোমাকে ডাকছে।

মোহন একবার দীপ্তির দিকে একবার মুকুন্দর দিকে তাকায়—কিন্তু উপায় নেই; সকলেই বোঝে যে দাদাবাবুর ডাকে যেতেই হবে।

মোহন বলে—দীপ্তিবাবু, তুমি এগোও, আমি যাবো আর আসবো।

দীপ্তি একাকী মাঠের দিকে অগ্রসর হয়।

মোহন বাড়ির ভিতর পৌছলে দর্পনারায়ণ বলে—মোহন, ছাদের উপরে চল—একবার বাঁধটা ভালো করে লক্ষ্য করা যাক।

মোহন বলে—দাদাবাবু, এখান থেকে লক্ষ্য করা যাবে কেন? সে যে অনেক দূর।

দর্পনারায়ণ বলে—চল না দেখাই যাক কি হয়। দুজনে তেতালার ছাদের উপরে পৌছে বিলের দিকে তাকায়। কুঠিবাড়িটা মস্ত উঁচু, আশেপাশে কোথাও আর উঁচু বাড়ি না থাকায় চারদিকে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। তিনদিকে বিল ধূ ধূ করছে—পিছন দিকে ধুলোউড়ি গ্রামের বাড়িঘর আর গাছপালা।

তখন বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি, গাঁয়ের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় আমের গাছগুলোতে ঘন সবুজ ফল, এখনো রং ধরে নি ; কাঁঠাল গাছের ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে স্বর্ণাভ কচি কাঁঠাল ; কুঠিবাড়ির বাগানের লিচু গাছটার মাথায় পাকা ফলের লাল রঙের প্রলেপ ; বাতাসপড়া বিকেল বেলার আকাশে ঝাউগাছগুলো শ্মশানের চিতার ঊর্ধ্বোত্থিত ধূমরাশির মতো স্তব্ধ ; একটা পাপিয়া চোখ-গেল চোখ-গেল আর্তনাদ করতে করতে বিষম যন্ত্রণার বেগে আকাশের একদিক থেকে আর একদিকে ছুটে চলে গেল। গাছপালার মাথাগুলোর বাধা এড়িয়ে মাঠের দিকে তাকালে জনপদের আভাস পাওয়া যায়। ওখানে কে যেন ঠকাঠক আওয়াজে গোরুর খোঁটা তুলবার চেষ্টা করছে, লোকটার হাতের মুগুর খোঁটার মাথায় পড়ছে—তারপরে শব্দটা কানে আসছে ; কার একটা গোরু খোঁটা থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র পথঘাট বিচার না করে বাড়ির দিকে ছুটেছে। গাঁয়ের ডাইনে মস্ত একটা মাঠ, লোকে বিলের মাঠ বলে, হয়তো কোনকালে বিলের অংশ ছিল—এখন সেটা ঘাস-ঢাকা জমি, গোরু-বাছুর চরে। মাঝখানে ঝড়ে-ভাঙা নেড়া একটা বটগাছ।

আর গাঁয়ের দিক থেকে ফিরে বিলের দিকে তাকালে—চোখের ঘোড়-দৌড়ের কোথাও বাধা তো নেই। গাঁয়ের নীচেই অনেকটা জমি শুকনো, শীতকালে সেখানে এক দফা চৈতালি ফসল ফলেছিল—এখনো তার চিহ্নস্বরূপ কাটা ফসলের শুষ্ক গোড়াগুলো রয়েছে, গোরুতেও সব নিঃশেষ করতে পারে নি। তারপরের জমিতে ফসলের চিহ্ন নেই, বুঝতে পারা যায় চৈতালি বুনবার সময়ে সেখানে জল ছিল—তারপরেই জলের সীমানা আরম্ভ হয়েছে —কেবল জল কেবল জল– বেশিদূর আর চোখ চলে না—ধোঁয়ায় কুয়াশায় বাধা পায়। বিলের মাঝে মাঝে এখানে ওখানে উঁচু ডাঙা জমি, সেখানে গাছপালা, আর খোড়োঘর, পর্বতপ্রমাণ উঁচু খড়ের স্তূপ আর গোলাকার ধানের মরাই।

দর্পনারায়ণ ছাদের একপ্রান্তে গিয়ে মোহনকে বলল—মোহন, আমাদের বাঁধটা দেখতে পাচ্ছিস ?

মোহন বলল—ওই পুব দিকটায় আমাদের বাঁধ জানি। কিন্তু এতদূর থেকে দেখা যাবে কেন?

আচ্ছা এবারে দেখ তো দেখতে পাস কিনা—বলে দর্পনারায়ণ ছোট একটা বাক্স খুলে গোলাকার লম্বা একটা নলের মতো বস্তু তার হাতে দিল।

মোহন সেটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বলল—এ যে একটা চোঙা।

দর্পনারায়ণ বলল—চোঙা তো বটে, আর কী আছে দেখ।

মোহন এদিক ওদিক দেখে বলল—দুদিকে দু-টুকরো কাঁচ বসানো!—এ কী জিনিস দাদাবাবু? এ দিয়ে কী করে?

দর্পনারায়ণ বলে—কী করে কিরে! দেখে। দেখবার জন্যে তোকে দিলাম—দেখ না—চোখে লাগা।

সমস্তটা একটা ঠাট্টা মনে করে মোহন চুপ করে থাকল।

তখন দর্পনারায়ণ সেটা তার হাত থেকে নিয়ে নিজের চোখে লাগাল—বলল—এই দেখ, এবারে আমাদের বাঁধটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

মোহনকে লক্ষ্য করে শুধাল, বাঁধের উপরে দুটো গোরু চরছে দেখতে পাচ্ছিস?

মোহন বলল—বাঁধই দেখতে পাচ্ছি না তার গোরু!

তারপরে একটু ইতস্তত করে বলল—ঠাট্টা করছ না তো দাদাবাবু?

—নিজেই দেখ না, ঠাট্টা কি সত্যি—এই বলে দর্পনারায়ণ যন্ত্রটা মোহনের চোখের কাছে ধরবা মাত্র—মোহন ভয়ে, বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল—গোরু কোথায় দাদাবাবু, দুটো মানুষ!

দেখি, দেখি, বলে যন্ত্রটা আবার নিজের চোখে ধরল—বলে উঠল—তাই তো রে। আমাদের বাঁধের গুণ আছে—ওখানে চরলে গোরুতে মানুষ হয়ে ওঠে।

যন্ত্রের মহিমায় মোহনের বিস্ময়ের অন্ত নাই, সে যন্ত্রটাকে আবার খুব শক্ত করে চোখে লাগিয়ে বলল—দাদাবাবু, মানুষও আবার যে সে মানুষ নয়, ডাকু রায় আর পারকুলের পরশুরাম সর্দার!

যন্ত্রযোগে পরখ করে দর্পনারায়ণ বলল, তোর কথাই ঠিক! বেশ হয়েছে—ওরা বাঁধটা দেখুক। দেখুক যে আমরা বিলকে পোষ মানাতে পারি কিনা! বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটলে মোহন বলল—দাদাবাবু, এ তো বড় আজব জিনিস। এ বুঝি সাহেবদের কল!

দর্পনারায়ণ বলল—সাহেবদের কলই বটে! হাঁড়িয়ালের সাহেবদের কুঠি থেকে কিনে এনেছি।

মোহন বলল—বেশ করেছ দাদাবাবু। আমাদের বাঁধ পাহারা দেওয়ার সুবিধে হবে।

দর্পনারায়ণ বলল—সেই জন্যেই তো এনেছি। সেদিন হাঁড়িয়ালের কুঠিতে গিয়েছিলাম, কুঠিয়াল সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। তাদের দেশ থেকে এই রকম ছুটো যন্ত্র নূতন চালান এসেছে দেখলাম—একটা কিনে নিলাম। বাঁধ পাহারার কথা মনে করেই কিনলাম।

বাঁধ পাহারার কাজ সহজ হল ভেবে মোহন আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠে বলল—এ বেশ হল দাদাবাবু, সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে পাহারা দেওয়ার চেয়ে এ অনেক সহজ হল। মাঝে মাঝে একবার যন্ত্রটা চোখে তুললেই হল!

তারপর যন্ত্র থেকে যন্ত্র আবিষ্কারকদের বাহাদুরি স্মরণ করে বলে উঠল—তাই তো। সাহেবদের সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে না।

তারপরে আবার সে যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে দক্ষিণের মাঠের দিকে তাকাল—বলল দেখো, দেখো, দাদাবাবু আমাদের দীপ্তিবাবু কেমন ঘোড়া দাবড়াচ্ছে—

দর্পনারায়ণ তাড়াতাড়ি দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে বলল—তাই তো! কিন্তু পড়ে যাবে না তো?

মোহন বলল—বলো কি দাদাবাবু! এই বয়সে দীপ্তি যেমন পাকা সোয়ার হয়েছে এমন আমি দেখি নি—ওর রেকাব, গদি কিছু লাগে না—কেমন রকমে একটা দড়ি পেলেই হল।

দর্পনারায়ণ যন্ত্রযোগে দেখতে থাকে—দীপ্তি সোজা হয়ে বসে বাঁ হাতে

লাগাম ধরে আছে, ঘোড়া ছুটছে, বাঃ আবার মাঝে মাঝে ছোট ছোট পা দুটো দিয়ে ঘোড়ার পেটে গুঁতোও মারে দেখছি! গৌরবে বাপের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওই বালকের কৃতিত্বে দর্পনারায়ণ যেন তার দূরবর্তী আশার উপকূলের আভাস দেখতে পায়। চোখ থেকে দূরবীন আর তার নামতে চায় না।

কিন্তু আর দূরবীনের দৃষ্টি চলে না—অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে।

তখন মোহন বলল—দাদাবাবু, আমি মাঠের দিকে চললাম, দীপ্তিবাবুর ঘোড়া ধরতে হবে। মোহন বিদায় হয়ে গেলে দর্পনারায়ণ পায়চারিতে প্রবৃত্ত হল।

অনেকদিন পরে দর্পনারায়ণের মনে আজ বড় আনন্দ। দূরবীনের দৃষ্টিতে আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর দুটিকে আজ সে দেখতে পেয়েছে—কত দিনের সাধনার, কত ব্যগ্র বাসনার ফল। বিলের দিকে তাকিয়ে দেখেছে, নিজের চেষ্টায় তৈয়ারি বাঁধটাকে আর দক্ষিণের মাঠে দেখতে পেয়েছে দীপ্তিনারায়ণ ঘোড়ায় চেপে ছুটছে। এখনো বিল শুকিয়ে জনপদ বসবার বিলম্ব আছে, এখনো দীপ্তিনারায়ণের পাকা ঘোড়সোয়ার হয়ে উঠবার অনেক বাকি—তবু সূচনা তো সে দেখতে পেয়েছে। অঙ্কুরে বনস্পতিদর্শনের আনন্দ পায় বলেই মানুষ মানুষ।

সে আজ তিন-চার বছর আগেকার কথা। গুরুদাসপুরের ডাকাতি রক্ষা করে ফিরবার পরে দর্পনারায়ণের মনে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। সে ভাবল—মিছামিছি মারামারি করে লাভ কি? পরন্তপকে হত্যা করতে পারলেই কি সে তার জমিদারি, প্রতিষ্ঠা, পত্নী সব ফিরে পাবে? সে ভাবল যে পরন্তপকে হত্যা করতে গিয়ে হয়তো সে নিজেই হত হবে, তখন পিতৃ-মাতৃহীন, সহায়সম্পদহীন দীপ্তির কি গতি হবে? এই রকম পাঁচ কথা ভাবতে ভাবতে তার কিছুকাল গেল।

এমন সময়ে এক ঘটনা ঘটল। যেখানে বাঁধ তৈয়ারি হয়েছে, বৈশাখের শেষে একদিন দর্পনারায়ণ সেখানে বিকাল বেলায় দাঁড়িয়ে ছিল, তখনো জল বাড়তে আরম্ভ হয় নি। এমন সময়ে সে একটা সোরগোল শব্দ শুনতে পেল, যেন অনেক লোক মিলে একসঙ্গে আর্তবিলাপ করছে। কোথায় কি ঘটেছে দেখবার জন্যে যখন সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে তখন দেখতে পেল একদল চাষাভুষো শ্রেণীর লোক বিপন্নভাবে ছুটছে। দর্পনারায়ণ তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল—শুধোল, ব্যাপার কি? তারা বলল—বাবু, আমাদের সর্বনাশ হল! কেউ বলল—সব গেল, কেউ বলল—সারা বছর ছেলেমেয়ে নিয়ে খাবো কি? কেউ কেউ স্বীকারোক্তি করে ফেলল—সাধে কি আর ডাকাতি করি!

ব্যাপারটা এই। বিলের প্রান্তে যারা শীতের সময় চৈতালি চাষ করে এরা সেই দলের। চৈতালি উঠে গেলে—বর্ষার জল আসবার আগে এরা অল্পদিনের মধ্যে একটা জলি ধান বা জৈষ্ঠি ধান ফলিয়ে নেয়। যমুনার জল সব আগে আসে, কিন্তু তা জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহের পূর্বে নয়। তার আগেই জলি ধান পাকে, চাষীরা কেটে নিয়ে যায়! এ ধান খুব সুখাদ্য নয়, কিন্তু চাষীদের কাছে ওই মহার্ঘ, বিলের মধ্যে ভালো ধান পাবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু কোন কোন বার বৈশাখের শেষেই যমুনার বান এসে পড়ে, তখন আর জলি-ধান ঘরে নেওয়া সম্ভব হয় না। আর কাঁচা ধান নিয়েই বা কি লাভ? কেউ কেউ গোরুকে খাওয়াবার জন্যে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে যায় বটে—কিন্তু অধিকাংশ লোক সে পরিশ্রমও করে না।

এবার নিয়মিত সময়ের পূর্বেই বান এসে পড়েছে—ধানের জমি ডুবতে আরম্ভ করেছে!

দর্পনারায়ণ শুধোল—তোমাদের জমি কতদূরে?

দলের একজন বলল—ওই যে দেখা যাচ্ছে, এই বলে দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

দর্পনারায়ণ বলল—এখন কি বাঁচবার কোন উপায় নেই?

সেই ব্যক্তি বলল—হুজুর! খোদার মার।

দর্পনারায়ণ বলল—খোদার হাতে সব ছেড়ে দিলে চলবে কেন? নিজের হাতে ভার নিতে হবে, তাই তো খোদা মানুষকে হাত দিয়েছেন।

কথাটা যেন তাদের মনে লাগল, এমন কথা তারা আগে শোনে নি।

ওই দলটির মধ্যে দুজন ছিল প্রধান নবীন আর নজির—সবাই মুসলমান।

নবীন বলল—হুজুর, কথা খুব খাঁটি। কিন্তু এ বছরে হাত লাগিয়েও লাভ হবে না। ক্ষেতের মধ্যে হাঁটুজল হয়েছে—আজ রাতেই ডুবে যাবে।

নজির বলল—হুজর যদি পিছে থাকেন তবে আগামী বছর যাতে ফসল মারা না যায় তার জন্যে সকলে হাত লাগাতে রাজি আছি।

দর্পনারায়ণ বলল—তোমরা যদি রাজি থাক তবে পিছনে কেন তোমাদের সকলের সম্মুখে এসে দাঁড়াব।

তখনি নবীন আর নজিরকে নিয়ে কোথায় বাঁধ বাঁধা যায় তার তদ্বির শুরু করে দিল। যেখানে বাঁধ তৈয়ারি হয়েছে—তার দুদিকে অনেকটা করে উঁচু জমি আছে—মাঝখানে কয়েক রশি ফাঁক। দর্পনারায়ণ তাদের বুঝিয়ে বলল—এই ফাঁকটা মাটি দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারলে, এদিকের প্রকাণ্ড মাঠটাকে বর্ষার জলের আক্রমণ থেকে বাঁচানো সম্ভব। আর বর্ষার জল যদি ঢুকতে না পারে, তবে এদিকে আউশ, আমন যা খুশি ফলানো যেতে পারবে। কথাটা তাদের মনে ধরল!

নবীন বলল—হুজুর, এই ফাঁকটা ভরিয়ে তোলা এমন আর কঠিন কি?

দর্পনারায়ণ বলল—বাবা, মন করলে কোনো কাজই কঠিন নয়। কিন্তু মন করে কয়জন?

নজির বলল—হুজুর, আমরা এতজন আছি।

দর্পনারায়ণ বলল—সেই জন্যেই তো ভয়, যত জন তত মন!

নজির বলল—দাঙ্গার বেলায় তাই বটে, কিন্তু ভাতের বেলায় আমাদের মন একটা বই নয়, তাও আজ থেকে হুজুরের জিম্মায় রেখে দিলাম।

দর্পনারায়ণ খুশি হল—বলল—বেশ আমি জিম্মাদার হলাম। যা বলব করতে হবে। কিন্তু এবছরে আর সময় নেই।

তারপর বছর চৈতালি ফসল উঠে চাষাদের কাজ হালকা হবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব নিরূপিত স্থানে বাঁধের কাজ আরম্ভ হল। নবীন আর নজিরের সঙ্গে প্রায় শ দেড়েক চাষী গৃহস্থ ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে এসে হাজির হল। মোহনকে সঙ্গে করে দর্পনারায়ণ এল। প্রথম ঝুড়ি মাটি দর্পনারায়ণ নিজে নিয়ে গিয়ে ফেলল। বাঁধের কাজ দ্রুত অগ্রসর হতে থাকল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁধ টেকানো গেল না। কাঁচা বাঁধের উপরে বর্ষার জল এসে পড়ে সব ধ্বসিয়ে দিল।

চাষী গৃহস্থরা শিশুর মতো অসহায়, তারা বসে পড়ে বলল—হুজুর সব গেল! খোদার মার দুনিয়ার বার।

দর্পনারায়ণ বলল—তোমরা বুঝতে পারোনি বাবা সব! জল হচ্ছে গিয়ে শয়তান। শয়তানে আর মানুষে লড়াই চলছে। এক বছরে কি শয়তানকে হারানো যায়?

তার কথা শুনে কেউ কেউ বলল—ঠিক কথা হুজুর।

দর্পনারায়ণ বলল—আসছে বছর শয়তানকে ঠেকাব।

তার পরের বছর আবার সবাই মিলে বাঁধ বাঁধা আরম্ভ করল—এবারে আর বাঁধ ভাঙল না। কিন্তু চাষ করাও সম্ভব হল না, বাঁধের কাজে সবাই ব্যস্ত, চাষ করবে কে?

দর্পনারায়ণ বলল—আসছে বছর ফসল বোনা হবে, এবারে বাঁধ বাঁধা হল।

আসছে বছর অর্থাৎ যে-বছরের কথা আমরা বলছি বাঁধের আড়ালে ফসল বোনা হবে স্থির হয়ে গেছে। যারা বাঁধ রচনার সাহায্য করেছিল, তাদের সকলের মধ্যে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে জমি বিলি হয়ে গেছে। এসব দর্পনারায়ণ করেছে—সবাই তার ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। কিন্তু এখনো কেউ লাঙল দিতে আরম্ভ করে নি, বানের প্রথম ধাকাটা দেখে সবাই কাজ আরম্ভ করবে স্থির করেছে। মোহনের উপরে বাঁধ পাহারার ভার। শয়তানের আক্রমণের সংবাদ সকলকে সে জানাবে। বর্ধিষ্ণু জলরেখার দিকে তাকিয়ে

মোহন সারাদিন বাঁধের উপরে পাহারা দিয়ে বসে থাকে। বসবার জন্মে সে একখানা টুঙি ঘর তুলে নিয়েছে।

এই গেল দর্পনারায়ণের মনের এক দিকের কথা। আর-এক দিকে ছিল দীপ্তিনারায়ণ। দীপ্তি বীরপুরুষ হবে, ঘোড়ায় চড়া, লাঠি-তলোয়ার খেলা শিখবে, বন্দুক চালানো শিখবে—এই ছিল তার ইচ্ছা। পুত্রের বয়স বছর সাতেক হতে না হতে তাকে ছোট একটা টাটু ঘোড়া কিনে দিল দর্পনারায়ণ, মোহনকে দিল শেখাবার ভার। মোহন পাকা সোয়ার। তার আরও ইচ্ছা ছিল যে দীপ্তি আর কিছু বড় হলেই তাকে অস্ত্রশিক্ষা দেবে। নিজেই দিতে পারবে। মোহন বলত, দাদাবাবু, দীপ্তি আর একটু বড় হোক, এখনি তাগাদা কেন?

দর্পনারায়ণ বলে—ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ করলে তবে তো হাত পাকবে, আর তাছাড়া ও বড় হয়েছে বই কি!

দর্পনারায়ণ যেন কেবল প্রাণপণ ইচ্ছাশক্তির বলেই পুত্রকে ঠেলেঠুলে বয়স্ক করে তুলতে চায়! তার ইচ্ছা ছিল দীপ্তি বীরপুরুষ হয়ে উঠলে হয় তো একদিন পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারবে। ততদিন যদি পরন্তপ জীবিত না থাকে তার পুত্র তো থাকবে!

আজ দীপ্তিকে ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে দেখে মনটা তার ভারি খুশি হয়ে উঠল। সুপ্ত প্রতিহিংসাবৃত্তি পুত্রের কৃতিত্বকে অবলম্বন করে জেগে উঠল, সে ভাবল, সিদ্ধিলাভের দিকে এগোচ্ছে। একদিকে ওই বাঁধ, বিলের পোষ মানবার চিহ্ন, তার গুপ্ত জিগীষার বাস্তব সার্থকতা। আর একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান ওই ক্ষুদ্র মানবক, নিজের মনের জিঘাংসার বাহ্যরূপের দূরগত ক্ষুদ্রায়তন! উল্লাসে তার বুক প্রস্ফারিত হতে লাগল—দ্বিমুখী সিদ্ধি তার করতলগতপ্রায়।

# আর-এক পক্ষ

বাঁধের উপরে একখানা জলটুঙী তুলে মোহন সারাদিন পাহারা দিয়ে বসে থাকে, সারাদিন এবং সারা রাত। মোহন ভাবে ভারি মজা। এখন আর তাকে বাড়ির কাজকর্ম করতে হয় না, ক্ষেত-গেরস্থালি দেখতে হয় না, তার একমাত্র কাজ বাঁধ পাহারা দেওয়া। মাঝে মাঝে নবীন আর নজির এসে খোঁজ নিয়ে যায়, বলে, কি মোহন ভাই, আমরা আসব নাকি?

মোহন বলে—দরকার হলে আসবে বই কি? ওই দেখো না কাঠের পাঁজা—

এই বলে একরাশ শুকনো কাঠ দেখিয়ে দেয়, তারপরে বলে—

দরকার হলে ওই কাঠে আগুন দেবো। তখন তোমরা ছুটে এসো।

নবীন বলে—বানের জল এখনো রাবণ-দীঘি পর্যন্ত এসে পৌছয় নি, এখানে আসতে দেরি আছে।

বিলের অদূরবর্তী একটা অংশের নাম রাবণ-দীঘি।

নজির বলে—এবারে বানে যদি গত বছরের মতো জোর ধরে তবে শীগগিরই জল এসে বাঁধের গায়ে লাগবে।

নবীন বলে—দুই বছর পরে জোর বন্যা হয়, এবারে বন্যায় তেমন জোর বাঁধবে না।

নজির বলে—হাঁঃ, জলের কি আবার নিয়ম আছে নাকি? শুনিসনি বাবু জলকে বলেন শয়তান!

মোহন বুকের উপর দুটো চাপড় মেরে বলে—শয়তান হোক আর দুশমন হোক আমার বাঁধ ভাঙা সহজ নয়। যাই হোক—তাই যদি বিপদে পড়ি, তবে কাঠের পাঁজায় আগুন দেবো, তখন যেন তোমরা এসো।

নবীন নজির দুইজন একসঙ্গে বলে—আমাদের গাঁয়ে পালা করে একজন রাত জাগে। তোমার আগুন দেখলেই আমরা ছুটে আসব।

ধুলোউড়ি থেকে আধ ক্রোশ দূরে বিলের মধ্যে বালুভরা নামে তাদের গ্রাম।

নবীন ও নজির চলে যায়।

বিকেল বেলা একবার করে দর্পনারায়ণ আসে, শুধোয়—কি রে, সব ঠিক আছে তো?

মোহন বলে—দাদাবাবু সব ঠিক। দুটো শব্দই টেনে টেনে দীর্ঘ উচ্চারণ করে।

দর্পনারায়ণ বলে—তোর অসুবিধা হলে বলিস, আমি মুকুন্দকে পাঠিয়ে দেব।

মোহন বলে—ওটি করো না দাদাবাবু! আমি বেশ আছি। তা ছাড়া মুকুন্দ এলে দীপুবাবুকে দেখবে কে?

মুকুন্দ দুবেলা এসে মোহনকে ভাত দিয়ে যায়। দর্পনারায়ণের হুকুম মোহনের ভাত কুঠিবাড়ি থেকে যাবে।

একদিন দুপুর বেলা মুকুন্দর সঙ্গে দীপ্তিনারায়ণ এল। এখন সে আর মোহনের সঙ্গ পায় না। মোহনকে পেয়ে সে আর ফিরতে চায় না, বলে—আমি এখানে থাকব।

মোহন কত বোঝাল, মুকুন্দ কত বোঝাল। তখন মোহন বলল—মুকুন্দদা—দীপুবাবু থাক, বিকেলে এসে নিয়ে যেয়ো।

দীপ্তি বিকাল পর্যন্ত রইল। দুজনে দূরবীনটা নিয়ে সারাটা দুপুর কাটিয়ে দিল। ভালো করে বাঁধ পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মোহন দূরবীনটা চেয়ে নিয়েছিল দর্পনারায়ণের কাছ থেকে। বিকাল বেলা দীপ্তি দর্পনারায়ণের হাত ধরে কুঠিতে ফিরে গেল।

মোহন একটা বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়ে দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে সারাটা দিন কাটায়। দূরবীনদর্শনের প্রথম বিস্ময় তার আজো কাটে নি। দূরবীন চোখে লাগালে সে দেখতে পায় দূরে বিলের মধ্যে নৌকা চলছে—কখনো পালে, কখনো লগি ঠেলে, কত স্পষ্ট, কত কাছে, মাঝিমাল্লাগুলোকে অবধি দেখা যায়। বিস্ময়ের ধাক্কা প্রবল বেগে অনুভব করবার উদ্দেশ্যে দূরবীন চোখ

থেকে নামিয়ে নেয়, কই কোথাও কিছু নাই। তখনি আবার দূরবীন চোখে লাগায়—দেখে ওই যে তিনখানা নৌকা পাল ফুলিয়ে ছুটেছে। দেখা-না-দেখার বিস্ময়কর সীমান্তে বসে একবার সে দেখে আর একবার না-দেখে। সন্ধ্যাবেলা হাঁসের দল যখন ফেরে—তখন দূরবীনের মন্ত্রে চোখে দেখার অনেক আগে থেকে সে দেখতে পায়, আবার চোখের দৃষ্টিতে মিলিয়ে যাবার অনেক পরে পর্যন্ত সে দেখতে থাকে। তার ভারি মজা লাগে।

সন্ধ্যার পরে আর দূরবীন চলে না। তখন সে বাঁশি বাজায়। তার অপর একটা সঙ্গী একটা কাঠের বাঁশি। একটা ছেঁড়া বালিস মাথায় দিয়ে বাঁশিটা তুলে নিয়ে সে আপন মনে বাজাতে থাকে। বাঁশির করুণ সুর রাত্রির অন্ধকার বনস্পতিকে আশ্রয় করে সোনার রঙের আলোকলতার মতো আকাশে বিতানিত হয়ে যায়, বোধ করি সেই আলোকলতার আবছায়া স্পর্শ তারাগুলোতে জড়িয়ে লাগে—নইলে সেগুলো এমন শিউরে শিউরে উঠবে কেন? মোহন অনুমান করতে চেষ্টা করে—তার বাঁশির সুর কতদূর যায়? তাদের গ্রাম পর্যন্ত যায় কি? একদিন সে মুকুন্দকে শুধিয়েছিল—মুকুন্দদা, রাত্রে আমার বাঁশি শুনতে পাও কি?

মুকুন্দ বলল—আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তোর বাঁশি শুনি!

মোহন আবার শুধাল—রাত্রে কি কিছুই শুনতে পাও না?

মুকুন্দ বলল—শুনি বই কি! শেয়ালের ডাক শুনি, গোরুর হাম্বা শুনি, শুনব না কেন?

মোহন হতাশ হল। তবু তার ভাবনায় ছেদ পড়ে না। সে ভাবে বাঁশির সুর কি ছোট ধুলুড়ি পর্যন্ত পৌছয় না? ছোট ধুলুড়ি তো তার বাড়ির চেয়ে অনেক কাছে? ভাবতে ভাবতে আরও জোরে সে বাঁশি বাজাতে শুরু করে। অনেকক্ষণ পরে যখন সে ক্লান্ত হয়ে থামে—তখন শুনতে পায় মাটির উপর জলের ঢেউয়ের ছলাত ছলাত করতালি; শুনতে পায় প্রহরে প্রহরে শিবাধ্বনির বেড়াজালে মিস্তব্ধতার গর্ভ থেকে রত্নোদ্ধারের শব্দ। আর শোনে খট্টাসের অট্টহাসি, জলচর পক্ষীর বিচিত্র 'ওয়াক ওয়াক' ধ্বনি। কথনো বা

উৎক্রোশ পাখির ক্রমোচ্চ স্বরগ্রামের তারস্বরে তার ঘুম ভেঙে যায়। তখন একবার সে এদিক ওদিক ভালো করে দেখে নেয়—নাঃ, বানের জলের কোন লক্ষণ নেই।

একবার সে ধুলুড়ির দিকে তাকায়—সব ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, কে বলে যে ওখানে মানুষের বাস আছে। বিলের অন্ধকারের চেয়ে ওখানকার অন্ধকারটা একটু জমাট—তাই বুঝতে পারা যায় ওখানে লোকালয় আর গাছপালা থাকা সম্ভব! কিন্তু আলো কি একটাও দেখা যায়! মোহনের দিবারাত্রির বৈচিত্র্য আজকাল অনেক বেড়ে গিয়েছে—সে ভাবে ভারি মজা!

কুসমি সুযোগ পেলেই মোহনের কাছে আসে। আঁচলের তল থেকে দুটো আম বের করে নিতান্ত কর্তব্যবোধের সুরে বলে—মোহনদা, দুটো আম নাও। কিম্বা আঁচল খুলে খানিকটা মুড়কি বার করতে করতে বলে—নাও মোহনদা, মুড়কি খাও। তার ভাবটা এমন যেন আম বা মুড়কি দেওয়া ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তার পরেই বলে—আজ আমাকে এখনি ফিরতে হবে, বসবার উপায় নেই।

মোহন বলে—তোর খুব কাজ, নয় রে?

কুসমি বলে—নয় তো কি? পুরুষদের মতো আমাদের বসে থাকলে চলে না।

মোহন বলে—যেমন আমি এখানে সারা দিন বসে আছি, নয়?

কুসমি বলে—শুধু তুমি কেন? তোমরা সবাই।

মোহন শুধোয়—তোর আজ হল কি রে?

কুসমি বলে—না, অতশত কথার উত্তর দেবার সময় আমার নেই, আমি চললাম!

সে চললাম বলে বটে, কিন্তু চলবার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না, বরঞ্চ ইতস্তত করতে করতে হঠাৎ বসে পড়ে। তখন মোহন দূরবীনটা এগিয়ে দিয়ে বলে—দেখ।

কুসমি দূরবীন চোখে লাগায়, অদ্ভুত-দর্শনের উল্লাসে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এই দূরবীন যন্ত্রটা কুসমির কাছে বড়ই রহস্যময়, ওটা যেন দৃষ্টিজগতের বাঁশি, চোখে লাগালেই, বাঁশির সুরকে নির্ভর করে মন যেমন সুদূরে ভেসে যায়, তেমনি ভেসে যায় দৃষ্টি কোন সুদূরে! প্রথম যেদিন টুঙীতে এসে দূরবীনটা কুসমি দেখল, ভেবেছিল ওটা একটা নূতন বাঁশি। মোহনের বাঁশি বাজাবার শখ সে জানত, তাই জিজ্ঞাসা করেছিল—মোহনদা, নূতন বাঁশিটা কোথায় পেলে?

মোহন বলেছিল—সে কথা পরে বলব—একবার দেখ না কেমন হয়েছে?

কুসমি হাতে তুলে দেখল বেশ ভারি, বলল—মা গো, বাঁশি আবার এত ভারি হয় নাকি?

তারপরে মুখে লাগিয়ে ফুঁ দিল—কিন্তু বাজে কই! বলল—মোহনদা, বাজে না যে।

মোহন বলল—কলের বাঁশি, আর-একবার চেষ্টা করে দেখ।

হাতে করে নাড়াচাড়া করতে করতে যেমনি চোখের কাছে উঠিয়েছে—কুসমি চমকে উঠল, তার হাত কেঁপে দূরবীনটা পড়ে গেল।

মোহন বলল—কি হল রে?

কুসমি বলল—এটা কি মোহনদা, সত্যি করে বল তো?

মোহন শুধোল—কাঁপছিস কেন?

কুসমি বলল—ওটা চোখে লাগাতেই খান দুই বড় বড় নৌকো দেখতে পেলাম—কিন্তু কই, কোথাও তো কিছু দেখছিনে।

তারপরে ব্যাকুলভাবে বলল—সত্যি করে বল মোহনদা—তুমি কি এতে মন্তর পড়ে রেখেছ নাকি?

মোহন ভাবল—কুসমিকে নিয়ে একটু মজা করা যাক, বলল,—তুই ঠিক ধরেছিস রে, আমি এক ফকিরের কাছে থেকে থেকে মন্তর শিখে নিয়েছি। এই চোঙাটা সেই ফকির আমাকে দিয়েছে।

তারপরে বলল—মন্তর পড়ে এটা চোখে লাগালে যা ইচ্ছে তাই দেখতে পাওয়া যায়।

বিস্মিত কুসমি শুধাল,—তুমি কি তাই দেখ না কি ?

—দেখি বই কি ?

—কি দেখ, বল তো !

—তবে শোন।

এই বলে মোহন আরম্ভ করে,—রাত্তির বেলা চোখে লাগিয়ে বলি, ফকিরের চোঙা, একবার দেখাও তো কুসমি কেমন করে ঘুমোচ্ছে ? অমনি দেখতে পাই, ঘরের মধ্যে তক্তপোশের উপরে গা এলিয়ে দিয়ে—

কুসমি বাধা দিয়ে বলে—তুমি তো ভারি অসভ্য ! তোমার কি আর-কিছু দেখবার নেই !

মোহন বলে—আছে বই কি ! দেখবি ?

এই বলে দূরবীনটা তার চোখে ঠেসে ধরে।

অমনি কুসমির চোখে ভেসে ওঠে তিনখানা পালোয়ারি নৌকা, মাঝি-মাল্লা চড়নদার সমেত দ্রুত ছুটে চলেছে। কুসমি অবাক হয়—তথাপি বলে—তোমার মন্তরের গুণ না মাথা—ও তো শুধু চোখেই দেখতে পাওয়া যায়।

—কই দেখ দেখি, বলে মোহন দূরবীন সরিয়ে নেয়। কুসমি দেখে সম্মুখে বিলের অবাধ প্রসার, কোথাও নৌকার চিহ্নমাত্র নেই।

এ সব কুসমির প্রথম দূরবীন দর্শনের অভিজ্ঞতা। ইতিমধ্যে দূরবীনের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক বিষয় সে জেনেছে—কিন্তু রহস্যের ভাবটা সম্পূর্ণ কাটে নি।

মোহনের বাঁধ পাহারা দেওয়াকে ইতিপূর্বে নির্জনবাস বলেছি—কিন্তু কথাটা পুরো সত্য নয়। তাকে দেখতে নবীন আসে, নজির আসে, মুকুন্দ, দর্পনারায়ণ প্রভৃতি আসে। তবু অনেকটা সময় খালি থেকে যায়। সেই খালি সময়টার

ফসল কুসমি। আগে কুসমির সঙ্গে তার দেখা কখনো কদাচিৎ হত, সব দিন হবার উপায় ছিল না। এখন কুসমি দিনে অন্তত একবার আসে, অনেকক্ষণ করে থাকে। ছোটধুলুড়ি থেকে ধুলুড়ি গ্রামের দিকে গেলে মানুষের চোখে পড়বার সম্ভাবনা কুসমির ছিল, ডাকু রায়ের কানে ওঠবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এখানে অনন্ত মাঠের মধ্যে কে কাকে দেখছে? কে কার কথা বলছে? বলতে গেলে কুসমির খিড়কি দরজার পরেই বিল শুরু হয়েছে, সকলের অলক্ষিতে বেরিয়ে পড়ে বাঁধের কাছে চলে আসা তার পক্ষে মোটেই অসুবিধার নয়। অন্তত আজ পর্যন্ত সে কখনো ধরা পড়ে নি।

মোহন বলে—ভালোই হয়েছে রে, এখানে এসে অবধি তোর দেখা পাই।

কুসমি বলে—তোমাকে দেখা দেওয়া ছাড়া আমার যেন আর কাজ নেই—হুঁঃ। বাড়িতে আমার কত কাজ, আমি এক্ষুনি চললাম।

কিন্তু বস্তুত সে চলল না, কখনো চলে না। একদিন মোহন ঠাট্টা করে বলেছিল যে তোর তো যাওয়া নয়, যাওয়ার ভড়ং। এমন মর্মান্তিক সত্যের পরে আর থাকা যায় না। কাজেই তখনি কুসমিকে চলে আসতে হয়েছিল। মোহন নিষেধ করেছিল, মাপ চেয়েছিল, তবু শোনে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুনতেই হল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই কুসমি ফিরে এল। সে ভেবেছিল মোহন ঠাট্টা করবে। কিন্তু মোহনেরও তো অল্প শিক্ষা হয় নি, বলল—আমি ভেবেছিলাম তুই আসবি না।

মোহন যে তার অভিমানের গুরুত্ব দিয়েছে তাতে কুসমি খুশি হল, বলল—আমি তো আসি নি। তোমাকে শশা দিয়ে গিয়েছি, নুন দিই নি, এই নাও নুন।

এই বলে কলাপাতায় মোড়া খানিকটা লবণ রাখল।

লবণ এইমাত্র সে দিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু মোহন সে কথার উল্লেখমাত্র করল না। লবণ দেওয়া ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য কুসমির নিশ্চয় ছিল না নতুবা সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে বসে মোহনের সঙ্গে গল্প করতে যাবে কেন?

*

এই ভাবে দুজনের দিন যায়। মোহন কুসমির আসবার সময়ের অপেক্ষা করে থাকে। তার আসবার সময় হলে ছোটধুলোড়ির দিকে দূরবীনটা বাগিয়ে ধরে—প্রথমে কিছুই দেখা যায় না, মানে যাকে আশা করা যাচ্ছে তা ছাড়া আর সবই দেখা যায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকবার পরে হঠাৎ কাঁচের পটে শাড়িপরা ছোট্ট একটা মূর্তি ভেসে ওঠে। দূরবীনওয়ালার চোখ মূর্তির প্রত্যেকটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করে। দেখতে দেখতে মূর্তিটা কাছে এসে পড়ে—এত কাছে যেন কণ্ঠস্বরের এলাকার মধ্যে। মোহন ডাক দেয়—কুসমি! কিন্তু কোন উত্তর পায় না। তখন চোখ থেকে দূরবীন নামায়—কই! তাই তো, এখনো কতদূর! মোহন মনে মনে হেসে ওঠে, ভাবে আমি যে প্রায় কুসমির মতোই বোকা। আবার দূরবীন চোখে লাগায়।

কুসমি এসে পড়ে জিজ্ঞাসা করে—মোহনদা, দূরবীন দিয়ে কী দেখছিলে?

মোহন গম্ভীর ভাবে বলে—একটা পানকৌড়ি।

—কই দেখি, বলে কুসমি দূরবীন কেড়ে নিয়ে চোখে লাগায়—সত্যিই তো একটা পানকৌড়ি, সে দূরবীনটা মুখে লাগিয়ে আবৃত্তি করে—

'পানকৌড়ি, পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠো সে'।

মোহন বলে—ও কি রে? মুখে লাগিয়েছিস কেন?

কুসমির বিশ্বাস দূরবীনের সাহায্যে চোখের দৃষ্টির মতো মুখের শব্দকেও দূরপ্রেরণ চলে। কিন্তু তখনি নিজের ভ্রান্তি সন্দেহ করে বলে—প্রসঙ্গ বদলে নিয়ে বলে—কাল রাত্রে বৃষ্টির সময়ে কি করলে তুমি?

মোহন বলে—কী আর করব? কাঁথা গায়ে জড়িয়ে আচ্ছা করে ঘুম দিলাম।

কুসমি বলে—ঘুম দেবার জন্যেই তোমাকে এখানে রাখা হয়েছে, না? যদি বান আসত?

মোহন বলে—বান কি আকাশ থেকে পড়বে? আসবে তো মাঠ দিয়ে।

কুসমি বলে—কিন্তু পড়ে ঘুমোলে মাঠই বা দেখবে কি করে ?

মোহন বলে—আর ঘুমোলে চলবে না রে। কদিন থেকে যে রকম বৃষ্টিবাদল হচ্ছে—এবারে বান আসবে বলেই ভয় হচ্ছে।

কুসমি ভীতস্বরে বলে—দেখো, বান এসে পড়লে যেন তুমি জলে নামতে যেয়ো না।

মোহন হেসে বলে—তুই পাগলী কি না! জলে নামব কেন? আমি তো বাঁধের উপরে আছি।

তারপরে একটু থেমে বলে—এমন তেমন দেখলে কাঠের পাঁজায় আগুন দেব।

তবু কুসমির ভয় যায় না, সে বলে—দেখো, আগুনে আবার হাত পুড়িয়ে ফেল না।

তারপর গম্ভীর ভাবে বলে—তোমাদের তো আগুন নিয়ে নাড়াচাড়া করা অভ্যাস নেই।

পুরুষের চেয়ে ওই একটা জায়গায় যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব তা অনুভব করে কুসমি অত্যন্ত গৌরব বোধ করে।

ক্রমে কুসমির বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় উপস্থিত হয়। মোহন বলে—কুসমি এবারে এস, অন্ধকার হয়ে এল।

কুসমি উঠি-উঠি করে বিলম্ব করে, অবশেষে রাত্রির অন্ধকার ও নানাবিধ আশঙ্কার সম্বন্ধে তাকে বারংবার সতর্ক করে দিয়ে সে উঠে পড়ে। মোহন চোখে দূরবীনটা লাগায়, ভাবে কুসমি ওই তো কাছে। মাঝে মাঝে কুসমি ফিরে তাকায়, ক্রমে অপস্রিয়মান মূর্তিটা ছোট হয়ে আসে। তারপরে একসময়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়। মোহন ভাবে অন্ধকার ভেদ করতে পারে এমন দূরবীন কি নেই ?

মোহনের একখানা ছোট ছিপ নৌকা আছে। দর্পনারায়ণ নৌকাখানা তাকে দিয়েছে। বাঁধের একদিক শুকনো—আর একদিকে বিল। একেবারে ঠিক গায়েই যে জল তা নয়, জল এখনো ততদূর আসে নি। বিলের জলে

ছিপখানা খুঁটিতে বাঁধা থাকে। একদিন কুসমি এসে বলল—মোহনদা, চল দুজনে ছিপে চড়ে বেড়িয়ে আসি।

মোহন রাজি হল, বলল—চল।

দুজনে নৌকায় চড়ে দড়ি খুলে দিল।

তখন বিকাল বেলা, কিন্তু কদিন থেকে মেঘ করে আছে বলে সন্ধ্যার মতো দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে দুচার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে, আকাশের গতিক বড় ভালো নয়। কুসমি দূরবীন চোখে দিয়ে অবাক হয়ে দেখছে, মোহন লগি দিয়ে নৌকা ঠেলে নিয়ে চলেছে। মোহনের ধারণা ছিল রাবণদীঘির মাঠে এখনো জল ওঠে নি কিংবা উঠলেও সামান্য জল। কিন্তু সেখানে পৌঁছে অবাক হয়ে গেল। সে দেখল যে লগিতে থই মিলছে না, কাজেই লগি রেখে দিয়ে বৈঠা হাতে নিল। এবারে সে জলের দিকে ভালো করে তাকাল—জলের রঙ কালো, প্রায় ওই কুসমির চুলের মতোই। সে চমকে উঠল। এ কি! এ যে যমুনার জল। বিলের জলের রঙ মেটে-মেটে। যমুনার বানের জল ঢুকে পড়লে তার ঠেলায় মেটে জল অন্তর্ধান করে, কালো জল আসর দখল করে বসে। ওদিকের লোকে জানে যে যমুনার কালো জল ঢুকবার অর্থ হচ্ছে যে বান শুরু হয়ে গিয়েছে—সে বানের তোড় কি রকম হবে তা সকলের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। বান যদি ধীরে ধীরে আসে তবেই রক্ষা—হঠাৎ এসে পড়লে সর্বনাশ। মোহন ভাবল, কদিন থেকে যে রকম বৃষ্টিবাদল চলছে তাতে করে মনে হয় যে যমুনাতেই বন্যা এসেছে আর সেই জলের কতক যদি বিলের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তবে তার বাঁধের কি গতিক হবে! তার মনে হল জল যেন ক্রমেই বাড়ছে। পুবের বাতাসেও জোর দিতে লেগেছে।

সে বলল—কুসমি, চল আজ ফিরে যাই।

কুসমি শুধাল—এত তাড়া কিসের?

আসল কথা কুসমিকে বলা চলে না, সে ভয় পাবে, তাই মোহন বলল—না রে আর এগোনো হবে না। পুবে বাতাস গায়ে বেশি লাগলে তোর অসুখ হবে।

কুসমি 'কিচ্ছু' শব্দটার উপরে অনাবশ্যক ঝোঁকের আতিশয্য দিয়ে বলল—আমার কিচ্ছু হবে না।

মোহন বলল—আমার তো হতে পারে।

কুসমি বলল—তবে এতক্ষণ থাকলে কেন? আমি সেই কখন থেকে বলছি ফিরে চল, ফিরে চল।

ছিপ ফিরল। রাবণদীঘির প্রান্তে যেখানে এসে মোহন লগি রেখে দিয়েছিল এবারে সেখানে লগিতে আর থৈ মিলল না। জল দ্রুত বাড়ছে, আর একখানা মাঠ পেরোলেই বাঁধের গায়ে গিয়ে লাগবে। জলের রঙ ক্রমেই ঘন কালো হচ্ছে—যমুনার কালো জলের প্রচুরতর মাত্রায় আবির্ভাবের লক্ষণ।

নৌকাখানা বেঁধে দুজনে নামল।

মোহন বলল—কুসমি তুই বাড়ি যা।

কুসমি মোহনের অনুরোধে অবাক হল, ভাবল অন্যদিন যে থাকতে বলে আজ সে যেতে বলছে কেন? সে এবারে ভালো করে মোহনের মুখের দিকে তাকাল, জিজ্ঞাসা করল—মোহনদা, তুমি কী ভাবছ?

মোহন হেসে বলল—কিছু ভাবছিনে রে?

সে আরও ঝোঁক দিয়ে বলল—না, বল।

মোহন আশঙ্কার কথা তাকে বলতে পারে না, তাতে বন্যার আশঙ্কা কমবে না, অশ্রুবন্যার আশঙ্কা বাড়বে মাত্র।

সে হেসে বলল—ভাবব আর কি? ভাবছি মেয়েদের বয়স যতই হোক ছেলেমানুষি দূর হয় না।

কুসমি অবজ্ঞাপূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল—কি ছেলেমানুষিটা দেখলে?

মোহন বলল—বেশ, তাহলে এবার বাড়ি যা, তবে বুঝব তোর সত্যি বয়স হয়েছে।

এতবড় অপবাদের পরে আর তার থাকা চলে না, সে রওনা হল, কিন্তু মুখটা বড় অন্ধকার—প্রায় ওই পুব দিকের আকাশটার মতোই।

মোহন ডাকল—কুসমি শোন।

—কি, বল না?

মোহন দূরবীনটা এগিয়ে দিয়ে বলল—এটা নিয়ে যা। কাল আবার নিয়ে আসিস।

কুসমির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বিদ্যুৎ-খেলে-যাওয়া পুব আকাশের মতোই।

কুসমি দূরবীনটা হাতে নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, মোহন বাধা দিয়ে বলল—আর কথা নয়, পালা—ওই দেখ বৃষ্টি এল।

লক্ষ কথায় যা প্রকাশ হয় না এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কুসমি দূরবীনটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে বাড়ির মুখে ছুটল।

মোহন বাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল শাড়ি-পরা ছোট্ট মূর্তিটা ক্রমে অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

তখন পুব আকাশটা বদমেজাজি দৈত্যের চোয়ালের মতো ভারি হয়ে এসেছে, বাতাসের গর্জন মনে করিয়ে দিচ্ছে যে আজকার পালাটা শম্ভু-নিশম্ভু বধের পালা হবারই আশঙ্কা, মেঘে মেঘে বিদ্যুতের চকমকি ঠোকার আর অন্ত নেই, পশ্চিমে সূর্যাস্তের জায়গায় বিবর্ণ লালের শেষচিহ্ন তখনো ক্রোধের মতো দগদগে। আর চারদিক এমন অদ্ভুত নিস্তব্ধ যে বিলের বোবা জলেও কল্লোল জেগেছে। বোবা যখন গান গায় তখন যুগসন্ধির ক্ষণ।

মোহন ভেবেছিল যে আজকের রাতটা সে জেগেই কাটাবে। কিন্তু মনে মনে জাগবার অতিরিক্ত সঙ্কল্প করতে গিয়েই সে অন্যদিনের চেয়েও আগে ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝরাতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে তার মনে হল ঢেউয়ের দোলায় নৌকার মতো বাতাসের তোড়ে তার টুঙীখানা কাঁপছে। মোহন দেখল জলস্থল অন্তরীক্ষ ঘোর অন্ধকার, তার মনে হল সমস্ত চরাচর যেন অতিকায় একটা অজগরের উদরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

আর একি বাতাস! আশ্বিনের ঝড় সে দেখেছে, তার এলোমেলো বাতাসের লেজ ঝাপটানির কথা সে ভোলে নি। আবার কালবৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গেও সে পরিচিত, কালবৈশাখীর দমকায় ঝাপটা পৃথিবীকে ত্রাহি ত্রাহি ডাকিয়ে দেয়। কিন্তু আজকার ঝড় ও দুটো থেকেই স্বতন্ত্র। এ গর্জনও নয়, প্রলাপও নয়, এ যেন আকাশের বিলাপ। একটানা বাতাসের স্রোত পুব দিক থেকে চলে আসছে, তাতে ছেদ নাই, বিরাম নাই, তার স্বরগ্রামের উচ্চনীচ নাই—কেবল হুহু হুহু, অনন্ত বিষাদ আর অনন্ত ক্ষোভ মিলিয়ে কার যেন এই দীর্ঘশ্বাস! ভয় ধরিয়ে দেয়। আশ্বিনের ঝড়ে বা কালবৈশাখীতে এমন ভয় তার করে নি। অপার সমুদ্রে বা অসীম মহাকাশের নিঃসঙ্গতায় হয়তো এমনি একটা নৈরাশ্যজনক ভীতির ভাব আছে।

আজকার আকাশে কালবৈশাখীর বিদ্যুতের সে ডালপালা মেলা কোথায়? এক-একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বটে, কিন্তু যেন নিতান্ত অনিচ্ছাতেই। বাতাসের বিলাপ দ্বারা আর দুটো বস্তু সম্বন্ধে সে সচেতন হল—অবিশ্রাম বাতাসের টানে টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরছে, আর জলে উঠছে ছপাত ছপাত ছলাত ছলাত শব্দ!

এত কাছে জলের শব্দ! জল কি তবে বাঁধ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। মোহন ভাবল একবার প্রখর বিদ্যুৎ দিলে ভালো করে দেখে নেবে তার বাঁধের অবস্থাটা কি? কিন্তু বিদ্যুতের সে তেজ কোথায়? অথচ সে স্পষ্ট অনুভব করল যে জলের ছোবল মারবার শব্দ আর হিস-হিসানির মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে! তার কান সন্দেহ পোষণ করলে শুনতে পেত সেই সঙ্গে আরো একটা শব্দ! জলের ছপাত্ত ছপাত শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোদালের ঝপাস ঝপাস শব্দ! মোহনের মনে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল না, তাই সে কেবল জলের শব্দই শুনল।

মোহন ভাবল জল বাঁধ পর্যন্ত আসুক আর নাই আসুক একবার গাঁয়ের লোকদের ইসারা জানানো ভালো, বাঁধ রক্ষার দায়িত্ব সে একা নিতে যাবে কেন। সে টুঙি থেকে নেমে কাঠের স্তূপের দিকে চলল। সেখানে গিয়ে

দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে চকমকি ঠুকে সোলা জ্বালাল। কিন্তু কাঠের স্তূপ ভিজে গিয়েছিল—আগুন আর ধরতে চায় না। অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় অনেক ধোঁয়া ছাড়বার পরে—কাঠ জ্বলে উঠল। এতক্ষণ মোহন গুঁড়ি মেরে বসে ছিল—এবারে উঠে দাঁড়াল—ঠিক সেই মুহূর্তে আগুনের আলোতে বিদ্যুৎ চমকের মতো খানিকটা চাপদাড়ির কালো, দুটো হিংস্র নেত্রের দীপ্তি, আর একখানা পাকা লাঠির উর্ধ্বোন্মাদ তার চোখে পড়ল, পর মুহূর্তেই বজ্রবৎ আঘাতে হতজ্ঞান হয়ে সে ধরাশায়ী হল।

অগ্নিশিখার ইসারা পেয়ে নবীন, নজির, মুকুন্দ প্রভৃতি ছুটে এল। তাদের অনুসরণ করে দর্পনারায়ণ ছুটে এল। তারা বাঁধের উপরে উঠে দেখল—বাঁধের খানিকটা অংশ জলে ধ্বসে পড়ে গিয়েছে—বিলের জল বাঁধের শুকনো দিকে ঢুকে পড়েছে। জলের তোড়ে বাঁধ ক্রমেই ক্ষয়ে যাচ্ছে—সকলে বুঝল যে রাত শেষ হবার আগেই এতদিনের এত জনের কষ্টে গড়া বাঁধের চিহ্নমাত্র থাকবে না, সকলে আরও বুঝল যে এ বছর বাঁধ তৈরি করবার আর কোন উপায় নেই।

মুকুন্দ বলল—জলের তোড়ে কেমন পরিষ্কার কেটে গিয়েছে—যেন মানুষে কোদাল ধরেছিল।

দর্পনারায়ণ আপন মনে স্বগত ভাবে বলল—মানুষে যে কোদাল ধরে নি তারই বা স্থির কি? নইলে এই জলে তো বাঁধ ধ্বসবার নয়।

এতক্ষণ সবাই বাঁধ নিয়ে ব্যস্ত ছিল—কে একজন প্রথমে বলল—মোহন কোথায়? তাকে দেখছিনে কেন?

তখন সবাই মোহনের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করে দিল—কিন্তু মোহন কোথায়?

দর্পনারায়ণ বলল—কাঠের চেলা জ্বালিয়ে নিয়ে চার দিকে খুঁজে দেখো—ছেলেটা কি শেষে স্রোতের মুখে পড়ল?

কাটের চেলা জ্বালাবার উদ্দেশ্যে মুকুন্দ অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে চমকে চেঁচিয়ে উঠল—দাদাবাবু, এই যে মোহন!

অপদেবতার সিদ্ধান্ত মুকুন্দকৃত। সে অনেক তথ্য-প্রমাণ প্রয়োগে বুঝিয়ে দিল যে অপদেবতা ছাড়া এ কাজ আর কারো নয়, বিলের ধারে কত লোক প্রাণে মারা পড়েছে, মোহনের ভাগ্য ভালো যে অল্পের উপর দিয়েই গেল।

বুড়োর দল অপদেবতার আর ছোকরার দল নেশার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করল। ডাকু রায়ের কথা, দর্পনারায়ণ ছাড়া আর কারো মনেই পড়ল না।

মোহনের পিতা মাধব পাল লোকটি শান্ত প্রকৃতির ও ধার্মিক। মোহনের বিপদের আশঙ্কা কেটে গেলে সে একদিন দর্পনারায়ণকে বলল—বাবু, আপনার কপালেই ছেলেটা এবারে বেঁচে উঠল, আমি তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

দর্পনারায়ণ বলল—মাধব, মানুষ সেরে ওঠে নিজের-বরাত জোরে, সত্যি কথা এই যে আমার হঠকারিতায় সে মরতে বসেছিল। মোহনকে একলা বাঁধ পাহারা দিতে পাঠানো আমার উচিত হয় নি।

মাধব বলে উঠল—সে কি কথা বাবু! পুরুষ মানুষের কি ঘর আঁকড়ে পড়ে থাকলে চলে!

দর্পনারায়ণ বলে—তা চলে না বটে, তাই বলে একাকী অনেক লোকের সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া কিছু নয়।

মাধব বিস্মিত হয়ে শুধায়,—বাঁধের উপরে আবার অনেক লোক এল কোথা থেকে?

দর্পনারায়ণ তাকে উলটে শুধায়—ওর আঘাত লাগল কি ভাবে, তা কি ভেবেছ?

বাস্তবিক মাধব কিছুই ভাবে নি, আঘাতের কারণ সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ তার ছিল না, প্রতিকারের উপায় নিয়েই সে ব্যস্ত ছিল। সে শুধাল, আপনি কিছু শুনেছেন?

দর্পনারায়ণ বলল—শুনব আর কোথা থেকে? তবে এ কাজ যে ডাকু রায়ের দলের তাতে সন্দেহ মাত্র নেই!

মাধব চমকে উঠল,—বাবু এও কি সম্ভব?

দর্পনারায়ণ বলল—মাধব, সবাই তোমার মতো শান্ত প্রকৃতির হলে সংসার অচল হয়ে উঠত। সে যাক্, কথাটা এখন আর কাউকে বোলো না! ঐ নিয়ে মিছামিছি ঘোঁট পাকিয়ে লাভ নেই, প্রতিকারের ব্যবস্থা আগে করি।

ডাকু রায়ের মনটা খুশি দেখে, একদিন তার মা বলল—খোকা, তোর জন্যে নারকোলের নাড়ু করছি, দেখ দেখি কেমন হচ্ছে!

ক্ষান্তবুড়ি উনুনের কাছে বসে সত্যিই নাড়ু করছিল বটে, কিন্তু তা যে বিশেষ ভাবে ডাকুর জন্যেই এমন বলা চলে না। ডাকু বাইরে যাবার উদ্যোগ করছিল, মার আহ্বানে কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বুড়ি তার দিকে একখানা ছোট পিঁড়ি এগিয়ে দিল।

ডাকু পিঁড়ির বহর দেখে বলল—মা, পিঁড়িখানাকে কি চেলা কাঠ বানাতে চাও?

মা বলল—কেন বাবা, ওখানা তো তোরই পিঁড়ি ছিল!

ডাকু বলল—কিন্তু আমি কি আর সেই খোকা আছি?

মা সস্নেহে হেসে বলল—খোকা চিরকালই খোকা, নাতিপুতি হলেও মায়ের কাছে সে খোকাই থাকে।

—কিন্তু পিঁড়িখানার কাছে তা থাকে না।—এই বলে সে পিঁড়িখানা ঠেলে দিয়ে মাটিতে বসল। পাথরের বাটিতে করে কয়েকটা নাড়ু মা তার দিকে এগিয়ে দিল।

নাড়ু মুখে দিয়ে ডাকু বলল—চমৎকার হয়েছে মা। কিন্তু, না না, আর দিও না, বরঞ্চ তোমার সাধের নাতনির জন্যে রেখে দাও!

তারপরে একটু থেমে বলল—কুসমিকে দেখতে পাই না, থাকে কোথায়?

ক্ষান্তবুড়ি বলল—কি জানি, আজ কদিন ধরে মন-মরা হয়ে আছে।

—মন-মরা হতে যাবে কেন?—ডাকু বিস্মিত হয়। তার বিশ্বাস মন পদার্থটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, শুধু তা-ই নয়, ঐ পদার্থটা না থাকলে সংসার

অনেক সুসহ এবং সুখকর হত! হঠাৎ সেই জটিল বস্তুটা তার মেয়ের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে জানতে পেরে সে যেন চমকে উঠল!

মা কিন্তু এত বুঝল না। মেয়েমানুষ পুরুষের চেয়ে অল্প বয়স থেকে সংসারে ঠোকর খেতে শুরু করে, আর সেই কারণেই মন নামক পদার্থটা সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি করে সচেতন হয়ে ওঠে! মা বলল—হবে না কেন বাছা! বয়স হল।

—বয়স হল তো কি হল? বেঁচে থাকলে আর কিছু না হোক বয়স তো হবেই।

ক্ষান্তবুড়ি 'আর কিছু না হোক'—অংশটার সূত্র ধরে বলল,—কেন বাছা আর কিছু না হবে? ওকি যে-সে ঘরের মেয়ে?

মা জানে যে বংশের উল্লেখ করে তার পুত্রকে উত্তেজিত করা খুব সহজ। তাই সে বলল—এত বড় ঘরের মেয়ের এতদিন বিয়ে হয় না, লোকে যে বলাবলি করবে!

ডাকু বলল—করুক না বলাবলি, দেখি কার কত সাহস।

মা বলল—সে কথা ঠিক। তোকে সবাই ভয় পায়, কিন্তু কানাকানি ঠেকায় কে?

—কান কেটে নেব না!

—কানাকানি যদি জানা যাবে তবে আর কানাকানি বলেছে কেন?

এবার পুত্রকে হার মানতে হল। ও পথে আর অগ্রসর হবার উপায় নেই। তাই প্রসঙ্গ পালটে নিয়ে বলল—কিন্তু বর কোথায়?

—কেন, আমাদের ঐ মোহন তো রয়েছে।

—কে? ঐ নাপিতের বেটা?

—ছিঃ বাবা, অমন করে বলতে নেই? তোদের বংশেও তো ধোপার অপবাদ আছে।

ডাকু বলল—আচ্ছা নাই বললাম। কিন্তু তোমার নাতজামাই এখন প্রাণে বাঁচলে হয়?

ক্ষান্তবুড়ি চমকে উঠল,—শুধাল,—সে কি কথা?

—ওঃ জান না বুঝি! কদিন আগে বাঁধ পাহারা দিতে দিতে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগে অচৈতন্য হয়ে আছে।

ক্ষান্তবুড়ি বলল—আমরা তো কিছুই জানতে পাই নি। কিন্তু বাঁধ পাহারা দিতে মাথায় চোট লাগবে কেন?

ডাকু তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল—দেখ নি জলের তোড়ে বাঁধটা ভেঙে গিয়েছে, তখন হয়তো পড়ে গিয়েছিল, কিংবা হয়তো নেশাভাঙ খেয়ে মাথায় চোট লেগেছে? মোটকথা তার অবস্থা ভালো নয়, আগে সেরে উঠুক, তার পরে তাকে নাতজামাই করবার কথা ভেব। আজ উঠলাম মা, অনেক কাজ আছে।

এই বলে সে চটিজুতোর করতালি ধ্বনিত করে বাইরে প্রস্থান করল। মাতা ও পুত্রের এই কথোপকথন কুসমি শুনে ফেলেছিল। শুনবার তার ইচ্ছা ছিল না, সে পাকঘরের পিছন দিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় 'মোহন' নামটি শুনে থমকে দাঁড়াল, তারপরে সব কথা তার কানে গেল। এতক্ষণে আজ কয়েকদিনের রহস্য তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল! সেদিন সকালে উঠে দূরবীন দিয়ে দেখছিল বাঁধের চিহ্নমাত্রও নাই, তারপরে মোহন সম্বন্ধে কোন কথাই জানতে পারে নি। মোহন তাদের বাড়িতে আসে না, তারও মোহনের বাড়ি যাওয়া নিষিদ্ধ, এমন কি কুঠিবাড়ির পথও বর্ষার জল এসে পড়ায় দুর্গম। বাড়ির কাউকে যে মোহন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে, তার উপায় নেই, কথাটা অমনি বাপের কানে যাবে, আর তাহলেই—সর্বনাশ! সে কথা ভাবতেও তার বালিকা হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। নিরুপায় হয়ে তাই সে নিজের সন্দেহ ও অস্বস্তি নিজ মনেই পোষণ করে বেড়াচ্ছিল। এতক্ষণে সব পরিষ্কার হল। কিন্তু এ একরকম পরিষ্কার। খাণ্ডব বন পুড়ে যাবার পরে বোধ করি এই রকম পরিষ্কার হয়েছিল! একটুখানি দীর্ঘনিশ্বাস পড়তেই অনেকখানি ভস্ম উড়ে আকাশ অন্ধকার করে দেয়!

কুসমি গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এতদিন সন্দেহ, অস্বস্তি, আশঙ্কার

মেঘ তার হৃদয়ে জমে ছিল এবার তা অশ্রুধারায় ঝরল। অনেকখানি চোখের জল ঝরবার পরে তার বালিকা হৃদয় খানিকটা লঘু হল! তার মনে হল মেঘ কেটে গিয়ে দিগন্ত অনাবিল হয়েছে, এখন একটুখানি ঘাড় উঁচু করে তাকালেই বুঝি অভীষ্ট লক্ষ্য দেখতে পাওয়া যাবে! কত কি অসম্ভব উপায় এবং অবাস্তব আশা তার মনে ছায়াতপ সঞ্চার করতে লাগল। তার অনেক দিনের দুশ্চিন্তা আজ দুঃখে পরিণত, তবু তাতেই সে একপ্রকার সান্ত্বনা পেল। দুশ্চিন্তা বিমাতা, দুঃখ আপন মা; বিমাতার আদরের তুলনায় মাতার তাড়না অনেক বেশি মধুর। কুসমি আজ বিমাতার কোল থেকে মায়ের কোলে এসে পড়েছে, মাতৃ-ক্রোড়ে আন্দোলিত হতে হতে সে ঘুমিয়ে পড়ল—কখন অজ্ঞাতসারে। সন্ধ্যার দিকে যখন তার ঘুম ভাঙল দেখল ক্ষান্তবুড়ি ডাকা-ডাকি করছে।

ক্ষান্তবুড়ি বলল—ও কুসমি, তোর মুখটা গম্ভীর দেখছি কেন?

কুসমি বলল,—ঠাকুরমা, শরীরটা ভালো নেই, মাথাটা যেন ঘুরছে।

ক্ষান্তবুড়ি বলল—ঘুরবে না! অবেলায় পড়ে ঘুমাও।

প্রসঙ্গ ওখানেই থেমে গেল। কিন্তু প্রসঙ্গের অবসানেই তো চিন্তার অবসান হয় না। মোহনের চিন্তা ক্রমাগত তার মনের মধ্যে পাক দিয়ে উঠতে লাগল। কাউকে যে জিজ্ঞাসা করবে তার উপায় নেই, আর জিজ্ঞাসা করবেই বা কাকে? তাদের বাড়ির কেউ মোহনের খবর রাখে না, খবর প্রয়োজন বোধ করে না। বিশেষ, মোহনের সঙ্গে তার বিবাহের প্রসঙ্গ দু-একবার উঠেছে। এরকম স্থলে জিজ্ঞাসা করবাব লোক পেলেও কুসমি শুধাতে পারত না, লজ্জা এবং সংস্কার অন্তরায়। কিন্তু একবার মোহনকে না দেখলে স্বস্তি নেই, কোন উপায় আছে কিনা সে ভাবতে লাগল। বাস্তব প্রতিকূল হলে যত সব অসম্ভব উপায়কে সম্ভব বলে মনে হতে থাকে, বাজিকর যেমন

দড়ি বেয়ে আকাশে উঠে যায়, অসহায় মনও তেমনি অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

কুসমি কোন রকমে আহার সেরে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল কিন্তু ঘুম এল না, ঘুমোবার জন্যে আজ সে শোয় নি, নিরিবিলি চিন্তা করবার জন্যেই শয্যা গ্রহণ করেছে।

বয়স্ক মানুষের একটি সংস্কার এই যে শিশুর মনকে সে দুর্বল মনে করে। এত বড় ভুল আর নেই! শিশুর মন অনভিজ্ঞ কিন্তু দুর্বল নয়। শিশুর চোখের মতোই তার মন নবীনতায় উজ্জ্বল। মানুষের বয়স যতই বাড়তে থাকে তার মনের অভিজ্ঞতা বাড়ে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তার আদিম স্বচ্ছলতা ম্লান হয়ে আসে। বয়ঃপ্রাপ্ত সাহিত্যিক শিশু-মনের রহস্য জানবে কেমন করে? খানিকটা অনুমান করতে পারে, তার বেশি নয়। শিশু নিজে যদি সাহিত্যিক হত, তবেই শিশুমনের সম্যক রহস্য জানা যেত।

কুসমি কিশোরী। তার মন জেগেছে, দেহ জাগে নি, এই রকম তার অবস্থা। এটাকেই কবিরা বলেন বয়ঃসন্ধিস্থল। কিন্তু সন্ধি তো বয়সের নয়, দেহ ও মনের, জাগ্রত মনের সঙ্গে অজাগ্রত দেহের। দেহ-মনের এই সীমান্ত যেমন রহস্যময় তেমনি নানারূপ অরাজকতার সম্ভাবনায় পূর্ণ। শিশুমনের চেয়ে কিশোরমনের গভীরতা অল্প হতে পারে কিন্তু জটিলতায় অল্প নয়, গভীরতার হ্রাস জটিলতা দিয়ে পুরিয়ে নেয় কিশোরের মন। আমাদের রাধা থেকে বিদেশিনী জুলিয়েট সবাই কিশোরী, একি শুধুই সাহিত্যিক কাক-তালীয় যোগাযোগ!

বিনিদ্র কুসমি শেষ রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে স্বপ্ন দেখলে যেন সে একটা সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গের এক মুখে দাঁড়িয়ে আছে, আর অপর দিকে, অনেক দূরে, শয্যায় কে যেন শুয়ে আছে। ভালো করে ঠাহর করে দেখল মোহন। চট করে মোহন বলে বুঝবার উপায় নেই, কারণ তার মাথায় মস্ত একটা পটি বাঁধা!

অমনি তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে বুঝল স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু

নয়। কিন্তু সে ভাবতে লাগল সুড়ঙ্গটা কি? তখন সে চমকে উঠল। ভাবল আহা, এতক্ষণ মনে হয় নি কেন? এ তো সেই দূরবীনের সুড়ঙ্গ? সে ভাবল দূরবীন দিয়ে দূরের জিনিস দেখা যায়, তবে মোহনকেই বা দেখা যাবে না কেন?

মোহনের দেওয়া দূরবীনটা সে একটা চালের হাঁড়ির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, বার করবার উপায় ছিল না, কেন না, তাহলে নানারকম প্রশ্নের জবাবের মুখে আসল কথা প্রকাশ হয়ে যাবে। কিন্তু এবারে সে ভাবল, আজ দূরবীনটা বার করবে, এবং তার দৃষ্টি দিয়ে মোহনকে দেখে নেবে। কুসমি ঘর থেকে বাইরে এসে দেখল ভোরের আলো হয়েছে—অথচ লোকজন কেউ ওঠে নি। সে ভাবল—এই সময়। সে সন্তর্পণে দূরবীনটা বার করে নিয়ে বাড়ির বাইরে ধুলোউড়ি গ্রামের দিকে মুখ করে দাঁড়াল, তারপরে আঁচল দিয়ে দূরবীনের কাঁচ বেশ মুছে নিয়ে চোখে লাগাল—ভাবল স্বপ্নের দেখার সমর্থন বাস্তবে পাবে। কিন্তু এ কি! ওপারের কুঠিবাড়ি, গাছপালা, সব কেমন স্পষ্ট, সব কত কাছে! কিন্তু মোহন কোথায়? সে অনেকবার, অনেকভাবে দূরবীনটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোখে লাগাল, গাছপালা, নৌকা, কুঠিবাড়ি কত কি দেখতে পেল—কিন্তু যাকে দেখবার জন্যে তার এত আকিঞ্চন তার কোন উদ্দেশ পেল না! তখন সে হতাশ হয়ে দূরবীনটা আঁচলের তলে লুকিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না, লোকজন উঠতে আরম্ভ করেছে! দূরবীনের দৃষ্টির উপরে তার যে অগাধ শ্রদ্ধা ছিল—তা অনেকখানি কমে গেল। অশিক্ষিত বালিকা কি করে জানবে যে দূরবীনের শক্তির সীমা আছে—ঘরবাড়ি গাছপালাকে কাছে এনে দিতে পারে, কিন্তু তাদের বাধা ভেদ করবার শক্তি তার নেই। কুসমি কেমন করে জানবে যে আসল দূরবীন মনের মধ্যে—তার দৃষ্টির কাছে স্বর্গমর্ত্য রসাতলের কোন বাধাই বাধা নয়!

কুসমি স্থির করল আজ রাত্রে যেমন করে হোক মোহনকে গিয়ে একবার দেখে আসতে হবে, কোন বাধাকেই সে মানবে না। এই সঙ্কল্পের ফলে তার

মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। কান্তবুড়ি যখন সকালে তাকে জিজ্ঞেস করল —ও মুখপুড়ি, তোর শরীরটা কেমন আছে ?

কুসমি বলল, বেশ ভালো আছি, ঠাকুরমা।

স্নেহমুগ্ধ ঠাকুরমা বলল—কাল রাত্রে খুব ঘুমিয়েছিলি বুঝি ?

কুসমি শুধু বলল—খু-ব।

ঠাকুরমা মনে মনে বলল—ঘুমের চেয়ে বড় ওষুধ আর নেই !

কোথায় ব্যাধি আর কোথায় ঔষধ ! এমনি করেই সংসারের চিকিৎসা চলে থাকে।

মোহনের মা নেই। তার শুশ্রূষার ভার মাধব পালের উপরে। দিনের বেলায় গাঁয়ের অনেকে এসে দেখাশোনা করে, দর্পনারায়ণের আনুকূল্যে লোকের বা অর্থের অভাব হয় না। দুই দিন সে টাকা দিয়ে হাঁড়িয়ালের কুঠি থেকে সাহেব ডাক্তার এনে মোহনকে দেখিয়েছে। সাহেব ডাক্তার শেষের দিন এসে বলে গিয়েছে, আর ভয় নেই, রোগী এবার সেরে উঠবে, কেবল তাকে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া চাই।

একখানা ঘরে মোহন থাকে, পাশের ঘরে মাধব পাল রাত্রে ঘুমোয়, এই ঘরের মাঝখানে একটা দরজা।

রাত্রে মোহন যেন স্বপ্ন দেখছে হঠাৎ কালো কালো কুঞ্চিত মেঘে আকাশ ভরে গেল, অথচ সেই আকাশভরা মেঘের ফাঁক দিয়ে দুটো তারা জ্বল জ্বল করছে ! তার মনে হল এমনি মেঘ আর এমনি জোড়া তারা কোথায় যেন সে দেখেছে ! কোথায় তার মনে পড়ল না, আকাশে না পৃথিবীতে, না কোন মানবীর মুখে কিছুতেই সে মনে করতে পারল না। ঐ কালো মেঘের মধ্যে একটুখানি বিদ্যুৎ চিকমিকিয়ে উঠল ! তার মনে হল ঐ বিদ্যুতের সঙ্গে কার চপলহাসির যেন মিল ! কিন্তু কার হাসি ? দুর্বল মস্তিষ্ক স্মৃতির সূত্র

ধরে অধিকদূর যেতে পারে না, মাঝ পথে সুতো ছিঁড়ে যায়। আবার তখনি সে অনুভব করল ঐ মেঘাবৃত আকাশ থেকে জুঁই ফুলের মতো লঘু, মুক্তার মতো সুখস্পর্শ ফোঁটা কয়েক বৃষ্টিবিন্দু তার গালের উপরে পড়ল! এ যেন আর অলীক মনে হওয়া নয়, এ যে বাস্তব স্পর্শ! মোহন ভাবছে এ কি স্বপ্ন, না সত্য! সত্য? কিন্তু মেঘ থেকে কবে পুষ্পবৃষ্টি হয়? কারণ সে স্পষ্ট অনুভব করল একরাশ দোপাটি, রঙ্গন, স্থলপদ্ম তার গালে, কপালে, ঠোঁটে ঝরে পড়ল! সব লাল! সদ্য, সিক্ত, স্নিগ্ধ—এবং মধুর! সে ভাবল, এ কি স্বপ্ন! এ কেমন স্বপ্ন! এমন স্বপ্ন প্রতিদিন কেন মানুষে দেখে না। সে আগে কখনো দেখে নি! একবার শুধু ক্ষীণভাবে মনে হল, এইসব ফুলের স্পর্শ কোথায় যেন সে পেয়েছিল! কোথায়? সে কি আর-একদিনের স্বপ্নে! এ কেমনধারা আজ হল? বাস্তবের আঁচল ধরে চলতে গিয়ে স্বপ্নের অরণ্যে পথ হারিয়ে যায়, আবার স্বপ্নের সূত্র কোন বাস্তবের রাজ্যে নিয়ে ফেলে! না; সে আর ভাবতে পারে না! আর এ যদি স্বপ্ন হয়, তবে—কিন্তু কই, মেঘ, বিদ্যুৎ, তারা, বৃষ্টিবিন্দু কোথায় সব মিলিয়ে গিয়েছে! স্বপ্নে ছাড়া আর কোথায় এমন সম্ভব! এসব বাস্তব হলে বলতে হয়, সে ঘুমিয়ে পড়ল, আর স্বপ্ন হলে বলতে হয়, সে সুখস্বপ্নে মিলিয়ে গেল।

সকাল বেলা যখন তার ঘুম ভাঙল রাত্রির অভিজ্ঞতা তার মন থেকে মুছে গিয়েছিল। এমন সময়ে মাধব পাল ঘরে ঢুকে মোহনের শিয়রের কাছে থেকে একটা বস্তু তুলে বিস্মিত হয়ে বলে উঠল—এটা কোথা থেকে এল?

তারপরে নিজেই উত্তর দিল—বোধকরি ডাক্তার সাহেবের যন্তর হবে, ফেলে গিয়েছে, ভালো করে রেখে দিই!

মোহন একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, দেখে চমকে উঠল—এ যে সেই দূরবীনটা! চমকে উঠে সে ভাবল এটা কেমন করে এল? তখনি রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল—তবে কি স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন মাত্র নয়? তবে কি তার গোড়াতে বাস্তবের বৃন্ত আছে? না, না, সে সম্ভাবনা যে স্বপ্নের চেয়েও অসম্ভব! কিন্তু, দূরবীনটা তো কঠোর সত্য! সেটাকে তো অস্বীকার করা

চলে না! তার দুর্বল মস্তিষ্ক আর চিন্তা করতে পারল না। সম্ভব আর অসম্ভবের দোটানায় পড়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে তন্দ্রাতুর হয়ে পড়ল।

মাধব পাল ডাক্তার সাহেবের "যন্তরটা" সযত্নে তুলে রাখবার উদ্দেশ্যে গৃহান্তরে প্রস্থান করল।

শীতের আরম্ভে মোহন প্রায় সুস্থ হয়ে উঠল—এখন সে অন্যের সাহায্য ছাড়া হেঁটে ফিরে বেড়াতে পারে। পৌষের মাঝামাঝি সে আগেকার স্বাস্থ্য ফিরে পেল, এখন একাকী সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ইতিমধ্যে একবারও সে কুসমির দেখা পায় নি। আগে বাঁধটা তাদের মিলিত হবার উপলক্ষ্য ছিল, এখন সে বাঁধ তো গিয়েছে, কাজেই মিলনের ক্ষেত্রও গিয়েছে। তখন তার মনে হল আবার যদি বাঁধটা খাড়া করা যায়, তবে হয়তো কুসমির সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ হবে। সে ধীরে ধীরে কুঠিবাড়ির দিকে চলল। দূর থেকে সে দেখতে পেল যে বাড়ির রোয়াকে রোদ্দুরে পিঠ করে নবীন, নজির আর মুকুন্দ বসে আছে। মোহনকে দেখে মুকুন্দ বলল—কিরে মোহন, কেমন আছিস ?

নবীন আর নজির বলে উঠল—এই যে ভাই, তোমার কথাই হচ্ছিল, ভাবছিলাম তোমাকে ডাকতে যাব।

মোহন শুধাল,—কেন, ব্যাপার কি ?

—ব্যাপার আর কি ? আবার তো গরমকাল এল, এবার কাজে লেগে যেতে হয়।

কাজটা কি বুঝতে না পেরে মোহন অবাক হয়ে রইল।

নজির বলল—বুঝতে পারলে না !

নবীন বলল—আবার বাঁধে হাত দিতে হবে না ! এর পরে কি আর সময় পাওয়া যাবে ?

মোহনের মনটা খুশি হয়ে উঠল, একটা কাজ পাওয়া গেল ভেবে, তা ছাড়া ঐ কাজের সূত্রে হয়তো কুসমির দেখাটাও পাওয়া যাবে।

তখন তারা চারজনে যুক্তি-পরামর্শ করবার উদ্দেশ্যে দর্পনারায়ণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

বৈশাখ মাসের প্রথম দিকেই বাঁধের কাজ শেষ হল। পুরানো জায়গাতেই বাঁধ তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু এবারে আরও চওড়া এবং আরও মজবুত করে

বাঁধা হয়েছে—তা ছাড়া রাতে পাহারা দেবার জন্যে একসঙ্গে চার-পাঁচ জন লোক রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। দিনের বেলাতেও একাধিক লোক থাকে। ওতেই মোহনের আপত্তি। সে বলে—দাদাবাবু, এত লোকের আবশ্যক কি?

দর্পনারায়ণ বলে—গতবারের কথা এর মধ্যেই ভুলে গেলি।

মোহন বলে—এবারে আসুক না তারা!

মোহন তার আঘাতের প্রকৃত কারণ জানতে পেরেছে।

দর্পনারায়ণ বলে—ধর, এবার যদি তারা না এসে বান আসে।

মোহন উত্তর দেয়—বান এলে তোমার পাঁচজন লোকেই বা কি করবে?

দর্পনারায়ণ বলে—একজনে যা করবে তার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি করবার সম্ভাবনা।

মোহন বুঝতে পারে, নাঃ, ওখানে কুসমির সঙ্গে তার দেখা হবার আর সম্ভাবনা নাই। সে ভাবে অন্য উপায় সন্ধান করতে হবে।

দর্পনারায়ণের সাথের লোকদের সবাই কুঠিবাড়ির দল বলত। কুঠিবাড়ির দলের ধারণা হল এবারে বাঁধ আর ভাঙবে না। কাজেও দাঁড়াল তাই। বৈশাখের শেষে যমুনার জল বাড়ল, আষাঢ়ের প্রথমে পদ্মার ঘোলা এল, শ্রাবণের প্রথমে আত্রাই নদীর হঠাৎ বন্যা এল—কিন্তু বাঁধ টলল না। কুঠিবাড়ির দলের আনন্দ ধরে না। দর্পনারায়ণ বলল—আর দুটো মাস ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে কার্তিকের প্রথমে জমিতে কলাই ছড়িয়ে দিতে হবে। এবারে তার বেশি নয়। সে আরও বলল—আগামী বছরে বাঁধটাকে আরও মজবুত করে তুলে আমন ধান দিতে হবে, আর ঐ উঁচু জমিটা রাখতে হবে চৈতালির জন্যে।

নজির বলল—তার আগে চাষ দিয়ে তিল বুনে দিলেই হবে! তিল যা হবে দাদাবাবু…।

মুকুন্দ বলে—একেবারে তালের মতো।

নজির বিরক্ত হয়ে বলে—রাগ কর কেন দাদা, সে তিলের তেল তোমার মাথার জন্যেই রাখব।

মুকুন্দ নিজের মাথাটা দেখিয়ে বলে—ভাই, আগাগোড়া টাক, তেলের কেবল বাজে খরচ হবে।

নজির বলল—বাজে খরচ কি কেবল তেলেরই হয়, কথার হয় না!

দর্পনারায়ণ বলল—তিলেরও দেখা নেই, তালেরও দেখা নেই, মাঝে থেকে এই কথা কাটাকাটি কেন?

তবে থাক—বলে তুইজনেই থামে।

আশ্বিন মাসের শেষে মাঠে কলাই ছড়িয়ে দেওয়া হল, কার্তিক মাসের শেষে অঘ্রানের প্রথমে কলাই কাটা হল। মাঠের মাঝে একটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে শস্য মাড়াই করা হলে দর্পনারায়ণ সকলকে সমান ভাগ করে দিল, নিজের জন্য কিছু রাখল না। সকলে বলল, তা কি হয়। এবং সকলে নিজ নিজ ভাগ থেকে কলাই দিয়ে বস্তা ভরে কুঠিবাড়িতে পৌঁছে দিল।

আবার গ্রীষ্মকাল এল, তখন বাঁধটা নূতন করে মজবুত করবার কাজ আরম্ভ হল। দর্পনারায়ণের মনে ইচ্ছা ছিল যে এবারে উঁচু জমিতে লোক বসিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বন্যার তোড় না দেখে সে কাজে হাত দেওয়া চলে না—কারণ বন্যায় বাঁধ ভেঙে গেলে প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে। আষাঢ় শ্রাবণে বন্যা পুরো দমে এল—কিন্তু বাঁধ অটুট রইল। তখন দর্পনারায়ণ বুঝল—এবারে লোক বসানো যেতে পারে। শীতের প্রারম্ভে সে নবীন আর নজিরকে বলল—দেখ, মাঠের উঁচু দিকে লোক বসিয়ে দেব—নীচু দিকে লোক বসিয়ে দেব—নীচু দিকে চাষ হতে পারবে। সে আরও বলল—যারা এখানে বাড়ি করবে তাদের মধ্যে জমি সমান ভাবে ভাগ করে দেব।

ওরা আনন্দে নেচে উঠল। দেখতে দেখতে এক মাসের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট ঘর হিন্দু-মুসলমান এসে ঘর তুলল। তাদের আবার ঘর তুলবার খরচ। অনেকে নিজেদের ঘর ভেঙে নিয়ে এল, যাদের সে সুযোগ ছিল না, তারা বাঁশ, কাঠ কেটে নিয়ে এল, কৃষাণদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে খড়বিচালি নিয়ে এল, আর নিজেরাই তারা মজুর, নিজেরাই তারা পরস্পরকে সাহায্য করে ঘর খাড়া করল, গোরু নিয়ে এসে গোয়ালঘর তুলল, ধান্য-কলাই রাখবার জন্যে গোলা

বাঁধল। তারপরে সকলে মিলে নিজ নিজ ভাগের জমিতে সর্ষে, ছোলা, মসুর বুনে দিল।

এমনি ভাবে সে বছরটা গেল। পর বছর গ্রীষ্মকালে আবার বাঁধকে আরও মজবুত করা হল। আরও কতক লোক এসে বসল। মাঠের নীচু জায়গাটায় আমন ধানের চাষ হল। অনেকে আখ লাগিয়ে দিল। তারপরে অঘ্রান মাস এসে পড়লে একদিকে ধান কাটা শুরু হয়ে গেল, আর-এক দিকে চলল চৈতালী বপন। যারা আখ বুনেছিল তারা আখ কেটে নিয়ে এসে মাড়াই করবার কলে ফেলল। আখের রসে লোহার গামলা ভরে ওঠে, গন্ধে চারি দিক ভরে যায়, আর লুব্ধ শিশুর দল সেই রসের ধারার দিকে মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে থাকে। লোকজনে গোরুবাছুরে আর নূতন উত্তরে বাতাসে হিল্লোলিত শস্যক্ষেত্রে জনপদ ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠে দর্পনারায়ণের অনেক দিনের বাসনাকে, ব্যর্থতাকে, স্বপ্নকে সার্থক করে তুলেছে। বিল বুঝি এবার পোষ মানল। প্রকৃতি বুঝি এবার বশ হল। কিন্তু প্রকৃতি ও নারী দুই-ই রহস্যময়ী, বশ মানলেও তাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে নেই।

মোহনের আঘাতের পরে তিনবছর গত হয়েছে, আমাদের কাহিনী আরম্ভের পরে সাত, আট বৎসর কাল। এখন দীপ্তিনারায়ণের বয়স বার বৎসর, মোহনের কুড়ি বৎসর, আর কুসমির বয়স ষোলর কাছে, সে এখন কৈশোরের উপান্তে, যৌবনের প্রারম্ভে। গত তিন বছরের মধ্যে মোহন ও কুসমির খুব বেশি দেখাশোনা হয় নি ; প্রথম অন্তরায় সুযোগের অভাব, দ্বিতীয় অন্তরায়, ডাকু রায়ের সতর্কতা, আর তৃতীয় বা শ্রেষ্ঠ অন্তরায় যৌবনের চৈতন্য। নারীর যৌবন দুদিকে ধারওয়ালা তরোয়ালের মতন, তাকে বুকে চেপে ধরবার উপায় নেই। একদিকে সে তলোয়ার কেটে বসে প্রণয়ীর বুকে, আর-এক দিকে তীক্ষ্ণ দাগ টানে নারীর নিজের বুকে, তাকে নিরাপদে রক্ষা করবার মতো খাপ আজও আবিষ্কৃত হয় নি। কুসমি আজ সেই অসিলতা নিয়ে বিব্রত, একে রাখাও যায় না, ঢাকাও যায় না, আর ফেলে দেওয়া যায় না—সে যে একেবারেই অসম্ভব! এমন হিরন্ময় জ্যোতি, এমন জ্যোতির্ময় তীক্ষ্ণতা! এ যে পরম দৈব

সম্পদ ! কিংবা দেবতা ও দানবের যৌথ চেষ্টায় গড়ে উঠেছে এই অপূর্ব সামগ্রী —রমণীর যৌবন। স্বর্গ যে অলীক নয়, তার প্রমাণ এই যৌবন, দানব যে মিথ্যা নয়, তার সাক্ষী যৌবন, আর দেবতাও যে সত্য তারও প্রমাণ তো এই যৌবন !

কুসমি মোহনকে দেখতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা না পেলেই যেন স্বস্তি পায়। যখন সে মোহনের কাছে এসে উপস্থিত হয় সে কি উত্তাল ওঠাপড়া তার হৃদয়ে, মোহন দূরে চলে যাওয়া মাত্র শান্ত হয়ে যায় বাসনার সে উর্মিলতা ! যে বিরহের মধ্য সমুদ্র এমন নিস্তরঙ্গ, তার মিলনের উপকূল এমন তরঙ্গ-তাড়িত কেন অবোধ কুসমি কিছুতেই বুঝতে পারে না। সে কিছুতেই বুঝতে পারে না তরঙ্গবলয়হীন মধ্য সমুদ্রে যে ছায়া-চাঁদ এমন নিখুঁত, উপকূলের ঢেউয়ের মালা ছুটোছুটিতে সে এমন শত সহস্র খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় কেন ? সে বুঝতে পেরেছে বিরহে শান্তি, মিলনে সে এক বিষম জ্বালা। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না যে কেন ঐ জ্বালা তবু এমন কাম্য।

সেদিনটা মাঘ মাস। যতদূর দেখা যায় সর্ষে ফুলের প্রগলভ প্রলাপে পৃথিবী উন্মুখর, সর্ষে ফুলের সে প্রচণ্ড পীতিমার সঙ্গে একমাত্র তুলনা করে চলে শীতের রৌদ্রের, দুইয়ে আজ মিলেছে ভালো। বেলা তখন দুপুরের দিকে। মোহনের কাজ ছিল ক্ষেতগুলো একবার তদারক করে আসা। সে সেই উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। মাঝখানে সরু আল, দুদিকে ঘন সর্ষে ক্ষেত, যেখানে ফলন বেশি, গাছ প্রায় কোমর অবধি উচু।

মোহন লক্ষ্য করল, এক জায়গায় ক্ষেতের মধ্যে কি যেন নড়ছে। সে ভাবল বাছুর বা ছাগল হবে—কিন্তু একটু এগোতেই তার ভুল ভাঙল, সে দেখতে পেল কে একজন ক্ষেতের মধ্যে বসে রয়েছে।

মোহন ডাকল—কুসমি এখানে কি করছিস রে ?

কুসমি মোহনের হঠাৎ সাড়াতে বিস্মিত হবার ভাব দেখাল না—বলল—শাক তুলছি।

মোহন হেসে বলল—তোর যেন শাক তুলবার অভাব। তাই এখানে এসেছিস !

কুসমি বলল—তোমাদের ক্ষেতে এসেছি তাই বুঝি রাগ করছ।

এবারে মোহন অপ্রস্তুত হল—বলল—আমি কি তাই বলছি পাগলি? বলছি এতদূর এসেছিস কেন?

কুসমি বলল—এর চেয়ে দূরে কি কখনো আমাকে যেতে দেখো নি।

কুসমি যে তার সঙ্গে দেখা করতে বাঁধ পর্যন্ত যেত সে স্মৃতি আভাসে স্মরণ করিয়ে দিল।

মোহন বলল—তা নয়। এখন বড় হয়েছিস কিনা তাই।

কুসমি বলে—তাই তো আরও দূরে এসেছি। তাছাড়া বড় হয়েছি সে কি আমার অপরাধ! ওটা তো আমার হাতে নয়।

মোহন বলে—অপরাধের কথা কে বলছে? তোর দেখা পাইনে তাই বুঝছি কুসমি এখন বড় হয়েছে।

কুসমি বলে—দেখা পাবে কি করে? তুমি যে আমার শত্রুপক্ষের লোক!

এবারে মোহন হেসে ফেলল, বলল—ওতেই তো বুঝি তোর বয়স হয়েছে, নইলে কে শত্রু, কে মিত্র বুঝবি কেমন করে?

মোহনের ক্ষেত তদারক বুঝি আর হল না, সে ক্ষেতের মাঝে কুসমির পাশে এসে বসল। তখন শীতের হাওয়ায় সর্ষেফুলের কষায়-মধুর গন্ধ দুজনের নাসারন্ধ্রপথে মস্তিষ্কে গিয়ে ঢুকতে লাগল, তারা দেখল দুটো শৌমাদি একগুচ্ছ ফুলের মাঝে লুটোপুটি খাচ্ছে, আর শুনল দূরের কোন বাবলা গাছের উপর থেকে একটা ঘুঘু বিলাপধ্বনির জপমাল্য আবর্তন করেই চলেছে। মোহন কুসমির হাতখানা ধরল, কুসমি ছাড়িয়ে নিল। এমন করে এর আগে কখনো সে হাত ছাড়িয়ে নেয় নি! মোহন অবাক হল! কিন্তু তার বোঝা উচিত ছিল যে শেষ হাত ধরবার পরে তিনটে পুরো বছর চলে গিয়েছে। তখন ইচ্ছা না থাকলেও ধরা দিয়েছে—আর আজ হয়তো তার বিপরীত! মোহনের অভিজ্ঞতা অধিক হলে বুঝতে পারত সেদিনের স্পর্শে আর আজকার স্পর্শে প্রকাণ্ড একটা প্রভেদ আছে, যেমন দক্ষ মাঝি গাঙের জলে বৈঠা ফেলেই বুঝতে পারে বানের প্রথম জলটি এসে পৌঁছেছে। যৌবনের প্রথম তরঙ্গটিতে

কুসমির শিরা-উপশিরা আজ রিরি করছে—হাত সরিয়ে নেওয়া আজ তার ইচ্ছাধীন নয়!

অপ্রস্তুত মোহন প্রসঙ্গান্তর উপস্থিত করবার উদ্দেশ্যে বলল—হাঁরে, কুসমি, কতদিন তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভেবেছি—কিন্তু হয়ে ওঠে নি। আমার অসুখের মধ্যে তুই কি আমাকে দেখতে গিয়েছিলি? নইলে দূরবীনটা আমার শিয়রে এল কেমন করে!

কুসমি নির্বিকারভাবে বলল—আমি কেন যেতে যাব! ওটা আমি নৈমুদ্দির হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

অনেকদিনের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে মোহন যে খুশি হল, তা নয়।

মোহন অনেকক্ষণ আর কথা বলে না। সে আঘাত পেয়েছে বুঝে কুসমি মনে মনে খুশি হল, কারণ প্রেমের একটা প্রকাশ আঘাতে, দুর্বল কখনো প্রেমিক হতে পারে না। কুসমি এবার পূর্বপথ ধরল, শুধোল—মোহনদা, সত্যি বল তো, তোমার মাথায় চোট লেগেছিল কি করে?

মোহন কথা বলে না। আর একটু আঘাত দেওয়া দরকার জেনে কুসমি বলল—লোকে বলে তুমি নাকি নেশা-ভাঙ খেয়ে পড়ে গিয়েছিলে।

তারপর এই ধারালো ফলাটির আগায় একটু বিষ মাখিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বলল—আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনে।

মোহন গর্জে উঠে বলল—কেন কর না, আজ থেকে কর, আমি নেশা করি বইকি, ভাঙ, সিদ্ধি, গাঁজা, মদ কিছু বাদ দিইনে।

কুসমি বুঝল—আঘাত বেশ জুতসই হয়েছে।

আঘাত প্রেমের বিকল্প প্রকাশ, অন্য প্রকাশের পন্থা কুসমির হাতে না থাকায় সে আঘাত দিয়ে চলেছে। আর মোহন আহত হচ্ছে জেনে বুঝতে পারছে—ঠিক মর্মে গিয়ে লাগছে; বুঝতে পারছে কুসমির দিকে মোহনের মর্ম অনাবৃত।

ক্রুদ্ধ মোহন উঠবার উপক্রম করছিল—এমন সময় কুসমি চাপা আর্তনাদ করে উঠল—মোহনদা, ঐ দেখ।

এ কণ্ঠস্বর আগেকার ছলনাময় শব্দ নয়, এ কুসমির হৃদগত ভাব। মোহন কুসমির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল—মুখ একেবারে পাংশু, কি ব্যাপার?

মোহন শুধোল—কি হল রে?

তার উত্তরে কুসমি তর্জনী দিয়ে দূরে দেখিয়ে দিল, মোহন দেখল, কুসমি তো আগেই দেখেছিল, ডাকু রায় ও পরন্তপ রায় এদিকে আসছে। আর পালাবার পথ নেই।

মোহন বলল—আর পালাবার পথ নেই, এক কাজ কর, শীগগীর ক্ষেতের মধ্যে শুয়ে পড়।

কুসমি দ্বিধামাত্র না করে লক্ষ্মীমেয়েটির মতো শুয়ে পড়ল, জিজ্ঞাসা করল—তুমি?

মোহন বলল—আমিও শুচ্ছি।

মোহন তার পাশেই শুয়ে পড়ল। ফুলন্ত সর্ষে গাছে দুজনে বেশ ঢাকা পড়ে গেল—আর দেখবার উপায় রইল না। ততক্ষণে ডাকু রায় কাছে এসে পড়েছে। কুসমি ভয় পেয়ে মোহনের গা ঘেঁসে শুল—ফিসফিস করে বলল—মোহনদা, ভয় করছে।

মোহন বলল—কাছে আয়।

কুসমি আর একটু আছে এল।

মোহন শুধোল—কিরে ভয় কমেছে?

কুসমি বলল—না।

মোহন বলল—তবে আর একটু কাছে আয়।

আর একটু কাছে আসবার পরে দুজনের গায়ে গায়ে বেশ লাগালাগি হয়ে গেল।

এবারে বোধ হয় কুসমির ভয় দূর হল। আমরা তো বুঝি বাপের চোখের দৃষ্টিতে দুজনে দূরে দূরে থাকলেই ভয়ের কারণ কিছু কম ছিল। কিন্তু নব-যৌবন-সমাগতার মনের ভাব কেমন করে বুঝব? লোকে বলে বানের প্রথম জলকে বিশ্বাস করতে নেই!

মোহন ও কুসমি লাগালাগি দেহে পাশাপাশি শায়িত—ঊর্ধ্বে, অতি ঊর্ধ্বে ছাড়া পাওয়া নীলকণ্ঠের মতো নীলাভ্র আকাশ—নীচে পৃথিবীর নিরাবরণ বক্ষ; উপর থেকে ঝরছে গলিত লাভার মতো রোদ, নীচে থেকে উঠছে পৃথিবীর তপ্ত প্রশ্বাস, আর প্রত্যেক নিশ্বাসে যেন ফুলের নিবিড় মধুবিন্দু শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে পড়ছে ; একটা প্রজাপতির পাখা-দুটো মুদিত হচ্ছে আর খুলছে, চোখের ইসারায় যেন কিছু বোঝাতে চায়, ঘুঘুটা এখনো ডাকছে, দূরে একটা কু কো পাখি হঠাৎ কয়েকবার কুক, কুক, কুক করে উঠল। তারা নিশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে রয়েছে, কুসমির আঁচল আর চুল তত ভীত নয়, উড়ে উড়ে মোহনের গায়ে পড়ছে। তারা কি ভাবছিল জানিনে, হয়তো ভাবছিল—সব ভয় কেন এমন মধুর হয় না! হয়তো ভাবছিল এমন মধুর ভয় জীবনে প্রতিদিন কেন আসে না!

ডাকু রায় ও পরন্তপ খুব কাছে এসে পড়েছে।

ডাকু বলছে—রায় মশায়, কুঠিয়াল লোকটারই তো জিত হল দেখছি।

পরন্তপ বলল—হার-জিতের মীমাংসা কি এত সহজে হয়, আগে আপনার মেয়েটার বিয়ে দিয়ে ফেলুন, তার পরে খালি হাতপায়ে একবার দেখা যাবে।

ডাকু বলে—রায় মশায়, আপনি তো বলেছিলেন আপনার সন্ধানে বর আছে—কতদূর কি হল ?

পরন্তপ বলল, আছে বই কি, ভালো বর, আপনার ঘরের উপযুক্ত ঘর। শীগগীর পাকা খবর দেব।

কথা বলতে বলতে দুজনে ক্রমে দূরে গিয়ে পড়ে!

এবারে কুসমি সত্যি ভয় পায়, সে মোহনের হাত ধরে—মোহন হাত টিপে অভয় দেয়, কথা বলবার উপায় নেই কিনা। কুসমি খুব কাছে ঘেঁসে আসে। ডাকু আর পরন্তপ চেষ্টা করছে ওদের দুজনকে দূরে রাখবার—অথচ রহস্য এই যে তাদের ভয়েই মোহন আর কুসমি কাছাকাছি আসতে বাধ্য হল।

ডাকু রায় বেশ খানিকটা দূরে গেলে অসহায় কুসমি বলল—কি হবে মোহনদা।

মোহন দৃঢ় কণ্ঠে বলল—আমি আছি।

আমি আছি বলতে কতখানি কি বোঝায় বুঝবার অভিজ্ঞতা তাদের কারোই ছিল না, কেবল একজন বুঝল তার সহায়স্বরূপ একজন কেউ আছে। আর একজন বুঝল, তার পৌরুষের একটা পরীক্ষা আসছে।

মোহন উঠে বসেছিল, কুসমি তখনো শুয়ে। হঠাৎ তার ওষ্ঠাধরের দিকে তাকিয়ে মোহনের মনে হল ওই ঠোঁট দুটির লালের সঙ্গে সেদিনের স্বপ্নদৃষ্ট ফুলের রঙের যেন মিল আছে।

মোহন বলল—বল না, তুই কি আমাকে দেখতে গিয়েছিলি ?

কুসমি ঠোঁট দুটিকে একটি চুম্বনের কুঁড়ির ভঙ্গীতে সঙ্কুচিত করে চোখে চপলতা তরঙ্গিত করে বলল—না!

মোহন শুনল—হাঁ।

তার পরেই মনে হল 'না'।

আবার তখনি মনে হল 'হাঁ'।

এমনিভাবে, দুটি দর্পণে যেমন অংখ্য ছায়া প্রতিবিম্বিত হয় তেমনি অসংখ্য হাঁ এবং না-র মালা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আবর্তিত হতে থাকল। মোহন যতই হাঁ ও না-র মর্মভেদ করতে চেষ্টা করে সব ঘুলিয়ে যায়, কেবল চোখে ভেসে ওঠে ঈষন্মুক্ত একটি চুম্বনের আরক্ত কুঁড়ি!

*

বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে একদিন বিকালে দর্পনারায়ণ বাঁধের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাঁধের উপর দিয়ে বরাবর চওড়া রাস্তা। সে একদিকে তাকিয়ে দেখল—চলন বিল, অন্য দিকে বাঁধ বেঁধে জল-সরানো জমিতে নূতন জনপদ। এই জনপদটির নাম দিয়েছে সে 'নূতন জোড়াদীঘি'। গ্রামটিতে দু বছরে প্রায় একশ ঘর লোক বসেছে, সব জাতের, সব শ্রেণীর লোকই আছে, আর সকলেই প্রয়োজনভেদে কিছু কিছু জমি পেয়েছে। কোন কোন জমিতে তিনটা ফসল ওঠে। দুটো ফসল ওঠে না, এমন জমি বড় নেই।

সে বিলের দিকে তাকিয়ে ভাবল আমার একটা উদ্দেশ্য তো সিদ্ধি হল। বিলের মুখ থেকে অনেকখানি জমি কেড়ে নিয়েছি। আর ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গিয়ে আরও একটা উদ্দেশ্যে সফল হয়েছি—ডাকু রায় আর পরন্তপের প্রতাপ কমিয়ে দিয়েছি। নির্জনতায় তাদের প্রতাপ—জনময় জনপদে তারা কি করবে? দর্পনারায়ণ ভাবল একটা বাঁধ বেঁধে এক সঙ্গে বিল আর ডাকাত দুজনকেই বেঁধেছি। নিজের সাফল্য স্মরণ করে সে উচ্চস্বরে হো হো করে হেসে উঠল। দূর থেকে এই হাসি শুনেই লোকে তাকে 'পাগলা চৌধুরী' বলে থাকে।

কিন্তু তখনি তার মনে পড়ল আরও একটা কাজ বাকি আছে—সেইটেই তার জীবনের মহত্তর লক্ষ্য। সে ভাবল আর বিলম্ব করা উচিত নয়, মানুষের তো জীবন! তখনি মনে হল, না, না। এ কাজ সিদ্ধ হবার আগে তার মরবার উপায় নেই!

সে ভাবল মরি আর বাঁচি, কাজটা আমার দ্বারা সিদ্ধ হবে মনে হয় না, দীপুকেই ভার দিয়ে যেতে হবে! একটু ভাবল, হাঁ, ওর তো এখন বারো বৎসর বয়স হল—ভারটা এখনি তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার! তার পরে যখন ওর বয়স হবে, সামর্থ্য হবে, তখন করবে! অবশ্যই করবে! দীপু বাপকে বড় ভালোবাসে! তা ছাড়া এত শুধু বাপের কাজ নয়, ও যে জোড়াদীঘির বংশের ছেলে—এ কাজ যে জোড়াদীঘির চৌধুরীদের!

দর্পনারায়ণ সঙ্কল্প করল আগামী অক্ষয় তৃতীয়াতেই দীপ্তিনারায়ণকে দীক্ষা দিতে হবে। অক্ষয় তৃতীয়ার তিথিতেই নাকি জোড়াদীঘির চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠা!

## জোড়াদীঘিতে

অক্ষয় তৃতীয়ার কয়েকদিন আগে দর্পনারায়ণ জোড়াদীঘির অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহার সহিত দীপ্তিনারায়ণ। পিতা একটি ঘোড়ায়, পুত্র তাহার ছোট ঘোড়াটিতে। দীপ্তি এখন পাকা ঘোড়সোয়ার হইয়াছে। যাত্রা করিবার পূর্বে পুত্র শুধাইয়াছিল—বাবা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

বাবা বলিয়াছিল—চল না, যেদিকেই যাই বেড়ানো হবে।

পুত্র বলিল—চল বাবা।

দর্পনারায়ণ কেবল মুকুন্দকে জানাইয়া দিল যে তাহারা জোড়াদীঘি যাইতেছে। অপর কেহ তাহাদের গন্তব্যস্থল জানিল না।

এখন গ্রীষ্মকাল, বিল শুকনা, ঘুরিয়া যাইতে হয় না, দর্পনারায়ণ ইচ্ছা করিলে একদিনেই পৌঁছিতে পারিত, কিন্তু সঙ্গে বালক দীপ্তিনারায়ণ, তাই তাহাকে ধীরে ধীরে চলিতে হইল। সে ঠিক করিয়াছিল—যথেষ্ট বিশ্রাম লইতে লইতে তৃতীয়দিনে জোড়াদীঘিতে আসিয়া পৌঁছিবে। সে আরও স্থির করিয়াছিল যে জোড়াদীঘিতে রাত্রে পৌঁছিতে হইবে, গ্রামের লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হয় সে ইচ্ছা তাহার ছিল না। পূর্ব-গৌরবময় বাসভূমিতে দরিদ্র বেশে দেখা দিতে কাহারই বা ইচ্ছা করে?

মাঠের মধ্যে দুটি ঘোড়া ছুটিয়াছে, পুত্র আগে, পিতা পশ্চাতে। কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতে পুত্র পিছাইয়া পড়ে, পিতা কখন আগে আসিয়া পড়ে, তখন পিতাকে আবার থামিয়া পুত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া লইতে হয়। ইহাতে বিলম্ব অনিবার্য—কিন্তু এইরূপ বিলম্ব হইবে জানিয়া সেই ভাবেই সময়-সূচী নির্ধারিত হইয়াছিল।

রাউতারা গ্রামে আসিয়া রাত্রি অন্ধকার হইল—আর চলিবার উপায় নাই, চলিবার প্রয়োজনই বা কি? পিতাপুত্রে দুইজনে এক গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় লইল। গৃহস্থের চাকর ঘোড়া-দুইটিকে খাইতে দিল, গোয়ালঘরের পাশে

বাঁধিয়া রাখিল। পরদিন ভোরে উঠিয়া গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ জানাইয়া চাকরটিকে পারিতোষিক দিয়া পিতাপুত্র দুইজনে পুনরায় যাত্রা করিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা তাহারা একটি গ্রামের অদূরে আসিয়া পৌঁছিল। দীপ্তি শুধাইল—বাবা, ওটা কোন গ্রাম?

দর্পনারায়ণ বলিল—ঐ রক্তদহ!

রক্তদহ-নামে পুত্রের মনে সহস্র স্মৃতি উদিত হইল—তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—এই রক্তদহ গ্রাম!

তাহার বালক চিত্তের ভূগোলে জোড়াদীঘি ও রক্তদহ সুমেরু ও কুমেরু-পর্বত। কল্পনার যত স্বর্গ সমস্ত যেন প্রেম ও ঘৃণার বেগে আবর্তিত হইয়া ঐ মেরুচূড়াদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া চিরদীপ্যমান সূর্যের কিরণে নিরন্তর ঝলিতেছে। তাহার ভূগোলের আর সবই ইহাদের তুলনায় ছায়াবৎ। সে কল্পনায় শতবার সহস্রবার রক্তদহ ও জোড়াদীঘি গ্রামে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, পরন্তপ আর ইন্দ্রাণীকে, উদয়নারায়ণ আর বনমালাকে। কখনো তাহাদের চাক্ষুষ দেখিতে পাইবে এ ভরসা তাহার ছিল না, ছিল না বলিয়াই কল্পনা এমনভাবে তাহার কাছে প্রশ্রয় পাইয়াছিল, প্রশ্রয় পাইয়াছিল বলিয়াই তাহার লীলাচিত্র প্রদর্শনের আর অন্ত ছিল না।

কল্পনার সেই কুমেরু, বালকচিত্তের বিদ্বেষের সেই প্রতিদ্বন্দ্বী রক্তদহ গ্রাম আজ তাহার সম্মুখে উপস্থিত! সে কি করিবে, কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া বলিয়া উঠিল—চল না বাবা, আমরা ওদের মেরে আসি।

বাবা মনে মনে খুশি হইল, বলিল—আমরা দুজন কি গ্রামসুদ্ধ লোককে মারতে পারি। আর তা ছাড়া গ্রামের লোকের দোষ কি?

পুত্র বুঝিতে পারিল তাহাদের সম্মিলিত বীরত্ব সত্ত্বেও গ্রামবাসীকে আঁটিয়া ওঠা সম্ভব না হইতেও পারে, তাই সে বলিল—গ্রামের লোকেদের কেন? জমিদারদের!

পিতা বলিল—জমিদার যে মেয়েমানুষ! ছিঃ বাবা, মেয়েমানুষের গায়ে কি হাত তোলে?

পুত্র অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—তা কেন, পরন্তপ রায়কে, সে-ই তো সব নষ্টের গোড়াতে।

দর্পনারায়ণ বলিল—পরন্তপ অত্যন্ত খারাপ লোক, কিন্তু ইচ্ছা করলেই কি দণ্ড দেওয়া যায়, তার জন্তে অপেক্ষা করতে হয়, সুযোগ সন্ধান করতে হয়।

ধীরত্ব বীরত্বের সহায়ক। এই অতি সাধারণ সত্যটা বুঝিতেই জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়া যায়, অনেকগুলি ভুলভ্রান্তি কাটিয়া যায়। দর্পনারায়ণ এখন বুঝিয়াছে, দীপ্তিনারায়ণের বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই। মানুষকে নিতান্ত সুবোধ করিয়া গড়াই যদি বিধাতার অভিপ্রায় হইত, তবে তিনি হাত-পা-চোখ-কানের মতো জন্মকালেই তাহাকে সুবুদ্ধি দিতেন। মানুষ ভুল করুক বিধাতা চান। পড়িয়া গিয়া শিশু যেমন মাকে স্মরণ করে, ভুল করিয়া মানুষ তেমনি বিধাতাকে ডাকুক—ইহাই বোধ করি তাঁহার অভিপ্রেত। শিশু পড়ে বলিয়াই মায়ের প্রিয়, অসহায়তার দ্বারা সে মাতৃস্নেহকে উদ্বোধিত করিতে থাকে। নির্ভুল মানুষ বিধাতার প্রিয় নহে।

দর্পনারায়ণ বলিল—বাবা, আজ আমাদের এই বটগাছতলায় রাত কাটাতে হবে!

এই বিচিত্র প্রস্তাবে পুত্র খুশী হইয়া উঠিল, বলিল—সে বেশ হবে বাবা।

কাছে একটা জাম গাছ দেখাইয়া বলিল—আর এই জাম গাছের ডালে ঘোড়া দুটোকে বেঁধে রাখলেই হবে।

তাহাই স্থির হইল। ঘোড়ার পোশাক ফেলিয়া নিকটবর্তী এক পুকুর হইতে তাহাদের জল পান করাইয়া আনা হইল, তারপরে সেই গাছের ডালে তাহাদের বাঁধিয়া রাখা হইল। পিতাপুত্র দুইজনে সামান্য জলযোগ করিয়া শুইয়া পড়িল। পরদিন ভোরের আলো হইবার আগেই আবার তাহার পথে বাহির হইয়া পড়িল। রক্তদহ গ্রাম পাশে রাখিয়া তাহার পুবমুখে চলিতে লাগিল।

দুপুরবেলা এক গৃহস্থের বাড়িতে আতিথ্য স্বীকার করিয়া লইয়া তাহারা স্নানাহার করিয়া লইল। সন্ধ্যার আগে একটি প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে তাহারা

আসিয়া উপস্থিত হইল। দূরের পুঞ্জীভূত গাছপালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পুত্রকে বলিল—বল তো বাবা, ওটা কোন গ্রাম?

দীপ্তিনারায়ণের মুখে স্বতঃ উচ্চারিত হইয়া উঠিল— জোড়াদীঘি।

দর্পনারায়ণ বলিল—ঠিক ধরেছ! জোড়াদীঘিই বটে!

দীপ্তি বলিল—চল বাবা, ঢুকি।

দর্পনারায়ণ বলিল—আগে অন্ধকার হোক।

দীপ্তিনারায়ণের জীবনে একি বিচিত্র অভিজ্ঞতা! আগের দিন সন্ধ্যায় রক্তদহ! পরের দিনই জোড়াদীঘি। এমন করিয়া এত সামান্য কয়েক দণ্ডের ব্যবধানে তাহার আশৈশবের স্বপ্ন যে সত্য হইয়া উঠিবে—তাহা কে জানিত! সে ভাবিতে লাগিল—এতই যখন সত্য হইল, তখন আরও কেন না সত্য হইবে! বনমালা, এবং উদয়নারায়ণ, এবং দর্পনারায়ণ—তাহারাই বা কেন না দেখা দিবে? আর সেই যে অসহায় শিশুটি, জন্মের পরেই যাহার মাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল, যাহাকে লইয়া তাহার পিতা নিজেকে অসহায়তর মনে করিত, যে শিশুটির প্রতি এবং যে শিশুটির পিতার প্রতি সে আন্তরিক সমবেদনা বোধ করিত, তাহাদেরই কেন না দেখা পাওয়া যাইবে! আর সেই শিশুটির স্বর্গতা জননী! আহা, নিজের জননীকে কখনো সে দেখে নাই; সেই মাতৃমূর্তিকেই তাহার নিজের জননী বলিয়া সে কল্পনা করিত! কতদিন রাত্রে এই মাতৃমূর্তিকেই সে স্বপ্নে দেখিয়াছে। রজনী যেমন চুল-খোলা মুখ নত করিয়া পৃথিবীকে কোলে লইয়া বসিয়া থাকে, তাহার চুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তারার মণি-মাণিক জ্বলিতে থাকে, তেমনি করিয়া স্বপ্নরূপার সেই মুখচ্ছবি তাহাকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু হায়, স্বপ্ন এমন ভঙ্গুর কেন? ব্যাকুলতা চরমে উঠিবার আগেই স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, দীপ্তিনারায়ণ কাঁদিয়া ওঠে। স্বপ্নের স্মৃতিরূপে সেই মহীয়সী নারীমূর্তির কানের দুলটির লাল পাথরের টুকরার দীপ্তিচ্ছবি স্বর্ণময় শূলের মতো হৃদয়ের ক্ষতস্থানটিতে একবার আঘাত করে—তারপরে সব অন্ধকার! দীপ্তিনারায়ণ পাশ ফিরিয়া দেখে জানালাপথে প্রভাতী তারাটি বেদনায় দবদব করিয়া জ্বলিতেছে।

●

অন্ধকার হইলে দীপ্তিনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া দর্পনারায়ণ গ্রামে প্রবেশ করিল। বড় সড়ক ত্যাগ করিয়া একটা সরুপথে তাহারা চলিতে লাগিল। দর্পনারায়ণের মনে আশঙ্কা ছিল, পাছে কেহ তাহাকে চিনিয়া ফেলে। দশ বৎসর গ্রামছাড়া হইলেও সকলেই তাহাকে চিনিবে। কিছুদূর গিয়া অন্ধকারে একজন লোককে আসিতে দেখিল, পিতা-পুত্র পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। লোকটা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। কিছুদূর গিয়া তাহার যেন কি মনে হইল—সে হাঁকিল—কে যায়? দর্পনারায়ণ উত্তর না দিয়া দীপ্তিকে টানিয়া লইয়া হনহন করিয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু তখন তাহার মনে কি হইতেছিল তাহা বিধাতাই জানেন! গলার স্বর শুনিয়া দর্পনারায়ণ বুঝিল লোকটা হরু জেলে। তাহার মনে হইল লোকটাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া ওঠে, পরিচয় দেয়, ভাই আমি! সেই হরু জেলে, সম্পদের দিনে যে নগণ্য ছিল, আজ তাহাকে আপন রক্ত-সম্বন্ধের জ্ঞাতি বলিয়া মনে হইল। জোড়াদীঘি যদি তাহাদের সকলেরই জননী হয়, তবে গ্রামের চৌধুরী জমিদার এবং দীনতম প্রজা রক্ত-সম্বন্ধ ছাড়া আর কি? কিন্তু দর্পনারায়ণের উত্তর দেওয়া হইল না। সম্পদের পূর্বসংস্কার যে ইহার অন্তরায়। তাহারা দুইজনে নির্জন পথ ধরিয়া প্রকাণ্ড একটি দেউড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল।

দর্পনারায়ণ দেখিল দশানির দেউড়ির কপাট বন্ধ হইয়াছে। ভিতর হইতে অল্প অল্প আলোর আভাস আর ভোজপুরী দারোয়ানদের তুলসীদাসী রামায়ণ গানের অস্পষ্ট সুর ভাসিয়া আসিতেছে। সে দেখিল তাহাদের দেউড়ি অবারিত, কে আর বন্ধ করিবে। বিরাট কপাটের একখানা খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে—ইচ্ছা হইলেও বন্ধ করিবার উপায় আর নাই।

দীপ্তিকে লইয়া সে দেউড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আকাশের ফিকা অন্ধকারের তলে জমাট-বাঁধা বড় বড় অট্টালিকার অন্ধকার। দর্পনারায়ণ পথে কিছু শুকনা ডালপালা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল, চকমকি সঙ্গেই ছিল। এবারে সে আলো জ্বালিল। হঠাৎ আলো জ্বলিয়া উঠিবামাত্র অট্টালিকাগুলির

ছায়া নড়িয়া উঠিল, অট্টালিকাগুলি এত দিনে, এতদিন পরে যেন জাগিয়া উঠিল। আলোর খোঁচা খাইয়া একদল চামচিকা ফরফর শব্দে উড়িয়া বাহির হইয়া গেল ; নারিকেল গাছটার উপরে এতক্ষণ যে পেঁচাটা ডাকিতেছিল সেটা চুপ করিল, আলোর রশ্মিতে একটা হতবুদ্ধি শিয়ালের চোখ জলিয়া উঠিল। দীপ্তিনারায়ণ বিস্ময়ে নির্বাক ! দর্পনারায়ণের মনের উপরে সহস্র স্মৃতির বোঝা পাথরের মতো চাপিয়া ধরিয়াছে—তাহার কথা বলিবার উপায় কই ?

দীপ্তি শুধাইল—বাবা এই কি—

তাহার বাক্য সম্পূর্ণ হইবার আগেই পিতা বলিল—হাঁ বাবা, এই উদয়নারায়ণের বাড়ি।

দীপ্তি পুনরায় শুধাইল—বনমালার ?

পিতা বলিল—বনমালারও বই কি ! বনমালা যে উদয়নারায়ণের পুত্রবধূ !

দর্পনারায়ণ দেখিল দশ বৎসর পড়িয়া থাকিবার ফলে বাড়ি যেন শতাব্দী কালের পুরাতন হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিল আর ছাড়িয়া না থাকিলেই বা কি হইত। এই বিশাল পুরী রক্ষা করিতে যে সম্পদের প্রয়োজন, সে সম্পদ তো অনেককাল অন্তর্হিত।

সে দেখিল চণ্ডীমণ্ডপের কার্নিস, আলিসা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ছাদের উপরে অশথ গাছ বেশ সতেজ হইয়া উঠিয়া দিকে দিকে শিকড় চালাইয়া দিয়াছে ; সে দেখিতে পাইল চণ্ডীমণ্ডপের প্রকাণ্ড বারান্দাটা চামচিকার উচ্ছিষ্ট ফলের বীচিতে পরিপূর্ণ, একখানা পা ফেলিবারও স্থান নাই। পাশেই বিষ্ণুমণ্ডপ, তাহারও অনুরূপ অবস্থা। ডানদিকে পুকুরের পারে কাছারির দালান। সেটাও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু বারান্দাটা তেমন অপরিচ্ছন্ন নয়, একদিকে খানিকটা ছাই আর পোড়া কাঠ পড়িয়া রহিয়াছে। সে অনুমানে বুঝিল কোন বিদেশী পথিক এখানে আশ্রয় লইয়া রাঁধিয়া খাইয়াছিল।

দক্ষিণ দিকে বৈঠকখানা। সেই আলো-আঁধারের মধ্যেও বৈঠকখানার অবস্থা বুঝিতে তাহার কষ্ট হইল না। দোতলার ছাদটা পড়িয়া গিয়াছে —নীচতলার জানালা-দরজাগুলি লোকে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে—সমস্ত দালানটা

দাঁত-পড়িয়া-যাওয়া মুখগহ্বরের মতো, উদগতনেত্র চক্ষুকোটরের মতো একান্ত অসহায়, একান্ত বীভৎসদর্শন! দর্পনারায়ণ আর সহ্য করিতে পারিল না, সে ভাবিয়াও ভাবে নাই যে বাড়িটাকে এমন শ্রীহীন দেখিতে হইবে। সে বলিল—চল বাবা, ভিতরবাড়িতে যাই!

পরের উঠানে রান্নাবাড়ি। পাশাপাশি দুইটি দালান, একটি আমিষ পাকের আর একটি নিরামিষ পাকের। দুটিই পড়িয়া গিয়াছে। রান্নার দালান তো আর পূজার দালানের মতো শক্ত করিয়া গাঁথা হয় না। তার পরের উঠানে অন্দর মহল, তার পরের উঠানে ছিল বনমালার বহুযত্নের বাগান। একটার পরে একটা চত্বর তাহারা পার হইয়া যাইতে লাগিল—দুজনেই নীরব, নির্বাক, স্বপ্নচালিতবৎ, কেবল এইটুকু প্রভেদ যে, পুত্র তাহার বহুকালের স্বপ্নকে ক্রমশ বাস্তব হইয়া উঠিতে দেখিতেছে, আর পিতা তাহার আশৈশবের বাস্তবকে আজ স্বপ্নের চেয়েও অবাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করিল।

অন্দর মহলের একটি দালানে দর্পনারায়ণ প্রবেশ করিল—দীপ্তিনারায়ণ অনুগামী। সেই দালানের একটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে, আর কোন আসবাব-পত্র নাই, কেবল একখানা বৃহৎ পালঙ্ক চারিটি মাত্র পায়ার উপরে ভর দিয়া কাঠের জীর্ণ পঞ্জর বাহির করিয়া বিরাজিত। সেই ভাঙা পালঙ্কখানার উপরে দর্পনারায়ণ বসিয়া পড়িয়া একেবারে যেন ভাঙিয়া পড়িল। দীপ্তি বুঝিতে পারে না,—ব্যাপার কি? শুধাইতেও সাহস হয় না। পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল গালের উপর জল গড়াইতেছে। তাহার ভয় হইল যে পিতার কি হঠাৎ কোন পীড়া উপস্থিত হইল? কী জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়া পায় না, চুপ করিয়া থাকে, তাহার নিজের মনটাও ভারি হইয়া ওঠে।

অনেকক্ষণ পরে দর্পনারায়ণ আত্মসংবরণ করিলে দীপ্তি শুধাইল—বাবা তোমার কি হয়েছে?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া দপর্পনারায়ণ বলল—এটা ছিল বনমালার শয়ন-ঘর, এই খাটে সে শুত।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—আমার চোখে হঠাৎ জল দেখে অবাক হয়েছিলি, কিন্তু এখন তোর চোখের জল থামাবে কে ?—

তারপরে পুত্রকে সবলে জড়াইয়া ধরিয়া পাগলের মতো আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল—ওরে অভাগা, বনমালা যে তোর মা।

দর্পনারায়ণ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ভালোই করিয়াছিল, কারণ, পিতার উক্তির তাৎপর্য বুঝিবামাত্র দীপ্তিনারায়ণের মূর্ছা হইল। অনেকক্ষণ পরে অনেক চেষ্টায় তাহার জ্ঞান ফিরিবামাত্র সে বলিল—বাবা, এতদিন কেন বল নাই।

পিতা বলিল—সেই কথাই আজ বলব। দর্পনারায়ণ বলিতে লাগিল, যে কথা আমরা জন্ম থেকে জানি তার ধার ক্ষয়ে যায়, সে সত্য আর আমাদের মনকে নাড়া দিতে পারে না। কিন্তু যে সত্য আচম্বিতে অদৃষ্টের অমোঘহস্ত-নির্মিত বজ্রের মতো আমাদের অস্তিত্বের উপর এসে পড়ে, তার আকস্মিকতার প্রচণ্ড আঘাতে অভূতপূর্ব শক্তির উদ্বোধন করে দেয়!

সে বলিতে লাগিল—বৎস দীপ্তিনারায়ণ, যদি তুমি শৈশব থেকে জানতে যে তুমি জোড়াদীঘির চৌধুরী, তুমি বনমালার সন্তান, তবে জোড়াদীঘির অপমান, বনমালার দুঃখ তোমাকে কি এমনভাবে উদ্যত করে তুলত! তোমার অস্তিত্ব কি এমন চমক ভেঙে জেগে উঠত! কখনই না।

দর্পনারায়ণ বলিয়া চলিয়াছে—এখনও তুমি বালক, অপমানের প্রতিকারের শক্তি এখনো তোমার হয় নি, কিন্তু অপমানের স্মৃতিকে ধারণ করে রাখবার পক্ষে তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে! তাই আজ তোমাকে তোমার যথার্থ পরিচয় দিলাম, তাই এতদিন তোমাকে তোমার যথার্থ পরিচয় দান থেকে বিরত ছিলাম।

দর্পনারায়ণের অনন্তবেদনামথিত কণ্ঠস্বর যেন কোন অতল গহ্বর হইতে উঠিতেছিল, সেই স্বরগ্রামে নির্জন কক্ষের বায়ুমণ্ডল মন্ত্রিত হইতে লাগিল—সমস্ত অট্টালিকা যেন উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে, সমস্ত অট্টালিকা যেন পুত্রের উত্তর শুনিবার আগ্রহে উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

পুত্র শুধাইল—বাবা বল, আমাকে কি করতে হবে।

দর্পনারায়ণ বলিল—দীপ্তিনারায়ণ, তুমি বনমালার সন্তান। আর তার চেয়েও বেশি করে তুমি জোড়াদীঘির চৌধুরী! রক্তদহের জমিদার পরন্তপ রায়কে তার প্রাপ্য দণ্ড দেবার ভার তোমার উপর—বনমালার, তোমার জননীর, এই দাবি তোমার প্রতি। রক্তদহের জমিদার বংশকে কখনো তুমি ক্ষমা করবে না, শত্রুপক্ষ বলে মনে করবে—জোড়াদীঘির চৌধুরীদের এই দাবি তোমার প্রতি!

দর্পনারায়ণ বলিয়া যাইতে লাগিল—তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার—আমি কেন দণ্ড বিধান করি নি! আমার সে শক্তি নেই! দৈহিক শক্তি নয়, দৈহিক শক্তি যথেষ্ট আছে, এখনো আছে, কিন্তু সংসারের বিচিত্র আসরে দৈহিক শক্তি সর্বজয়ী নয়। যে সম্পদের বলে পরন্তপ প্রবল আমি সেই সাংসারিক সম্পদে বিচ্যুত! তাই আজ আমি হীনবল। কিন্তু আমার সে সম্পদ হল না বলেই তোমার যে হবে না তা কেমন করে বলি। তুমি যদি শ্রীমন্ত হও, ধনবলে বলীয়ান হও, তবে শত্রুর দণ্ড বিধান করবে—তোমার জোড়াদীঘির পূর্বপুরুষগণ তোমার কাছে এই আশা করে! আর সে বল যদি তোমার কখনো হয়, তবে অন্তত রক্তদহের জমিদার বংশকে শত্রুপক্ষ মনে করে ঘৃণা করবে, বিষবৎ তাদের সংসর্গ পরিহার করে চলবে—এই সামান্য আশা তোমার কাছে জোড়াদীঘির চৌধুরীদের, তোমার জননী বনমালার, আর এই হতভাগ্য পিতার।

দর্পনারায়ণ থামিল। কিন্তু প্রতিধ্বনি থামিল না, ঘরের বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎস্ফুরণ করিতে লাগিল। প্রতিধ্বনি থামিলে তাহার কথার স্মৃতি বালক দীপ্তিনারায়ণের চিত্তের দিকে দিকে অগ্নিময় কশা হানিতে থাকিল! কিছুক্ষণ কেহই কথা বলিতে পারিল না, অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে দীপ্তিনারায়ণ বলিল—বাবা, তোমার কথা মনে থাকবে। যদি আমার শক্তি হয় তবে পরন্তপ রায়কে দণ্ড দেব—আর যদি তত শক্তি না হয়, তবে অন্তত রক্তদহের জমিদার বংশকে কখনো ক্ষমা করব না, তারা যে আমার—।

পরে সংশোধন করিয়া বলিল—আমাদের বংশের শত্রু একথা কখনো বিস্মৃত হব না।

তাহার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া পিতা পুত্রের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল। তখন পিতাপুত্র দুইজনে সেই শূন্য পালঙ্কের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। মশালটি নিবিয়া গেল। তাহারা কে কি করিতে লাগিল কেহ দেখিতে পাইল না।

হঠাৎ তাহারা চকিত হইয়া উঠিল, ঘরের মধ্যে আলো আসিল কোথা হইতে! দুইজনে দেখিতে পাইল দরজার কাছে একটা মশাল হাতে মুকুন্দ দণ্ডায়মান।

বিস্মিত দর্পনারায়ণ শুধাইল—মুকুন্দ, তুই হঠাৎ!

একমাত্র মুকুন্দই জানিত যে পিতাপুত্রে জোড়াদীঘি আসিয়াছে।

মুকুন্দ বলিল—দাদাবাবু, খবর ভালো নয়।

—কি হয়েছে?

মুকুন্দ বলিল—হঠাৎ যমুনার জলে বান এসেছে, বন্যার জল একেবারে বাঁধের গোড়ায় এসে ঠেকেছে।

দর্পনারায়ণের মুখে অজ্ঞাতসারে বাহির হইল—সর্বনাশ!

তারপরে সে বলিল—জল তো বাঁধ পর্যন্ত আসবার কথা নয়। তাছাড়া এখনো জ্যৈষ্ঠ মাস পড়ে নি!

মুকুন্দ বলিল—আমরা তো সেই কথাই ভাবলাম! ভাবলাম যে বৈশাখের শেষে এত তোড়! এখনো তো বর্ষাকাল সামনে পড়ে! তাছাড়া এর উপরে যদি পদ্মার ঘোলা, আর আত্রাই-র বান এসে পড়ে তবে কি আর কিছু টিকবে! সবাই বলল—যাও মুকুন্দ—দাদাবাবুকে গিয়ে খবর দাও। তাই চলে এলাম!

দর্পনারায়ণ শুধু বলিল—চল!

সে বুঝিল সংসারে তাহারাই প্রকৃত হতভাগ্য বিধাতা যাহাদের কাঁদিবার অবকাশটুকুও দান করে না। মুকুন্দ আসিবার ঠিক আগের মুহূর্তে দর্পনারায়ণ

ভাবিতেছিল—আজ তাহার সাংসারিক কর্তব্য শেষ হইল! সে ভাবিয়াছিল চলন বিলকে সে সংযত করিতে পারিয়াছে, আর সেই সঙ্গে সংযত হইয়াছে ডাকু রায় আর পরন্তপ! সে ভাবিয়াছিল—পরন্তপের অসমাপ্ত দণ্ডবিধানের ভারটা সে পুত্রের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। এখন সে নিশ্চিন্তে মরিতে পারিবে! তাহার বয়সও হইতে চলিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে জীবনের জটিল গ্রন্থিতে অদৃষ্ট একি নূতন ফাঁস টানিয়া দিল! সে ভাবিয়া পাইল না, ইহার উদ্দেশ্য কি, আর ইহার পরিণামই বা কোথায়?

সে বলিল—মুকুন্দ আমি এগিয়ে চললাম। তুই দীপ্তিকে নিয়ে ধীরে ধীরে আয়! আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে আজ শেষ রাত্রেই গিয়ে পৌছাব!

তাহারা তিন জনে দেউড়ির বাহিরে আসিয়া পৌছিলে দর্পনারায়ণ দ্রুতপদে অন্ধকারের মধ্যে প্রস্থান করিল।

মেয়েরা পুরুষের দৃষ্টির অর্থ বুঝতে কখনো ভুল করে না। নারীত্বের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তারা পুরুষের চোখের ভাষা বুঝবার ক্ষমতা লাভ করে, কিংবা ঐ ক্ষমতাটি যখন লাভ করে, বুঝতে হবে তখনই তাদের নারীত্বের উন্মেষের অরুণোদয়। কীচকের প্রথম দৃষ্টিপাতেই দ্রৌপদী তার বাসনার ইতিহাস বুঝতে পেরেছিল, তবে যে তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল সে কেবল অবস্থা গতিকে। শকুন্তলার লতাকুঞ্জে দুষ্মন্ত আর এক বছর আগে আসলে তাঁকে কেবল শিকার করেই ফিরে যেতে হত, দুষ্মন্তের আগমন আর শকুন্তলার অন্তর-পুরের রাজকন্যার জাগরণ একই লগ্নে কালিদাস ঘটিয়েছেন। যাই হোক, আমাদের কুসমি দ্রৌপদীও নয়, শকুন্তলাও নয়, তবু একেবারে নয় কি করে বলি—সে তাদেরই সমজাতীয়া।

কুসমি কিছুদিন থেকে বড়ই উদ্বেগ বোধ করছিল—আর কিছু নয়, পরন্তপ রায়ের দৃষ্টি তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। পরন্তপ প্রায়ই ডাকু রায়ের বাড়ি আসত—একথা আমরা বলেছি। ইদানীং তার যাওয়া-আসা খুব ঘন ঘন চলছিল—আর সে ঠিক এমন সময়টি বেছে নিত—যখন ডাকু রায় অনুপস্থিত। ডাকু রায় বাড়ি না থাকলে পরন্তপের খোলা মাঠ। সে আসে, এক-আধবেলা থাকে—তারপর চলে যায়। সে থাকে কুসমির সন্ধানে—কুসমি তাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। একদিন কুসমি তার সম্মুখে পড়ে গেল—কুসমি পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টায় ছিল—পরন্তপ পথ আটকে দাঁড়াল।

পরন্তপ বলল—বাপের দেখা পাইনে, আবার তার মেয়েও যে অদৃশ্য হয়ে উঠল।

কুসমি কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল—আমার কাজ আছে।

পরন্তপ বলল—আহা কাজ তো আছেই, কিন্তু অতিথির খোঁজ-খবর নেওয়া কি একটা কাজ নয়?

কুসমি বলল—বেশ তো, আপনার কি দরকার বলুন।

পরন্তপ বলল—তোমাকেই দরকার।

কুসমি কুণ্ঠিত স্বরে বলে—কি দরকার বলুন।

পরন্তপ বলে—রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি বলা যায়, একটু নিরিবিলিতে চল।

কুসমি কিছু বলে না।

পরন্তপ আশার লক্ষণ দেখে, বলে—সে-সব কথা ধীরে সুস্থে বলব, তাড়াহুড়োয় বলবার মতো নয়।

ভীত কুসমি একদৌড়ে বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢোকে—আর বেরোয় না।

পরন্তপ চলে যায়—নূতন সুযোগের আশায়। নারী-সম্পর্কিত সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে সে বুঝতে পেরেছে যে ওদের সম্বন্ধে বেশি ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেই সব মাটি—ধীরে সুস্থে এগোতে হয়। সে বুঝেছে ত্বরা করলে যেমন কাজ নষ্ট হবার আশঙ্কা, তেমনি ধৈর্য ধরে লেগে থাকলে সাফল্য লাভ হবেই। তার ধারণা এই যে মেয়েরা শেষ পর্যন্ত ধরা দেবেই—তবে ধৈর্য চাই, তার বেশি কিছু প্রয়োজন হয় না। পরন্তপের ধারণা হয়তো ভুল নয়, এক শ্রেণীর মেয়েদের সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য হলেও হতে পারে।

ভীত কুসমি বাড়ির বের হওয়া ছেড়ে দিল—এমন কি পরন্তপের ভয়ে সে মোহনের সঙ্গে দেখা করতেও যেতে সাহস করে না।

কয়েক দিন পরে একদিন রাত্রে সে জানালায় শব্দ শুনে জেগে উঠল। কান পেতে শুনল কে যেন বাইরে থেকে টোকা মেরে শব্দ করছে। তার অভ্রান্ত নারীবুদ্ধি বলে দিল—চোর-ডাকাত নয়, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু, সে চুপ করে শুয়ে পড়ে রইল।

এই ঘটনার পর থেকে সে নিজেকে খুব অসহায় বোধ করতে লাগল। কারো সঙ্গে তার পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু কাকে এসব কথা সে জানাবে বুঝতে পারে না। বাপকে বলা চলে না, বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে বলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। মাকে বলা যেত কিন্তু সে তো মাতৃহীনা। এই দুঃসময়ে মায়ের অভাব স্মরণ করে সে মাঝে মাঝে লুকিয়ে কাঁদে। সে স্থির করল মোহনকে বলবে, কিন্তু

পরন্তপের ভয়ে সে বাড়ির বার হতে পারে না—তার মনে হত মাঠের মাঝে কোনখানে হয় তো পরন্তপ লুকিয়ে অপেক্ষা করছে।

সে আরও অনুমান করেছিল, সহজাত নারীবুদ্ধিরই ইঙ্গিতে, যে এই সহিষ্ণু ধৈর্যশীল পাষণ্ডটা সহজে নিবৃত্ত হবে না। যে-লোক হৈ হৈ শব্দে নারী-চিত্তের উপরে এসে পড়ে ডাকাতি করবার চেষ্টা করে, তাকে নিবৃত্ত করা সহজ—কিন্তু যে লোক চোরের মতো লুকিয়ে আসে তাকে এড়ানো কঠিন। কুসমি স্থির করল পরন্তপের অত্যাচার আর বাড়বার আগেই মোহনকে জানাতে হবে। এই ঘটনার দুদিন পরেই মোহনের সঙ্গে তার দেখা হল।

মোহন শুধাল—হাঁরে কুসমি তোকে দেখি নি কেন?

কুসমি নিরুত্তর।

মোহন বলে—তোর মুখ শুকনো দেখছি কেন? অসুখ বিসুখ করে নি তো।

কুসমি স্বল্পাক্ষরে বলে—না।

—তবে কি হয়েছে বল? বাবা বকেছে?

উত্তরে কুসমি বলে—চল একটু বসিগে।

কুসমির গাম্ভীর্যে মোহন ভয় পায়, বলে—আচ্ছা চল।

দুজনে গিয়ে মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় বসে। মোহন বলে—কি হয়েছে বল।

কুসমি তবু চুপ করে থাকে।

মোহন জানে কুসমি চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়, বোঝে গুরুতর কিছু ঘটেছে।

অবশেষে কুসমি পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁটতে খুঁটতে বলে—পরন্তপ রায় খুব বিরক্ত করছে।

মোহন হেসে বলে—ওঃ বুঝেছি, সে বুঝি তোর জন্য বর খুঁজে নিয়ে এসেছে।

মোহন শুনেছিল যে ডাকু রায়ের অনুরোধে পরন্তপ কুসমির বর খুঁজছে।

কুসমি এতক্ষণ কোনরকমে ধৈর্য রক্ষা করে ছিল—মোহনের হাসিতে তার বাঁধ ভেঙে পড়ল, দু চোখ দিয়ে বাঁধভাঙা জল গড়াতে লাগল।

অপ্রস্তুত মোহন বলল—আরে বর আনলেই কি বিয়ে হয়! এত ভয় পাচ্ছিস কেন?

কুসমি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল—না মোহনদা, তুমি বুঝতে পার নি! লোকটা বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করেছে।

এবার মোহন বুঝল। বলল—বলিস কি? এত বড় আস্পর্ধা!

মোহন বলতে লাগল—এবারে সে আসুক, তারপরে একবার দেখা যাবে।

কুসমি বলে উঠল—না, না, তুমি মারামারি করতে যেও না।

বিস্মিত মোহন বলল—তবে, কি করতে হবে বল!

কুসমি এক নিঃশ্বাসে দ্রুত বলে গেল—যেন কথাগুলোকে ডিঙিয়ে কোন রকমে পরপারে পৌছতে পারলেই সে বাঁচে, সে বলে গেল—আমার কেউ নেই মোহনদা, তুমি আমার পিছনে থাক—আমি যেন মনে মনে দেখতে পাই, তুমি সর্বদা আমার সঙ্গে আছ। তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত থাকব—তাহলেই আমি সাহস পাব, তাহলে আর আমি লোকটাকে ভয় করব না! কিন্তু আর যাই কর মামামারি করে বস না, তাতে খারাপ বই ভালো হবে না।

এই বলে অনুরোধের ছলে সে মোহনের হাত দুটি ধরলে! কিন্তু দেখা গেল অনুরোধ শেষ হয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরেও চারটি হাত একত্র বদ্ধ!

কিছুক্ষণ পরে দুজনে উঠে পড়ল। মোহন বলল—সাবধানে থাকিস—রাত্রে একা বেরুবি না। আর জানিস সর্বদা আমি তোর সঙ্গেই আছি। যখন দরকার হবে এখানে আসিস—আমার দেখা পাবি।

তখন দুজনে ভিন্ন পথে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল।

*

একদিন বিকাল বেলা ডাকু রায় বাড়িতে ঢুকে বলে উঠল—কই গো মা জননী, তাড়াতাড়ি খেতে দাও দেখি।

ক্ষান্তবুড়ি বসে কাঁথা সেলাই করছিল, বলল—আয় বাবা বোস।

তারপরে শুধাল, আজ অসময়ে এত তাড়া কিসের ?

ডাকু বলল—মা, অসময় নয়, মস্ত সুসময়, তোমার নাতনির বরের সন্ধান পেয়েছি।

ক্ষান্ত তার কথা শুনে ভাবল ডাকু বুঝি ঠাট্টা করছে, কিন্তু তার মুখের ভাব দেখে বুঝল কথাটা মিথ্যা নয়, অমনি সাগ্রহে শুধাল—সব খুলে বল।

ডাকু বলল—আগে খেতে দাও, আমাকে এখনি বেরুতে হবে।

ক্ষান্ত বুড়ি উঠে গিয়ে দুধ, মুড়কি আর গোটা কয়েক কলা নিয়ে ফিরে এল। ডাকু খেতে খেতে বলল—মা, একটা ভালো বরের সন্ধান পেয়েছি। তাদের বাড়ি রায়নগর। তারা রায়নগরের রায়।

ক্ষান্ত বুড়ি জিজ্ঞাসা করল—রায়নগর কোথায় বাবা ?

ডাকু বলল—রায়নগর হচ্ছে বগুড়া জেলায়।

মা বলল—সে কি বাবা, সে যে অনেক দূর, আমার কুসমিকে কি অতদূরে পাঠাতে পারি ?

ডাকু বলল—মা, শুনতেই অনেক দূর! আসলে রায়নগর চলন বিলের উত্তর মাথায়। বর্ষাকালে সোজা পাড়ি দিলে এক সন্ধ্যাতেই গিয়ে পৌঁছানো যায়। তবে এখন যাবার সময়ে কিছু বেশি সময় লাগবে, নৌকা থেকে নেমে কয়েক ক্রোশ ডাঙা পথে যেতে হয়, সেই জন্যেই তো আমার এত তাড়াতাড়ি।

ক্ষান্ত শুধাল—তুই কি সেখানে যাচ্ছিস নাকি ?

ডাকু বলে—যাব না! ঘর, বর না দেখেই কি মেয়ে দিতে পারি? জলে পড়ল কি জঙ্গলে পড়ল দেখতে হবে না ?

মা বলে—আমি কি তাই বলেছি বাবা! কেবল শুধালাম—তুই কি যাচ্ছিস নাকি ?

ডাকু বলে—এখনি রওনা হব। এখন নৌকো খুলে দিলে ভোর নাগাদ মথুরাপুরের ঘাটে পৌঁছাব। তারপরে কয়েক ক্রোশ হেঁটে বেলা এক

প্রহরের মধ্যেই রায়নগরে গিয়ে উঠতে পারব! বর যেমন ঘরও তেমনি—আর দেরি করলে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে!

ক্ষান্ত বুড়ি শুধাল—ফিরবি কবে?

ডাকু বলল—তা তিন-চার দিন হবে বই কি! একেবারে কথা পাকা করে আসব।

ক্ষান্ত বলে—তারা কি মেয়ে দেখবে না?

ডাকু বলে—দেখে ভালো! ছেলের বাপকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব কিন্তু বোধ করি মেয়ে দেখবার দাবি করবে না! ছেলের মামা আমার সঙ্গে যাচ্ছে—তারই কাছে সব খোঁজ পেলাম কিনা!

ক্ষান্ত বুড়ি বলল—তবে তাড়াতাড়ি ফিরে আয় বাবা, মেয়েটির বিয়ে হলে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি।

ডাকু হেসে বলল—আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কটা দিন কষ্ট করে বেঁচে থাক, তার পরে দেখা যাবে।

এই বলে সে মাকে প্রণাম করে পদধূলি নিল।

কুসমি আড়াল থেকে মাতাপুত্রের কথোপকথন শুনল।

ডাকু বাইরে এসে দেখে পরন্তপ রায় ঘোড়া থেকে নামছে। তাকে স্বাগত জানিয়ে ডাকু বলল—রায় মশায়, আজ আপনার অভ্যর্থনা করতে পারলাম না, আমি এখনি বের হচ্ছি।

এই বলে তার যাওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করল।

কুসমির বিয়ে হবে শুনে পরন্তপ খুব আনন্দ প্রকাশ করল, বলল—এই তো পিতার কর্তব্য।

তারপরে বলল—তবে আমিও চলি, কয়েকদিন পরে এসে আবার সন্ধান নিয়ে যাব—শুভকার্যের কতদূর কি হল!

ডাকু বলল—আপনাকে তো আসতেই হবে, সব ঠিক হলে আমি নিজে গিয়ে বার্তা পৌঁছে দেব।

পরন্তপ শুধাল—তা আপনার ফিরতে কদিন হবে?

ডাকু হিসাব করে বলল—আজ বৃহস্পতিবার। ধরুন কাল শুক্রবার ওখানে পৌছাব। খুব তাড়াতাড়িও যদি ফিরি, রবিবারের আগে ফিরতে পারব না।

পরন্তপ মনে মনে বারটি ভালো করে স্মরণ করে রাখল।

তখন দুজনে যাত্রা করল। কিছুদূর এসে ডাকু নৌকায় চড়ল—আর ডাঙাপথে ঘোড়া ছুটিয়ে পরন্তপ বিদায় হয়ে গেল।

কিছুদূর এসে পরন্তপ ঘোড়ার রাশ টেনে বিলের দিকে তাকিয়ে দেখল যে ডাকু রায়ের নৌকা দূরে গিয়েছে—তখন সে ঘোড়ার মুখ আবার ছোট ধুলুড়ির দিকে ফিরাল। সে বুঝেছিল হাতে সময় অল্প।

কুসমি পিতার বিদায়ের অপেক্ষা করছিল। পিতা চলে যেতেই সে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন সন্ধ্যার ছায়ার প্রথম পর্দাটা নেমেছে। সে একবার মোহনের সঙ্গে দেখা করবে, মোহনকে কথাটা জানাতে হবে। কুসমি জানত বাঁধের কাছাকাছি কোথাও তার দেখা পাওয়া যাবে। সে মাঠ ভেঙে চলতে শুরু করল। কিছুদূর এসে সে দেখতে পেল অদূরে ছায়াপ্রায় এক অশ্বারোহী। দু-চার লহমার মধ্যেই তার কাছে এসে পড়ল। ভালো করে বুঝবার আগেই আরোহী ঘোড়া থেকে নেমে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। ভীত কুসমি দেখল সম্মুখে পরন্তপ রায়। পরন্তপ নিজের সৌভাগ্যকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল। সে কখনো ভাবে নি যে এমন অনায়াসে সে কুসমির সাক্ষাৎ পাবে।

বেপথুমতী কুসমি নীরব এবং নিশ্চল। পরন্তপ রায়ই প্রথম কথা বলল—পরন্তপ শুধাল—এমন সন্ধ্যাবেলায় কোথায় চলেছ ?

কুসমি কুণ্ঠিতস্বরে অথচ দৃঢ়ভাবে বলল—তাতে আপনার কি ?

পরন্তপ বলল—তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।

বিপদের চরমে গিয়ে পৌছলে অপসৃত সাহস আবার একটু একটু করে ফিরে আসতে থাকে। কুসমি একটুখানি সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করল, —আমার ভালোর জন্যেই বুঝি রওনা হয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলেন ?

পরন্তপ—ঠিক ধরেছ! শোন কুসমি, তোমার বাপ যেমন তেমন বর খুঁজে তোমাকে বিদায় করবার চেষ্টা করছে! কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে আস, তবে তোমাকে এমন বরের হাতে দেব যেখানে তুমি সুখে থাকবে, ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না, গা-ভরা গয়না পাবে, বরের আদরটুকু তো উপরি!

কি বলছে ভালো করে বুঝবার আগেই কুসমির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—সে বর বুঝি আপনি? তারপরে সে উন্মাদের মতো, ভূতগ্রস্তের মতো হা হা শব্দে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। সে হাসি শুনলেই বুঝতে পারা যায় হাস্যকর্তা প্রকৃতিস্থ নাই, সে হাসিতে ভয় ধরিয়ে দেয়, নির্জন সন্ধ্যায় সেই হাসি আরও ভয়ঙ্কর মনে হল।

এমন যে পাষণ্ড পরন্তপ সেই হাসির আঘাতে সে-ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। সে বুঝল এখন আর কিছু করা যাবে না। সে স্থির করল, মনে মনে বলল, হাসো আর কাঁদো তোমাকে ছাড়ছিনে। তবে ঠিক এখনি নয়, কিন্তু সোমবারের আগে নিশ্চিত। সে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হল।

কুসমির চটকা ভাঙতেই দেখল—সম্মুখে কেউ নেই, আশপাশেও কেউ নেই, তখন সে পাগলের মতো ছুটতে শুরু করল, আজ যেমন করেই হোক মোহনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কুসমি দেখল—মাঠের চারদিকে অন্ধকার, আবার তার মনের মাঝেও অন্ধকার! সে দেখল—বাপ গিয়েছে বরের সন্ধানে। আর ঐ লোকটা! তার কথা আর কি বলবে? ভাবতে নিজেরই লজ্জা করে! অথচ সে জানে, তার মন পড়ে রয়েছে অন্যত্র। সেই অন্যত্রর সন্ধানেই তো ছুটছে!

অন্ধকারে পথ বিপথ বুঝবার উপায় নেই, বিশেষ বিপথ দিয়েই তাকে চলতে হচ্ছে, পথে আর কেউ দেখলে তাকে উন্মাদিনী মনে করবে—এ আশঙ্কা তার মনে ছিল। তার পা কেটে গেল, আঁচল ছিঁড়ে গেল। বাঁধের কাছে একটা নির্জন স্থান মোহনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে নির্দিষ্ট ছিল—কুসমি

সেই দিকে ছুটতে লাগল। আজ যেমন করেই হোক মোহনের দেখা পেতে হবে, আজ না হলে কাল হয়তো আর দেখা হবে না। অন্ধকারে হঠাৎ কার গায়ের উপরে পড়ে আছাড় খেয়ে সে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল। চেতনার শেষতম মুহূর্তে তার কানে ঢুকল একটি অতি পরিচিত স্বর অত্যন্ত ব্যস্তভাবে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে উঠল—কিরে কুসমি নাকি!

মোহন অনেক চেষ্টা করে কুসমির জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। কুসমি উঠে বসতে চাইলে মোহন বলল—উঠিসনে, শুয়ে থাক।

কুসমি আপত্তি করল না, মোহনের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে রইল, মোহন ধীরে ধীরে তার মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। সে অনেকটা সুস্থ হলে মোহন জিজ্ঞাসা করল—কুসমি, কি হয়েছিল রে?

কুসমি বলল—এমন কিছু নয়। অন্ধকারে কি যেন একটা তাড়া করেছিল।

তারপরে ভেবে বলল—শিয়াল হবে বোধ করি!

—কিন্তু অন্ধকারে আসছিলি কোথায়?

কুসমি বলল—তোমার খোঁজে।

—কেন?

এবার কুসমি এমন এক কাজ করে বসল, অর্থাৎ এমন এক প্রসঙ্গের অবতারণা করে বসল যার প্রভাবে তাদের দুজনের জীবনধারা, আমাদের কাহিনী অপ্রত্যাশিত মোড় ঘুরে গেল। কেন যে এমন করল সে জানে না, এক মুহূর্ত আগেও সে জানত না যে এই কথাগুলো বলবে—সবই অভাবিত-পূর্ব। বোধকরি তার নারী প্রকৃতি তার অগোচরে তাকে দিয়ে কথাগুলো বলিয়ে নিল। যুগে যুগে নারী প্রকৃতির স্বাভাবিক ইঙ্গিতে এমনিভাবেই অভাবিতকে ঘটিয়ে তুলে কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। সীতা যে স্বর্ণমৃগ

চেয়েছিল তা তার চাইবার তো কথা নয়। সোনার অযোধ্যা যে স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে এসেছে—স্বর্ণমৃগে তার কি প্রয়োজন? আবার সোনার ইন্দ্রপ্রস্থ যে ছেড়ে এসেছে সেই দ্রৌপদীরই বা স্বর্ণপদ্ম যাচ্ঞার আবশ্যক কি! আবশ্যক তাদের নারী প্রকৃতির, সীতার বা দ্রৌপদীর নয়।

কুসমি প্রকৃত ঘটনার কিছুই বলল না, শিয়ালে তাড়া করবার কথাও সত্য নয়, সে বানিয়ে এক কাহিনী বলল—তাতে সত্য যেমন নেই, নিজের আসল মনোভাবেরও পরিচয় নেই। সে বলল—বাবা গিয়েছেন আমার জন্যে বর দেখতে, আবার এদিকে পরন্তপ রায় আর-এক বর ঠিক করেছেন—সে নাকি খুব যোগ্য পাত্র।

তারপরে বলল—তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে আসছিলাম, এখন এ দুয়ের মধ্যে···

মোহন বলল—তুই কাকে বিয়ে করবি—এই তো?

কুসমি বলল—তুমি ঠিকই ধরেছ।

কুসমিকে যত অবোধ ভেবেছি তত অবোধ সে নয়, কোন মেয়েই এসব বিষয়ে অবোধ নয়। তবে যে পুরুষে অবোধ ভাবে বোধকরি সে তার এক প্রকার অহমিকা কিংবা মেয়েদের বুদ্ধির ধারা পুরুষের বুদ্ধির খাতে প্রবাহিত হয় না, তাই ভুল করে পুরুষ তাদের অবোধ ভাবে।

কুসমি বললে বলতে পারত, মোহন, এবার আমাকে বিয়ে করে বাঁচাও। কিন্তু এমন করে কেউ বলে না, বলা চলে না, কি ভাবে বলতে হবে সে ভার মেয়েরা সহজাত নারী প্রকৃতির উপরে ছেড়ে দেয়। কুসমির নারী প্রকৃতিই তার মুখ দিয়ে কথাগুলোকে বলাল। পৌরুষে আঘাত দিয়ে পুরুষকে জাগিয়ে তুলবার কৌশল নারী প্রকৃতির সহজাত বিদ্যা। বিধাতা নারীকে অনেক পরিমাণে দুর্বল করে গড়েছেন—কিন্তু ঐ একটি অস্ত্র দিয়েছেন তার হাতে, তারই ফলে লঙ্কাকাণ্ড, কুরুক্ষেত্র এবং ট্রয়নগরীর ধ্বংস। কুসমি বেশ অনুভব করতে পারল তার কপালের উপরে মোহনের হাতখানা কঠিন হয়ে উঠেছে, ধীরে ধীরে হাতখানা নেমে গেল, তারপরে অপসৃত হল।

কৌতুকী কুসমি গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করল—কি হল? তোমার পরামর্শ কি?

মোহন বলল—তোর যাকে খুশি বিয়ে করগে, আমি কি জানি!

মোহন আহত হয়েছে বুঝতে পেরে কুসমি খুশি হল! হরিণের বুকে তীরটা বিঁধলে কোন শিকারী না খুশি হয়।

মোহন ধীরে ধীরে কুসমির মাথার নীচে থেকে পাখানা সরিয়ে নিল—তখন অগত্যা কুসমির উঠে বসা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

দুজনে মুখোমুখি বসে—কিন্তু অন্ধকারে দুজনেই অনেকটা প্রচ্ছন্ন। কুসমির দৃষ্টি চললে দেখতে পেত মোহনের চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। আবার মোহনের কিছু লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা থাকলে দেখতে পেত কুসমির চোখ দুটোও জ্বলছে, শিউলি ফুলের শিশির-বিন্দুর উপরে আলোর মতো। আর দুজনেই ইচ্ছা করলে দেখতে পেত আকাশের তারাগুলোও কৌতুক-কৌতূহলের গোপন হাসিতে ঝলমল করছে। মানুষের সুখদুঃখের বিরহ প্রহসনের এমন চিরদিনের সাথী আর কে আছে? কিন্তু কুসমি-মোহনের এসব লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা নয়—দুজনেরই সম্মুখে ভয়াবহ নিয়তি!

কুসমি বলল—কি চুপ করে রইলে যে। রাত হল, ফিরতে হবে না!

মোহন বলল—তোকে ধরে রেখেছে কে? ফিরে যা না।

কুসমি বলল—কিন্তু উত্তর পেলাম না যে!

মোহন গম্ভীর ভাবে বলল—ঠিক উত্তর চাস!

কুসমি বলে—তবে আর কী জানতে এলাম—

তবে শোন! মোহন বলতে থাকে—পরশু শনিবার, এর মধ্যে নিশ্চয় তোর বিয়ে হচ্ছে না।

কুসমি বলে—ইচ্ছা থাকলেও বা হয় কই!

মোহন বলল—বেশ, শনিবার সন্ধ্যা বেলা এখানে আসিস—ঠিক উত্তর পাবি।

কুসমি বলল—বেশ আসব। কিন্তু সেদিন যেন ঘুরিও না, তাহলে আর অপেক্ষা করবার সময় হবে না।

মোহন বলল—তোর অপেক্ষা করবার ইচ্ছা না থাকলে অপেক্ষা করতে হবে না।

কুসমি বলে—তাই হবে।

মোহন বলল—মনে থাকবে তো! শনিবার সন্ধ্যায় এখানে।

কুসমি বলল—ভুলব না।

তখন দুই জনে উঠে পড়ে, ভিন্ন পথে বাড়ির দিকে রওনা হল।

কুসমি ভেবেছিল যাবার সময়ে মোহন মিষ্টি করে দুটো কথা বলবে—কিন্তু কিছুই বলল না। কুসমি তাতে খুব দুঃখিত হল না, কেননা বুঝল মোহনের মনে বিষ এখনো সক্রিয়।

কুসমি বাড়ির দিকে গেল কিন্তু মোহন বাড়ির পথ ধরল না—যেদিকে খুশি চলতে লাগল।

শনিবার সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট স্থানে কুসমি এসে পৌঁছল, দেখল যে মোহন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কুসমিকে দেখে মোহন বলে উঠল—এসেছিস! তোর দেরি দেখে আমি ভাবছিলাম তুই আর এলি না, বোধকরি নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুজনের একজনের সঙ্গে বিয়েতে রাজি হয়ে গিয়েছিস!

কুসমি বলল—এখন তো ভুল ভেঙেছে। এবারে কি করতে হবে বল।

মোহন বলল—আমার পিছে পিছে আয়, অন্ধকারে হুঁচোট খাসনে।

মোহন বিলের দিকে রওনা হল, কুসমি নীরবে তার পিছে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ চলবার পরে তারা বাঁধ পেরিয়ে এসে বিলের জলের ধারে দাঁড়াল, চলবার পরে তারা বাঁধ পেরিয়ে এসে বিলের জলের ধারে দাঁড়াল, কুসমি দেখল সেখানে একখানা ডিঙি নৌকা বাঁধা, কুসমি চিনল মোহনের ডিঙি।

মোহন নৌকায় চড়ে কুসমিকে বলল—চড়। কুসমি উঠলে নৌকা ছেড়ে দিল, মোহন লগি নিয়ে দাঁড়াল—অন্ধকারে নৌকা রওনা হল।

এমনি ভাবে কিছুক্ষণ চলবার পরে কুসমি বলল—মোহনদা, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

মোহন বলল—জাহান্নামে! ভয় থাকে তো ফিরে যা।

কুসমি বলল—বাঃ, আমি কি তাই বলেছি। তবু কোথায় যাচ্ছি জানা ভালো।

মোহন বলল—মনে কর আমার সঙ্গে খুব দূরদেশে যাচ্ছিস। কেমন, ভয় করে ?

কুসমি বলল—না।

এবারে সে মিথ্যা কথা বলে নাই।

মোহন অন্ধকারে লগি দিয়ে নৌকা ঠেলে নিয়ে চলল। যখন লগিতে আর থই পাওয়া গেল না, সে বৈঠা নিয়ে বসল! ঝপ ঝপ শব্দ তুলে নৌকা নিরুদ্দেশের মুখে চলল—কুসমি একটা গলুইয়ের উপর চুপ করে বসে রইল। তার কৌতূহল হচ্ছিল—কিন্তু ভয় আদৌ করছিল না, মোহনের সঙ্গে যাবে তাতে আবার ভয় কি! বরঞ্চ এই উদ্দেশ্যেই তো মোহনকে বানানো কাহিনীর আঘাত করেছিল, সে জানত যে ভার বহনের শক্তি না থাকলে মোহন ভার নিত না।

অনেকক্ষণ পরে নৌকা একটা উঁচু ডাঙাজমির কাছে এসে লাগল। নৌকা বেঁধে মোহন নামল, কুসমিকে বলল—নাম।

কুসমি শুধাল—এ কোন জায়গা।

—চিনিস না! বেণী রায়ের ভিটা।

কুসমি বলল—ডাকাতে কালীর আসন ?

মোহন বলল—হাঁ।

এবার কুসমির ভয় হল—বলল—এখানে আনলে কেন ?

মোহন বলল—তবে চল তোকে রেখে আসি, তোর কর্ম নয়, তোর ভাগ্যে অন্ত বর আছে।

কুসমি শুধাল,—মোহনদা, আজ তোমার হয়েছে কি ! মিছামিছি আঘাত করছ কেন ? তোমার মতলব কি শুনি না !

মোহন বলল—তা যদি শুনতে চাস—তবে নেমে আয়।

কুসমি নামল।

মোহন বলল—আয়। তারপরে বলতে লাগল—এ জাগ্রত দেবীর স্থান ! এখানে মানত করলে কখনো নিষ্ফল হয় না, এখানে কেউ কিছু শপথ করলে কখনো ভঙ্গ করে না, করলে তার মহা অমঙ্গল হয়।

কুসমি শুধু বলল—শুনেছি।

বেণী রায়ের ভিটা ও ডাকাতে কালীর উল্লেখ আমরা পূর্বে করেছি। চলন বিলের সকলেই এই স্থানটিকে ভয়-ভক্তি করে চলে—তা সে ডাকাতই হোক আর চাষী গৃহস্থই হোক। জায়গাটি সম্পূর্ণ রিক্ত, কেবল একপাশে গোটা কয়েক আম, কাঁঠাল আর বাবলা গাছে মিলে ঝোপের মতো রচনা করেছে, আর কোথাও কিছু নেই।

মোহন বলল—এখানে তোকে শপথ করতে হবে।

কুসমি শুধাল—কি শপথ ?

মোহন বলল—তা বলছি। কিন্তু জেনে রাখ, শপথ ভঙ্গ করতে পারবি না, করলে তোর আমার দুজনেরই মহা অমঙ্গল হবে।

কুসমি মনে মনে বলল—আমার আবার মঙ্গলামঙ্গল, তবে তোমার যদি অমঙ্গল হয়, তবে আমি কখনো শপথ ভঙ্গ করব না—

প্রকাশ্যে বলল—কি যে বল মোহনদা, দেবীর স্থানে শপথ করে ভঙ্গ করব !

সে জানত মোহন কখনো এমন শপথ করিয়ে নেবে না যাতে তার, তাদের খারাপ হবে।

সে বলল—কি তোমার শপথ বল।

মোহন বলল—বল, যে আমি কখনো অন্য বরকে বিয়ে করব না।

কুসমি মনে মনে খুশি হল, বলল—আমি কখনো অন্য বর বিয়ে করব না।

তারপরে বলল—হল তো।

মোহন বলল—না, আরও একটা শপথ আছে, বল—আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

দ্বিতীয় শপথ শুনে কুসমির হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল—সে একবার মোহনের দিকে তাকাল।

মোহন বলল—কি আপত্তি আছে নাকি?

সে বলল—আমি তোকে বিয়ে করব বলে স্থির করেছি, কিন্তু তার কিছু দিন দেরি আছে। তাই শপথ করিয়ে নিচ্ছি—নইলে মেয়েমানুষকে বিশ্বাস নেই, হয় তো টাকা-ওয়ালা ঘর দেখে অন্যত্র বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবি! কি, শপথ করবি?

কুসমি বলল—আবার বল—

মোহন বলল—বল, আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

কুসমি শপথ করতে উদ্যত হয়েছে—এমন সময়ে তাদের অতর্কিতে এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটে গেল।

পূর্বোক্ত আম-কাঁঠালের ঝোপের আড়াল থেকে আট-দশ জন লোক ছুটে বেরিয়ে এসে তাদের মধ্যে পড়ল, কয়েকজন ধরল কুসমিকে, কয়েকজন ঘিরে দাঁড়াল মোহনকে।

কুসমি বা মোহন এখানে অন্য কোন লোকের আশঙ্কা করে নি। তারা এই আকস্মিক বিপদে সম্পূর্ণ হতভম্ব হয়ে গেল।

কুসমি চীৎকার করে উঠল—মোহনদা।

একজন তার মুখ চেপে ধরল। মোহন উন্মাদের মতো যাকে সামনে পেল কিল, চড়, লাথি মারতে শুরু করল। একজন তার মাথা লক্ষ্য করে একখানা লাঠি তুলেছিল। পিছন থেকে কে একজন নেতৃত্বের স্বরে বলল—ছোঁড়াটাকে মারিস নে, ঐ বাবলা গাছটায় আচ্ছা করে বেঁধে রাখ।

কুসমি গলার স্বর চিনতে পেরে বলে উঠল—মোহনদা, পরন্তপ রায়।

কিন্তু আর অধিক সে বলতে পারল না, তার মুখ আবার চেপে ধরল।

মোহনের উন্মাদ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন ফল হল না। পাঁচ-সাতজনে মিলে তাকে দড়ি দিয়ে একটা বাবলা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল—সে নিরুপায় হয়ে তাকিয়ে রইল। সে দেখতে পেল তিন-চার জনে মিলে কুসমিকে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে একখানা ছিপনৌকায় ওঠাল। তারপর সকলে সেই নৌকায় উঠে, নৌকা ছেড়ে দিল। সে শুনতে পেল অনেকগুলো বৈঠার তাড়নে ছিপ ছলাত ছলাত শব্দ করে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কেবল নিস্তব্ধ রজনীতে বহু দূরাগত সেই ক্ষীণায়মান ছলাত ছলাত ধ্বনি অশ্রু-বৈতরণীর করুণ মিনতির মতো তার কানে এসে বাজতে লাগল। সে নিস্ফল আক্রোশে মূঢ়ের মতো সেই ধ্বনির উদ্দিষ্ট পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ সে এইভাবে ছিল জানে না, অন্ধকারে প্রহর বুঝবার উপায় নেই। হঠাৎ মানুষের গলার স্বর তার কানে গেল, তারপরে একটা আলোকশিখা তার চোখে প্রবেশ করল। সে বুঝল—একখানা নৌকা এসে ডাঙার কাছে লেগেছে। সে বুঝতে পারল জনকয়েক লোক নামল এবং আরও বুঝল তারা পীঠস্থানের দিকে, যেখানে সে বন্দী অবস্থায় আছে সেদিকে, আসছে। তাদের হাতে একটা মশাল।

মশালের আলোতে লোকগুলো বন্দী মোহনকে দেখে চমকে বলে উঠল—এখানে কে রে?

তাদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে তাকে ভালো করে লক্ষ্য করে বলে উঠল—মোহন, তুই এখানে এ অবস্থায় কেন?

মোহন চিনল যে সে ডাকু রায়।

এবারে আশার রশ্মি দেখে মোহনের সব ধৈর্য ভেঙে পড়ল, সে কেঁদে উঠে বলল—রায় মশায়, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

বিস্মিত ডাকু রায় শুধাল—কি সর্বনাশ! আর তুই এত রাত্রে এখানেই বা কেন? আর তোকে বাঁধলই বা কে?

মোহন বলল—আগে বাঁধন খুলে দিন।

বন্ধনমুক্ত মোহন মাটিতে বসে পড়ল, বলল—রায় মশায়, ডাকাতে কুসমিকে লুটে নিয়ে গিয়েছে!

—কুসমিকে!

—হ্যাঁ।

—কোথা থেকে?

মোহন বলল—তা জানিনে। আমি ডিঙি করে ফিরছিলাম—হঠাৎ একখানা নৌকায় কুসমির চীৎকার শুনে তাদের তাড়া করি। তারা আমাকে এখানে বেঁধে রেখে গিয়েছে। তারা অনেক, আমি একা কি করব!

ডাকু রায় শুধোয়—ডাকাত কে, কিছু টের পেয়েছিস?

মোহন বলল—আমাকে দেখতে পেয়ে কুসমি একবার বলে উঠেছিল—পরন্তপ রায়। এইটুকু মাত্র শুনেছি!

এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে ডাকু গর্জন করে উঠল—পরন্তপ রায়! তবে রে শয়তান!

তারপরে বলল—আয় ছিপে ওঠ!

শুধাল—ওরা কতক্ষণ গিয়েছে!

মোহন বলল—তা দুই-তিন দণ্ড হবে!

ডাকু রায় অবিলম্বে মাঝিমাল্লাদের নিয়ে, মোহনকে সঙ্গে করে ছিপে গিয়ে উঠল। তখন আট-দশ বৈঠার অত্যন্ত তাড়নায় ক্ষিপ্রগতি ছিপ পারকুল গ্রামের দিকে উড়ে চলল।

পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে মোহন ঘটনার আনুপূর্বিক ইতিহাস বলে নি, কিছু বানিয়ে বলেছে।

আর ডাকু রায় রায়নগর থেকে কুসমির বিয়ে স্থির করে ফিরছিল। এক কথায় বিবাহ স্থির হয়ে যাওয়াতে তার মনটা খুশী ছিল, কালীর স্থানে একটা প্রণাম করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সে এখানে নেমেছিল। তখন উভয়পক্ষে সাক্ষাৎ।

এদিকে জোড়াদীঘি থেকে রওনা হয়ে দর্পনারায়ণ পরদিন বেলা প্রথম প্রহরের সময়ে ধুলোউড়িতে এসে পৌছল। কুঠিবাড়িতে সে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়েই বাঁধের দিকে রওনা হল—এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বাঁধের কাছে এসে উপস্থিত হল। মূল বড় বাঁধটার পরে বিলের দিকে আরও ছোট ছোট দুটো বাঁধ প্রস্তুত করা হয়েছিল, মূল বাঁধটা যাতে অধিকতর নিরাপদ হতে পারে।

দর্পনারায়ণ দেখল মুকুন্দ বাড়িয়ে বলে নি। যমুনার বান অকালে এসে পড়ে প্রথম বাঁধটাকে ধ্বসিয়ে দিয়েছে। সে দেখল বানের তোড় বেশ প্রবল এবং আরও প্রবল হয়ে উঠবে এমন সম্ভাবনা আছে, কারণ জল এখনও বাড়বার মুখে। তবে বিপদ যে অনিবার্য এমন মনে হল না। সে বুঝল যে প্রথম বাঁধটাকে হয়তো আর গড়ে তোলা এ বছর সম্ভব হবে না, কিন্তু দ্বিতীয় বাঁধটাকে শক্ত করে তোলবার সময় এখনো যায় নি। আর দ্বিতীয় বাঁধটা যদি না ধ্বসে তবে নূতন জনপদের কোন আশঙ্কা নেই। কিন্তু আর নষ্ট করবার মতো সময় নেই। তখনি সে নূতন জোড়াদীঘিতে গিয়ে উপস্থিত হল, দেখল—গাঁয়ের লোকের মনে ইতিমধ্যেই বিপদের ছায়াপাত হয়েছে—সকলেরই মুখে চোখে উদ্বেগ।

দর্পনারায়ণকে দেখতে পেয়ে লোকজন তার চারদিকে এসে দাঁড়াল।

কেউ বলল—বাবু, সর্বনাশ হল।

কেউ বলল—বাবু, এখন আমরা যাই কোথায়?

আবার কেউ কেউ বলল—তোরা চুপ কর। দাদাবাবু এসেছে, আর ভয় নেই।

দর্পনারায়ণ বলল—আরে বাপু, আগে থেকেই ভয় পাচ্ছ কেন? বানে মরবার আগেই ভয়ে মরছ দেখি।

তারপরে বলল—আমি নিজে গিয়ে বাঁধের অবস্থা দেখে এসেছি—বিপদ যে ঘটবেই তা এখনি বলা চলে না। তবে এখন থেকেই সাবধান হতে হবে।

তার কথা শুনে পূর্বোক্ত ব্যক্তি বলল—দেখ, আমি বলি নি যে দাদাবাবু এসে পড়েছেন, আর ভয় নেই।

দর্পনারায়ণ বলল—দাদাবাবুর একার সাধ্য নেই কিছু করে, তোমাদের সকলেরই হাত লাগাতে হবে।

সে আরও বলল,—এখন তোমরা নিজ নিজ কাজ কর। যখন দরকার হবে তোমাদের ডেকে পাঠাব। এই বলে সে নজির ও নবীনকে সঙ্গে করে নিয়ে কুঠিবাড়ির দিকে রওনা হল।

কুঠিবাড়িতে এসে সে জিজ্ঞাসা করল—হাঁরে, মোহন কোথায়?

তারা বলল—হুজুর, কাল থেকে তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

নবীন বলল—আজ সকালবেলাতেও তার বাড়িতে খোঁজ করে এসেছি, মাধব পাল বলল—সে কাল সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে নি।

নজির বলল—ছেলেটা শেষে বানের মুখে পড়ল নাকি?

দর্পনারায়ণ বলল—বান এখনো এমন প্রবল হয় নি যে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তবে কি জানো, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে—বানে আরও জোর ধরবে।

তারপরে নিজের আশঙ্কার ব্যাখ্যা করে বলল—এবারে যমুনার বান সময়ের আগে এসে পড়েছে, কিন্তু একা যমুনার বানকে ভয় করিনে, দ্বিতীয় বাঁধটা শক্ত করবার সময় পাওয়া যাবে, কিন্তু এর উপরে সময়ের আগে যদি পদ্মার বান এসে পড়ে তবেই বিপদ। দ্বিতীয় বাঁধ রক্ষা করা যাবে কিনা সন্দেহ! আর দ্বিতীয় বাঁধ যদি ধ্বসে পড়ে তবে শেষ পর্যন্ত কি হবে বলা চলে না।

তখন সে উভয়কে সতর্ক করে দিয়ে বলল—এসব আশঙ্কার কথা গাঁয়ের লোককে বলি নি, তাহলে চোখের জলের যে বান নামত তাতে আমার গ্রাম উজাড় হয়ে যেত—পদ্মার বানের আর দরকার হত না। তোমাদের বললাম

কারণ তোমাদের উপর নির্ভর করে কাজে নামতে হবে। তোমরা এসব কথা এখন প্রকাশ কোরো না।

তারা রাজি হল।

দর্পনারায়ণ বলল—কোদাল ধরতে পারে, ঝুড়ি করে মাটি বইতে পারে এমন শখানেক লোক আমার চাই। তোমরা গাঁয়ের মধ্যে গিয়ে লোকজন যোগাড় করে, ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে বাঁধের দিকে এগোও। আমি একবার মোহনের সন্ধান করে আসি।

নবীন ও নজির নূতন জোড়াদীঘির দিকে রওনা হল, দর্পনারায়ণ মোহনের সংবাদ নেবার উদ্দেশ্যে মাধব পালের বাড়ির দিকে চলল।

মাধব পালের বাড়িতে এসে পৌঁছতেই বুড়ো পাল তাকে গড় হয়ে প্রণাম করে একটা মোড়া এনে দিল। দর্পনারায়ণ বসে জিজ্ঞাসা করল—পাল, মোহনের খবর কি।

মাধব পাল বলল—কি জানি দাদাবাবু, কাল বিকেলের পরে আর তাকে দেখতে পাই নি। আজ সকালে উদ্ধব ফকিরের সঙ্গে দেখা, সে বলল কাল সন্ধ্যাবেলা ছেলেটাকে সে নাকি বিলের দিকে যেতে দেখেছিল।

দর্পনারায়ণ শুধাল—বিলের দিকে? একা? বান এসে বাঁধ ভেঙে দিয়েছে তবু সে বিলের দিকে গেল কেন?

মাধব বলল—বাঁধ তো ভেঙেছে কাল শেষ রাতে। জল যে বাড়ছে তা আমরা সবাই জানতাম—কিন্তু বাঁধ ভাঙবে তা ভাবি নি। আজ সকালে নবীন ভাই এসেছিল ছোঁড়াটার খোঁজ করতে, তারই কাছে সংবাদ পেলাম পয়লা বাঁধ ভেঙেছে।

দর্পনারায়ণ বলল—ঐ-আর এক বিপদ। কিন্তু বাঁধের ব্যবস্থা সকলে মিলে না হয় করব কিন্তু মোহনের নিখোঁজে যে মনটা ভারি হয়ে রইল। আমি চললাম, মোহন ফিরবামাত্র আমাকে খবর পাঠিও।

এই বলে সে উঠে পড়ল, মাধব তাকে প্রণাম করে বাড়ির সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

দর্পনারায়ণের এ-পর্যন্ত স্নানাহার হয় নি। সে সেই উদ্দেশ্যে কুঠিতে গেল। যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে স্নানাহার সেরে নিয়ে সে বাঁধের দিকে যাত্রা করল।

যখন সে দোসরা বাঁধের কাছে এসে উপস্থিত হল, দেখতে পেল প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। দর্পনারায়ণকে দেখতে পেয়ে নবীন ও নজির তার কাছে এসে বলল—দাদাবাবু, আরও আসছে।

দর্পনারায়ণ বলল—বাকি লোক এখানে আসবার দরকার নেই। তারা যাক বাঁশ কেটে আনতে। বাঁধের সামনে বাঁশের বেড়া বেঁধে মাটি ফেলতে হবে।

সে নজিরকে বলল—তুমি যাও একদল লোক নিয়ে বাঁশ কাটতে আর নবীন এখানে থাক।

নজির গাঁয়ের দিকে রওনা হল, নবীন রইল মাটি কাটবার লোকের তদারক করতে। তখন দর্পনারায়ণের আদেশে মাটি কাটা শুরু হল—এবং ঝুড়ি ঝুড়ি নূতন মাটি বাঁধের গায়ে পড়তে আরম্ভ করল।

বানের গতিক দেখবার ইচ্ছায় দর্পনারায়ণ বিলের দিকে এগিয়ে গেল, তাতে তার মুখ গম্ভীর হল। সে দেখল—এক প্রহর আগে জল যেখানে ছিল এখন তার চেয়ে এগিয়ে এসেছে। তার মনে হল—জল এই ভাবে বাড়তে থাকলে সন্ধ্যার মধ্যেই দোসরা বাঁধের গায়ে এসে লাগবে—আর তার মধ্যে যদি বেড়া দেওয়া না যায়, যাবে বিশ্বাস কম, তবে হয়তো শেষ রাতের মধ্যেই দোসরা বাঁধের অবস্থাও পয়লা বাঁধের মতোই হবে।

বিলের ধার দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ তার চোখে পড়ল একখানা ডিঙি নৌকা জলের তোড়ে ভাসতে ভাসতে আসছে। ডিঙিখানা দেখেই সে বুঝতে পারল মোহনের নৌকা। কিন্তু আরোহী কই। ডিঙি শূন্য কেন? কোথায় গিয়েছিল? মোহন গেল কোথায়? তবে কি বানের মুখেই পড়ল? নানা রকম শঙ্কামূলক সন্দেহ তার মনে জটলা করে দেখা দিতে লাগল। কর্তব্য স্থির করতে না পেরে সে বাঁধের দিকে ফিরে এল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে কাজ চলা সম্ভব নয়, সবাই বাড়ি ফিরে গেল। দর্পনারায়ণও কুঠিতে ফিরে এল। কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম এল না, সে আবার বাঁধের কাছে ফিরে গেল—রাত্রি তখন অনেক।

বাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেল বানের জল বাঁধের গায়ে এসে লেগেছে, বাঁধের নীচের দিকটা জলমগ্ন। দূর আকাশের দিকে চেয়ে দেখল মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক আসন্ন দুর্ভাগ্যের পতাকাটার মতো বারংবার নড়ে নড়ে উঠছে, সে বুঝল বাঁধ রক্ষা করা যাবে না। তার মন ভারি হয়ে উঠল।

বিলকে সংযত করেছিল বলে সে নিশ্চিন্ত ছিল, শুধু তাই নয়, এক রকম গৌরবও মনে মনে অনুভব করছিল। তার বোধ হল সেই গৌরবের মূলোচ্ছেদ করবার জন্যে বিল যেন প্রস্তুত হচ্ছে। মাত্র দুদিন আগে সে ভেবেছিল জীবনের কর্তব্যকে সে সমে এনে পৌঁছে দিয়েছে, এখন অবশিষ্ট কর্তব্যের ভার দীপ্তিনারায়ণের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে মরবার কথা ভাবতে পারে। কিন্তু এখন তার মনে হল—বিলের সঙ্গে শেষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

কতক্ষণ সে একা একা বিলের উপরে ঘুরেছে তার স্থির নেই, মেঘে অন্ধকার আকাশে প্রহরজ্ঞাপক তারাগুলো অবলুপ্ত। জলের ছলাত ছলাত শব্দ ক্রমেই যেন অধিকতর আক্রোশে বাঁধের গায়ে ছোবল মারছে। হঠাৎ সে শুনতে পেল অদূরে জলের কলকলানি উল্লাসে মুখর হয়ে উঠেছে। কাছে গিয়ে দেখল বাঁধের একটা দিক ধ্বসিয়ে দিয়ে জল প্রবেশের পথ করে নিয়েছে। তবে দ্বিতীয় বাঁধটাও গেল। তার মনে হল এবারে কাল সকালে মূল বাঁধটাকে রক্ষার চেষ্টায় লাগতে হবে। কিন্তু লোকে যখন ভোরে উঠে দেখবে দোসরা বাঁধ ধুয়ে গেছে তখন কি আর তারা বড় বাঁধ রক্ষার কাজে হাত দিতে ভরসা পাবে! সবাই হয়তো নিজ নিজ ধন-সম্পত্তি, গোরু-বাছুর, ছেলে-মেয়ে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকবে। সে বুঝল বড় বাঁধটা যদি বা রক্ষা পায়, গ্রাম রক্ষা করা যাবে না, বন্যার আতঙ্কে গ্রাম আপনি উজাড় হয়ে যাবে। তার এত বছরের উদ্যম, এত আশা আকাঙ্ক্ষা, কেবল শূন্য ভিটেগুলোতে সম্পূর্ণ রিক্ত

সমাধিস্তূপের মতো পড়ে রইবে। কিন্তু এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিষ্ফল—জল ক্রমেই বেড়ে উঠছে—আর বিলম্ব করলে তার ফিরবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে—তাই সে তাড়াতাড়ি অচির প্রভাতের আশায় কুঠিতে ফিরে এল।

ডাকু রায়ের ছিপ ছুটে চলেছে, অন্ধকারে ভালো করে পথের নিশানা বোঝা যায় না, একদিক চলতে আর-এক দিকে চলে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। বিল তো আর নদী নয় যে তাকে অনুসরণ করে গেলেই ঠিক পথে নিয়ে যাবে। বিস্তীর্ণ জলাশয়ের মধ্যে নৌকোর মুখ এক ইঞ্চি এদিক ওদিক হয়ে গেলে লক্ষ্য বহু দূরে গিয়ে পড়ে। তাই খুব সতর্কভাবে তাদের চলতে হচ্ছে। কিন্তু ডাকু রায়ের মাঝিরা সবাই পাকা ওস্তাদ, অন্ধকারেই নৌকা বাওয়া তাদের কাজ, তাই পথ হারাবার ভয় বিশেষ ছিল না। মোহন হালে বসেছে, কাছেই পাটাতনের উপরে ডাকু, তার মন বড় চঞ্চল। মোহনের মন উদ্‌ভ্রান্ত হলেও যে-সর্বনাশ সে চোখের উপরে দেখেছে, গাছের সঙ্গে বাঁধা পড়ে থেকে যে নিষ্ফল নিষ্ক্রিয়তাকে সে অনুভব করতে বাধ্য হয়েছে—তার তুলনায় নৌকা-বাওয়া তার ভালোই লাগছিল, তার মনে হচ্ছিল বৈঠার প্রত্যেক আঘাত তাকে সফলতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ডাকু বলছে—কি বলিস মোহন, বেটা বোধ হয় লোকজন নিয়ে অন্ধকারে আমাদের ঘাটের কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করছিল, দৈবাৎ মাকে দেখতে পেয়ে এই সর্বনাশ করেছে।

দুর্ভাগ্যের ঢেউয়ে শত্রুপক্ষের মোহনকে আজ ডাকু রায়ের হৃদয়ের সিক্ত সৈকতে তুলে দিয়ে গিয়েছে।

মোহন বললে—হবেও বা।

কিন্তু আমরা জানি ডাকুর অনুমান সত্য নয়। তবে বেণী রায়ের ভিটেতে পরন্তপ আর তার দল যে কি করে এল—তা মোহন নিজেও বুঝতে পারে নি। আসল কথা, পরন্তপ তার পরশুরামের দলের কয়েক জন লোককে নিয়ে ছোট ধুলোড়ির উদ্দেশ্যেই রওনা হয়েছিল। বাড়ি থেকে লুট করে কুসমিকে নিয়ে যাবে এই ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু তার সৌভাগ্যবশত অপ্রত্যাশিতভাবে কুসমির দেখা পেয়ে গেল। ছোট ধুলোড়ির পথেই পড়ে বেণী রায়ের ভিটা।

জাগ্রত কালীর পীঠস্থানে মানত করে যাবার উদ্দেশ্যেই তারা নেমেছিল—সেখানেই তারা পেয়ে গেল কুসমিকে। মোহন এত জানত না।

ডাকু শুধায়—মোহন, আমরা কি ওদের ধরতে পারব?

মোহন বলে—না পারবার কারণ কি? পরশুরামের দলের লাঠিসোটাতেই অভ্যাস, নাও বইতে পারবে কেন? তাছাড়া ওরা তো মাত্র দণ্ড দুই আগে রওনা হয়েছে!

ডাকু আশার রশ্মি দেখে বলে ওঠে—তবে চল। ওরে রতন, ওরে বলরাম, জোরে বাবা জোরে, টাকা টাকা বকশিশ—

মাঝিমাল্লাদের উদ্দেশ্যে ডাকু বলে। চমক মেরে উঠে ছিপখানা আরও জোরে ছুটতে থাকে।

রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার। উপরের আকাশ নীচের জল দুই-ই সমান অদৃশ্য! শব্দের মধ্যে কেবল তালে তালে বৈঠার ঝপাঝপ ধ্বনি, আর আটজন মাল্লার বুকের হাঁসফাঁসানির আওয়াজ!

পরন্তপের ছিপের এতক্ষণ পারকূলে পৌঁছাবার কথা—কিন্তু কার্যত হয়ে ওঠে নি। প্রথমত, তার দলের লোক নৌকা বাইতে তত অভ্যস্ত নয়, মোহন অনুমান ঠিকই করেছিল। দ্বিতীয়ত, মাঝপথে এক জায়গায় সুযোগ পেয়ে কুসমি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, তাকে ধরে নৌকায় তুলতে কিছু সময় গেল। তাছাড়া ডাকু রায় যে তাদের অনুসরণ করবে এ আশঙ্কার লেশমাত্র পরন্তপের মনে ছিল না, তাই মাঝিদের সে তাড়া দেওয়া আবশ্যক মনে করে নি। সে নিশ্চিন্তভাবে একদিকে বসে পাপাশয়তার জাল বুনছিল। অদূরে কুসমি নীরবে শায়িত। আবার পাছে জলে ঝাঁপ দেয় সেই ভয়ে চাদর দিয়ে পাটাতনের সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে! সে কি ভাবছিল জানি না, হয় তো অনন্যশরণ হয়ে ভগবানকেই স্মরণ করছিল। ভগবান দুঃখের দিনের সাথী,

সুখের দিনের সে কেউ নয়। তবে একটা কথা সে বুঝে নিয়েছিল যে অনুরোধ-উপরোধে অনুনয়-বিনয়ে এবং কান্নাকাটিতে পরন্তপের মন গলবে এমন মানুষ সে নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে তার সর্বনাশ হবেই সে ধারণাকেও সে পোষণ করতে পারছিল না, সে ভাবছিল শেষমুহূর্তে এমন একটা কিছু ঘটবে যাতে সে রক্ষা পেয়ে যাবে! কিন্তু কী তা সে বুঝতে পারে না, ভাবতে গেলে অন্ধকার দেখে! অন্ধকার, ভিতরে অন্ধকার, কুসমি তাকিয়ে দেখে বাইরেও অন্ধকার! চারিদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই! ভয় পেয়ে সে চোখ বন্ধ করে।

পরন্তপ একটা বোতল থেকে কি পদার্থ মুখে ঢেলে দিয়ে জড়িত স্বরে হাঁকে—এই শালারা! ঘুমোচ্ছিস না জেগে আছিস? জোরে! আরও জোরে।

ওই স্বরে ওই গন্ধে কুসমির অন্তরাত্মা সঙ্কুচিত হয়ে অস্তিত্বের শেষ সীমায় গিয়ে লুকোয়। সে ভাবে এটাও মানুষ, আবার মোহনও মানুষ!

মোহনের কথা মনে হতেই তার চোখ দিয়ে জল পড়ে! না জানি তার কি হল! তাকে কি এরা জীবিত রেখে এসেছে! যদি সে জীবিত থাকে, তবে সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে না, তার উদ্ধারের উপায় করবেই! হঠাৎ সে ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যে আশার ক্ষীণ রশ্মি দেখতে পায়! ভরসা পেয়ে চোখ মেলে দেখতে পায় অদূরে ক্ষীণ আলোর রেখা!

একজন মাল্লা বলে ওঠে—এই তো ঘাট কর্তা!

ছিপখানা ডাঙা স্পর্শ করে—ঘ—স করে একটা শব্দ হয়!

জড়িতস্বরে পরন্তপ বলে ওঠে—বহুত আচ্ছা!

মাঝিদের লক্ষ্য করে বলে—ওকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে চল!

কুসমি চোখ বন্ধ করে ফেলে, তার শরীর আপনি শক্ত হয়ে যায়, তার মন মূর্ছার সীমান্তে এসে পড়ে।

অল্পক্ষণ পরেই ডাকু রায়ের ছিপ ঘাটে এসে লাগে। ডাকু রায়কে অনুসরণ করে মোহন পরন্তপের কুঠির দিকে ছুটল। মাঝিরা নৌকাতেই রইল।

পরন্তপের বাড়ির দোতালায় একটি কক্ষ, একদিকে একটা রেড়ির তেলের বাতি জ্বলছে। ঘরের আর এক প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে কুসমি দাঁড়িয়ে তরুণ কদলী পাতার মতো কাঁপছে, তার সম্মুখেই পরন্তপ। বেশ বুঝতে পারা যায় ভীত হরিণী বাঘের মুখ থেকে সরতে সরতে এসে দেয়ালে বাধা পেয়েছে, আর সরবার উপায় নেই, এখন একমাত্র পালাবার পথ মৃত্যুর দ্বার দিয়ে, কিন্তু মৃত্যু তো মানুষের হাত-ধরা নয়। আরও বেশ বুঝতে পারা যায় উভয়ের মধ্যে মিষ্টিকথা ও অনুরোধ-উপরোধের পালা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছে, এখন বলপ্রয়োগ শুরু হবে।

মদিরাজড়িত স্বরে পরন্তপ বলল—নেহাত বেজার করল দেখছি, শেষে কি জোর করতে হবে নাকি!

তারপর বলল—বলছি এখনো কথা শোন।

বেপথুমতী কুসমির মুখ দেখে বলল—আহা ভয় কিসের? কেউ জানতে পারে না। দু-চার দিন থাক, তারপরে আবার পৌঁছে দিয়ে আসব।

কুসমি কথা বলে না।

পরন্তপ নিজের মনে বলতে লাগল—এমন একগুঁয়ে মেয়েও তো দেখি নি।

তারপরে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে আরম্ভ করল—ওরকম একটু ভয় তো হবেই …প্রথম কিনা—এস এগিয়ে এস, এখনো বলছি কথা শোন, আমাকে বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য কোরো না।

এবারে কুসমি কথা বলল—বলল—আমিও বলপ্রয়োগ করব।

কুসমির কথায় পরন্তপ উৎকট আনন্দে হেসে উঠল—উঃ, সে কি হাসি, যেন নরকের মর্চে-ধরা লোহার সিংহদ্বার খোলবার শব্দ!

সে হাসিতে কুসমির অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল, সে বুঝল রক্ষার আর উপায় নেই! সে বুঝল এ হাসি স্বয়ং শয়তানের।

কুসমি তার মন ভিজাবার উদ্দেশ্যে বলল—আমি আপনার মেয়ের সমান।

পরন্তপ বলল—সেই জন্যই তো এনেছি, নইলে এত কষ্ট করে কি আমার দিদিমাকে আনতে যাব

কুসমি বলল—আপনি আমার পিতার সমান।

—না হয় পিতাই হলাম! তা হয়েছে কি?

নিজের মনে পরন্তপ বলে উঠল—আঃ, এ যে আবার তর্ক করে।

তারপরে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠল—এস, এস বলছি, এই বলে সে কুসমির আঁচলের প্রান্ত ধরল।

কুসমি দেখল নিতান্তই আজ আর রক্ষা নাই।

তখন তার মনে পড়ল একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কেউ এখন রক্ষা করতে পারে না, তার মনে পড়ল এই রকম অসহায় অবস্থায় ভগবান অন্য রমণীকে তো রক্ষা করেছেন—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কাহিনী তার মনে পড়ল।

ছেলেবেলায় একবার সে যাত্রগানে এই পালাটা দেখেছিল। তার বেশ মনে পড়ল, আসর গমগম করছে, মাঝখানে দুঃশাসন দাঁড়িয়ে দ্রৌপদীর আঁচল ধরে টানছে, দ্রৌপদী স্বামীদের, গুরুজনদের, বীরপুরুষদের অনুরোধ করল—কেউ মুখ তুলেও চাইল না। তখন সে অশ্রুবিগলিত নেত্রদুটি উর্ধ্বে তুলে যুক্তকরে পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে লাগল, বলতে লাগল—হে পাণ্ডব-সখা, তুমি পাণ্ডব রমণীর লজ্জা নিবারণ কর, তুমি ছাড়া আর তার গতি নাই। অমনি আসরের অপর প্রান্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন। এক দ্রৌপদী ছাড়া আর কেউ তাঁকে দেখতে পেল না। দ্রৌপদী হাত জোড় করে তাঁর দিকে চেয়ে রইল তখন দুঃশাসন যতই তার বস্ত্র টানে বস্ত্র ততই বেড়ে চলে! আসরে উল্লাসের ঢেউ ওঠে, অবশেষে ক্লান্ত দুঃশাসন বসে পড়ে।

ছেলেবেলায় দেখা এই দৃশ্যটি কুসমির মনে জাগল—এতদিন এসব কথা সে ভুলেই গিয়েছিল।

সে দ্রৌপদীর ভঙ্গীতে হাত জোড় করে, দ্রৌপদীর ভাষায় ভগবানকে ডাকতে লাগল, দ্রৌপদীর মতোই তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল—সে ভাবল ভগবান কি দ্রৌপদীর মতো তাকে রক্ষা করবেন না! সে ভাবল ভগবান কি কেবল পাণ্ডবদেরই সখা, সাধারণ মানবের কেউ নন! তার মনে হল সে

আর কোন গুণে দ্রৌপদীর মতো না হতে পারে, কিন্তু দ্রৌপদীর মতোই যে সে নিতান্ত অসহায়!

পরন্তপ তার আঁচল ধরে টানছে, আর বলছে—শেষে জোর করতে হল দেখছি।

এতক্ষণ আঁচলের একটা প্রান্ত কুসমি ধরে রেখেছিল, কিন্তু এমন করে আর কতক্ষণ আত্মরক্ষা করা যাবে—তাই সে আঁচল ছেড়ে দিয়ে নতজানু হয়ে বসে যুক্তকরে ঊর্ধ্বনেত্রে বলতে লাগল—ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ, হরি, তুমি যদি সত্য হও তবে আমাকে রক্ষা কর। সে বলতে লাগল—ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ, হরি, আমি শাস্ত্র জানি না কিন্তু লোকের মুখে, গুরুজনের মুখে, সাধুসন্ন্যাসীর মুখে শুনেছি যে বিপদের রক্ষক একমাত্র তুমিই! আমার আজ মহাবিপদ, এখন তুমি রক্ষা করলে রক্ষা পাব, আমি সম্পূর্ণ অসহায়, সম্পূর্ণ অনাথ!

পরন্তপ বলে উঠল—কি বিপদ! এ যে আবার শাস্ত্র আওড়ায়!

তার অধীর হাত আঁচলে এক ঝটকা টান মারল, আঁচল খসে পড়ে বুক সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে গেল, পরন্তপের চক্ষু জ্বলে উঠল, বাঘ শিকারের উপরে ঝাঁপ দেবার জন্যে উদ্যত, হরিণী কম্পমানা!

অন্তর্ভেদী স্বরে কুসমি চীৎকার করে উঠল—মা, মা জননী, কোথায় তুমি, রক্ষা কর।

সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

পরন্তপ দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে, এমন সময় পিঠের উপরে অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় গভীর একটা আঘাত সে অনুভব করল, তার মনে হল যেন কেউ সবলে একখানা ছুরিকার আমূল নিহিত করে দিয়েছে! পরন্তপ দড়াম করে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, কোন রকমে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল—স্তিমিত আলোকে রমণীয় প্রেতমূর্তির ন্যায় চাঁপা।

দুজনের চোখে চোখে মিলবামাত্র চাঁপা বলে উঠল—এ সেই ছুরি, যেখানা রেখেছিলি আমাকে মারবার জন্যে, আমার সুজনিকে মারবার জন্যে! তোর

ছুরি আজ তোকে ফিরিয়ে দিলাম—এবার পিঠে বয়ে চলে যা! পরপারের আদালতে প্রমাণের অভাব হবে না।

এই বলে সে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল!

পরন্তপের আঘাত গুরুতর হয়েছে—সে কী যেন বলতে গেল, পারল না, হাত দুখানা কেঁপে উঠল, পা দুখানায় কয়েকবার আক্ষেপ দেখা গেল, তারপর হঠাৎ চোয়াল শক্ত হয়ে উঠে চোখের তারা স্থির হয়ে গেল!

চাঁপা তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না, তার দৃষ্টি পড়ল গিয়ে মূর্ছিতা বালিকার প্রতি। কুসমির মাথা কোলের উপরে তুলে নিয়ে বসল।

এমন সময় ডাকু রায় ও মোহন ঘরে প্রবেশ করল। বাইরের অন্ধকারের তুলনায় ঘরটি বেশ আলোকিত, কাজেই যা দেখবার দৃষ্টির এক ঝলকেই তারা দেখে নিল। দেখতে পেল পৃষ্ঠে একখানা ছুরিকা বিদ্ধ হয়ে পরন্তপের প্রাণহীন দেহ ধুলায় লুণ্ঠিত। তারা আরও দেখল মূর্ছিতা কুসমির মাথা কোলে নিয়ে একটি বর্ষীয়সী রমণী উপবিষ্টা!

তাদের দুজনেরই মনে হল—এ রমণী কে?

তখন হঠাৎ ডাকু রায়ের মনে পড়ল—এই তো সেই স্বপ্নদৃষ্ট মুখচ্ছবি!

মোহন কিছুই বুঝতে পারল না।

তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় স্থাণুবৎ দাঁড়িয়েই রইল।

কিছুক্ষণ পরে রমণী আগন্তুকদের শুধালে—তোমরা কে?

ডাকু বলল—মা, এই মেয়েটি আমার সন্তান!

—সন্তান! বটে!

এই বলে মূর্ছিত কুসমিকে ভালো করে কোলে টেনে নিয়ে বসল—এ আমার মেয়ে!

রমণীর কথায় ডাকুর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল—সে বলল—মা, তুমি যখন ওকে বাঁচিয়েছ, ও তোমার সন্তান বই কি!

রমণী বলল—ও কথায় ভুলছিনে! তারপর কুসমির মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে বলতে লাগল—সে থাকলে আজ ঠিক এত বড়টি হত! কত দিন স্বপ্নে দেখেছি সে বেঁচে আছে; স্বপ্নে এসে ডাক দিয়ে যেত, বলত—মা, মা, তুমি কেঁদ না, আমি বেঁচে আছি!

সে বলে চলল—আজ ওর মা, মা, রক্ষা কর শুনে মনে হল আমার বাছাই আমাকে ডাকছে! ঘরে ঢুকে দেখি—হাঁ, এ তো আমার বাছাই—

ডাকু বলল—কে?

রমণী বলল—সুজনি নামে আমার এক মেয়ে ছিল—আজ সে বেঁচে থাকলে ঠিক এমনিটি দেখতে হত।

ডাকু তাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বলল—তুমি যখন একে রক্ষা করেছ এ তোমার মেয়ে বই কি!

রমণী বলল—তবে তোমরা এসেছ কেন? আমি একে ছাড়ব না।

ডাকু আর কি বলবে?—ছাড়বে কেন মা? তুমি বাঁচিয়েছ—তুমিই রাখ না।

তিনজনে যখন এইসব কথাবার্তা হচ্ছে তখন কুসমির জ্ঞান হল—সে চোখ মেলল—দেখলে সম্মুখে তার পিতা আর মোহন, আর দেখল—একজন অপরিচিত রমণী তার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। সমস্তই তার কাছে কেমন যেন অস্পষ্ট এবং নিরর্থক বলে মনে হল। বর্তমান প্রসঙ্গের সূত্র আবিষ্কারের আশায় যেমনি সে চিন্তায় জোর দিল অমনি তার মাথা ঘুরে উঠল—সে আবার মূর্ছিত হল।

ডাকু বলল—মা, একে আর কোথাও নিয়ে যাওয়া যাক।

রমণী বলল—চল।

ডাকু আর মোহন মিলে কুসমির সংজ্ঞাহীন দেহ কোলে তুলে নিয়ে চলল—রমণী তার আঁচল ধরে রইল। তারা নীচের তলায় নেমে অন্য একটি ঘরে ঢুকে কুসমিকে শুইয়ে দিল।

আর দোতালার সেই শূন্য কক্ষে শরন্তপের প্রাণহীন দেহ পড়ে রইল।

বাতিটা নিভে গিয়েছে! বাইরে পুব আকাশে ভোরের আলোর প্রথম পাপড়িটি তখন সবে উন্মীলিত হবার মুখে।

*

সারাটা দিন লাগল কুসমির সুস্থ হতে। ডাকু ও মোহন স্থির করল যে সন্ধ্যাবেলায় কুসমিকে নিয়ে তারা বাড়ি রওনা হবে। মোহন একখানা বড় নৌকা ভাড়া করে ফেলল—অবশ্য ছিপ নৌকাখানাও সঙ্গে থাকবে। কিন্তু এক নূতন বিপদ দেখা দিল। সেই রমণী কিছুতেই কুসমিকে ছাড়তে চায় না, সকাল থেকে সে তাকে আগলে বসে রয়েছে। কুসমিকে নিয়ে যাবার আভাসমাত্রে বাঘিনীর মতো হিংস্র হয়ে ওঠে, আবার কুসমিও অল্প সময়ের মধ্যেই তার নেওটা হয়ে পড়েছে। ডাকু ভাবল—এখন সমাধান কি?

মোহন বলল—ওকে সঙ্গেই নেওয়া যাক।

কথাটা ডাকুর মনে উঠেছে। কিন্তু স্ত্রীলোকটির কি পরিচয়, পরন্তপের সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ—কিছুই ডাকু জানে না। তার উপরে আবার মেয়েটির প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধেও সংশয় আছে। এ যেমন একদিকের কথা, তেমনি আর একদিকে জোর করে কুসমিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে মেয়েটি হয়তো বা অঘটন কিছু করে বসবে। তখন ডাকু ও মোহন মেয়েটিকে সঙ্গে নেওয়াই স্থির করল।

সন্ধ্যাবেলা সকলে বড় নৌকাখানায় উঠল। নৌকার মধ্যে দুটি কামরা ছিল। একটিতে কুসমি ও মেয়েটি, অপরটিতে ডাকু ও মোহন। নৌকা ছেড়ে দিল।

রাত তখন অনেক হয়েছে। পাশাপাশি ডাকু ও মোহন বসে আছে—কারো চোখে ঘুম নেই।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ডাকু বলল—বাবা মোহন, তোমাকে একটা কথা বলি। বিপদ না এসে পড়লে কে বন্ধু, কে শত্রু বোঝা যায় না! সেই জন্যই বোধকরি ভগবান মাঝে মাঝে বিপদ পাঠিয়ে দেন।

তারপর একটু থেমে বলল—এতদিন তোমাকে শত্রু বলেই ভাবতাম। কিন্তু বিপদের মুখে দেখলাম—তোমার চেয়ে বড় আত্মীয় আর কেউ নেই।

তারপরে আবার একটু থেমে বলল—বাবা, আমি তো বুড়ো হলাম, কবে মরব—ঠিক নেই—এখন মেয়েটার একটা গতি করে যেতে পারলে বাঁচি।

তারপর এক নিশ্বাসে বলে ফেলল—কুসমিকে তোমার হাতে দিয়ে যাব ভাবছি।

পাছে কথাটা যথেষ্ট পরিষ্কার না হয়ে থাকে সেই আশঙ্কায় বলল—তুমি ওকে বিয়ে কর না কেন বাবা ?

মোহন কোন উত্তর দিল না। কি উত্তর সে দেবে ?

ডাকু বলল—আমাদের ঘর তো নিতান্ত অযোগ্য নয়, আর কুসমিকেও তো তুমি ছেলে বেলা থেকে দেখছ—ও তোমার অযোগ্য হবে না।

...কি বাবা চুপ করে থাকলে কেন ?...অবশ্য, তোমার বাবার মত নিতে হবে—কিন্তু তার আগে তোমার মতটা জানা দরকার!

মোহন বলল—রায় মশায়, আমাকে কেন অপরাধী করছেন ? আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।

ডাকু বলল—বাবা বেঁচে থাক।

এই বলে মোহনের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল, মোহন একটা প্রণাম করল।

অন্ধকারে ডাকুর চোখ থেকে জল পড়তে লাগল—এক অন্ধকারের অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ তা দেখতে পেল না।

ডাকু ভেবেছিল কুসমি ঘুমিয়েছে। কিন্তু কুসমি ঘুমোয় নি, সেই মেয়েটি অবশ্য কুসমিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ডাকু ও মোহনের কথোপকথন কুসমির কানে গেল। তার মনে হল নৌকার অন্ধকার হঠাৎ যেন গায়ে-হলুদের রঙে রাঙা হয়ে উঠল—নৌকার বাঁশের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল—অনেক রাতের চাঁদ হলুদ বাটা একটি নৈবেদ্যের মতো আকাশের কোলে উঠেছে। কুসমির মনে হল—তার ভিতরে বাইরে আজ গায়ে-হলুদের ছড়াছড়ি। সে বেশ অনুভব করল—তার বুকের গভীরতার মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা একজোড়া খঞ্জনীর মতো কোন অশ্রুত নাহানা

রাগের সঙ্গে তালে তালে বাজছে। সমস্ত জগৎ আজ মধুর সঙ্গীতে কানায় কানায় পূর্ণ, নিঃশেষ পূর্ণতা পরম অপূর্ণতার সগোত্র, তাই তার কানে আজ কোন শব্দ প্রবেশ করছে না। সে অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করতে লাগল, যেন সে সৌভাগ্যের সোনার চতুর্দোলাটিতে আরোহণ করেছে। সুখ যে দুঃখের মতোই অসহ্য এ ধারণা অবোধ বালিকার ছিল না—সুখের তরঙ্গাভিঘাত কখন তাকে স্বপ্নের ডাঙায় তুলে দিয়ে গেল—সে জানতেও পারল না।

ভোরবেলা বৈরাগীতলা বলে এক গাঁয়ে নৌকা দুখানা গিয়ে ভিড়ল।

ডাকু বলল—বাবা মোহন, তুমি এক কাজ কর। ছিপ নৌকাখানা করে তুমি এগিয়ে যাও, কদিন হল গ্রামছাড়া, সবাই দুশ্চিন্তা করছে। আমি এদের নিয়ে পিছনে আসছি।

তারপরে বলল—কাল থেকে কারো স্নানাহার হয় নি—আজ এখানে রান্না করে খেয়ে নিয়ে বিকাল বেলা তক আমরা নৌকা ছেড়ে দেব।

মোহন বলল—সে খুব ভালো হবে, আমি ততক্ষণ গাঁয়ে গিয়ে পৌছব। আপনারা ধীরে সুস্থে আসুন—এখন আর তাড়া কিসের?

ডাকু বলল—তা হলে তুমি এগিয়ে যাও বাবা। আর গিয়ে তোমার বাবাকে আমার নমস্কার আর কুঠিবাড়ির চৌধুরীবাবুকে আমার প্রণাম জানিও, তাঁদের বলো যে এতদিন আমি শয়তানের সঙ্গে ছিলাম বলে দেবতার মাহাত্ম্য বুঝতে পারি নি। আমরা আজ বিকাল বেলায় নৌকা খুলে দিলে কাল ভোরবেলার আগে গিয়ে পৌছতে পারব না—বড় নৌকা, ধীরে যাবে।

মোহন ছিপে গিয়ে উঠল। বড় নৌকাখানার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল—ঝাঁপের ফাঁকে একখানি অতি পরিচিত মুখ, কিন্তু তাতে কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে—রাত্রিবেলার পদ্মকুঁড়ি ভোরবেলায় যেন পূর্ণ বিকশিত পদ্ম হয়ে ফুটে উঠেছে। মুগ্ধ মোহন সেই মুখখানির দিকে অপলক তাকিয়ে রইল—দুই নৌকার দূরত্ব ক্রমেই বাড়তে লাগল, অবশেষে এক সময়ে সে মুখ চর্মচক্ষুর সীমার বাইরে গিয়ে পড়ল! কিন্তু মুগ্ধ মোহনের তবু মনে হতে লাগল সে তখনো সেই মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে! কবিরা একেই বলে দিব্য দৃষ্টি।

## পরিহাস

সৌভাগ্যোদয়ের সংবাদ উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে নাই—এমন কি তা নিয়ে মনে মনেও অতিরিক্ত আহ্লাদ করা উচিত নয়। মানুষের অদৃষ্টাকাশে যে শনিগ্রহ বিরাজমান অনেক সময়েই মানুষের সৌভাগ্যোদয়কে সে এক প্রকার স্পর্ধার আভাস বলে গণ্য করে। বাঙালী চাষী কখনো স্বীকার করে না যে সে এবারে ভালো ধান পেয়েছে—এ কেবল জমিদারের গোমস্তাকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে মনে করলে ভুল হবে। তার অভিজ্ঞতা বলে যে সুসংবাদ ঘোষণা করবার পরেই হয় তো হঠাৎ বান এসে উপস্থিত, ক্ষেত ডুবে গেল। কিংবা ফসল কাটবার মুখে অকাল বর্ষণ নামল—মাঠের ধান মাঠে পচল, ঘরে তোলা গেল না। তাই সে সুসংবাদটাকে যথাসম্ভব অস্বীকার করবার আশায় গোপন করে—খুব ভালো ধান পেলেও বলে—কটা দানা পেয়েছি!

মানুষের জীবনের সব ক্ষেত্রেই শনির দৃষ্টি সদা জাগ্রত। তাই দেখি সৌভাগ্যশিখরের পাশেই গভীরতম খাদ—একটু অসতর্ক হবা মাত্র পদস্খলনের আশঙ্কা। মানুষ যখন সৌভাগ্যগৌরবে আনন্দ প্রকাশ করছে তখন সেই আনন্দকোলাহলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শনি তার নিশিততম শরে শান দিয়ে তাকে তীক্ষ্ণতর করে তুলতে থাকে—তারপরে ঠিক সুযোগ বুঝে শর এসে আঘাত করে চরম মুহূর্তে—অদৃষ্টের শর প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

মানুষ আর শনিগ্রহে কেন এই আড়াআড়ি কে বলবে? মানুষের সঙ্গে কিসের তার শত্রুতা? কিংবা এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে সে শত্রুর চেয়েও ভীষণতর! শত্রু নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুরের চেয়েও ভীষণ যে নির্মম! শত্রুতা বন্ধুত্বের বিকার। বিকৃত ভালোবাসাই হিংসার আকার ধারণ করে—তাতেও হৃদয়ের সম্পর্ক আছে কেবল সে সম্পর্ক এখন বিষাক্ত। কিন্তু নির্মমের সঙ্গে হৃদয়ের মমত্ববোধ কোথায়? যে শনি গ্রহ আপন কক্ষে ভাসমান—হঠাৎ তার নজর পড়ে মর্ত্যবাসীর ক্ষুদ্র সৌভাগ্যের উপরে—অমনি সে তার অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করে! হিংসায় নয়, কোন উদ্দেশ্য প্রণোদনায় নয়! অকারণে! অকারণে!

ওতেই তার আনন্দ! ওতেই তার উল্লাস! ওই তার বিনোদন—ওই তার খেলা! মানুষ কাঁদে—তার অশ্রুবিন্দুর মুকুরে সে আপন মুখ দেখে হাসতে থাকে—ওই তার স্বভাব! মানুষের বুকফাটা আর্তনাদের সঙ্গে সে তার বীণা মিলিয়ে নিয়ে সঙ্গীতের বিশ্রম্ভ আলাপ চালায়! ওই তার রীতি!

প্রাচীনেরা শনির এই স্বভাবের সংবাদ রাখতেন। গ্রীকরা একেই বলত Irony! আর রামায়ণ, মহাভারত তো শনির নির্মম বিলাসের ধাক্কাতেই সচল হয়ে বহমান। দশরথ পত্নীপ্রেমে বিগলিত হয়ে কৈকেয়ীকে দুটি বরদানের অঙ্গীকার করেছিলেন—সেই দুটি বর রঘুবংশের চরম মুহূর্তে দুটি নিশিত শায়কের মতো এসে পড়ল সৌভাগ্যলগ্নের শিখরদেশে—কে তাদের নিক্ষেপ করেছিল? শনি ছাড়া আর কে?

দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে কৌরব সিংহাসনের দাবি রাখবে না? তাতেই হল সে ভীষ্ম! কিন্তু যে পারিবারিক বিবাদ থেকে সিংহাসন রক্ষা করবার আশায় সে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে বিবাদ কি বন্ধ করতে পারল? শেষ পর্যন্ত সেই সিংহাসনই ভেসে চলে গেল কুরুপাণ্ডবের সম্মিলিত রক্ত-ধারায়! আবার ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বপক্ষকে রক্ষা করবার ইচ্ছায় দ্রোণাচার্যের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে অশ্বত্থামা নামে কুঞ্জর নিহত হয়েছে। যে-অশ্বত্থামার নিধন-সংবাদ গুরুর গোচর করা ছিল তাঁর ইচ্ছা—সেই অশ্বত্থামাই কি নিদ্রিত পাণ্ডব পুত্রগণকে হত্যা করে পাণ্ডবগণকে নির্বংশ করে নি! এ সব শর কার তূণে গুপ্ত ছিল—ওই শনি গ্রহের!

তাই সৌভাগ্যে কখনো উল্লসিত হতে নেই, স্বস্তি অনুভব করতে নেই, কারণ শিখর যেখানে উচ্চতম খাদ যে সেখানেই গভীরতম। তাই সৌভাগ্যকে চোরাই ধনের মতো ভোগ কর, তাই সৌভাগ্যকে গুপ্ত প্রণয়ের মতো উপভোগ কর, তাই সৌভাগ্যোদয়ে নিজেকে নিজে ঠকিয়ে বল তেমন কিছুই পাও নি! এত করেও বাঁচতে পারবে কি না জানি না, কারণ মানুষের প্রতিদ্বন্দীটি একান্তভাবে মানবসম্পর্কবিরহিত—সে নিষ্ঠুরের চেয়েও ভীষণ, সে পরম নির্মম, সে যে হিংসার সন্ন্যাসী। এত করেও বাঁচতে পারবে

কি না জানি না—এই কাহিনীর পাত্রপাত্রীগণ তো পারল না—এই মাত্র জানি।

আজ ডাকু রায়, মোহন, কুসমি আর চাঁপার সৌভাগ্যের উষা—কিন্তু ঘটনা এমনি মোড় ঘুরে গেল যে প্রভাতের আশার আলো সন্ধ্যার অন্তিম শিখায় পরিণত হতে বিলম্ব ঘটল না! কিন্তু একে অপ্রত্যাশিত বলব না, যেহেতু শনির ক্রিয়ার মতো নিশ্চিন্ত ও প্রত্যাশিত আর কি আছে? যে শরটিকে বিশেষ করে সাজিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রক্ষা করেছিল—আজ তাকে নিক্ষেপ করল—আমার পাত্রপাত্রীদের জীবনে। দেউল ধ্বসে পড়ে চূড়ার ত্রিশূল বক্ষে এসে বিঁধল হতভাগ্য আশ্রিতের।

*

নদীর ধারে গাছতলায় একখানা মাদুর বিছিয়ে চাঁপা ঠাকুরানী বসেছে, তার কোলে মাথা রেখে কুসমি শায়িত। চাঁপা আদরে তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কুসমি কোন কথা না বলে মুগ্ধভাবে পড়ে আছে—ভাবছে তার মা থাকলে ঠিক এমনি ভাবেই আদর করত।

চাঁপাও নীরব, সে কী ভাবছে জানি না, হয়তো সুজনি বেঁচে থাকলে আজ ঠিক এমনি বড় হত। মনে মনে নীরবে দুজনের একজনে মাতৃস্পর্শ, আর একজনে সন্তানস্পর্শ অনুভব করছে। চাঁপার মন এখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ—এতদিনের উন্মাদ রোগ একটা প্রকাণ্ড আঘাতের ফলে যেন শান্ত হয়ে গিয়েছে—তার উপরে অতৃপ্ত স্নেহের আকাঙ্ক্ষা কুসমির মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করেছে। এখন তাকে দেখলে বুঝবার উপায় নাই যে জীবনের অনেক বৎসর সে পাগল হয়ে কাটিয়েছে।

ডাকু রায় বজরার মধ্যে ঘুমোচ্ছে—গত দুরাত্রির বিস্মৃত নিদ্রার দেনা সে শোধ করছে। মাঝিরাও একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, আবার সারারাত নৌকা বাইতে হবে।

নদীর তীর থেকে বৈরাগীতলা গ্রাম আধ ক্রোশ পথ হবে। সেখানে প্রতি বছর এই সময়ে বৈরাগীদের একটা মেলা বসে, দূর দুরান্ত থেকে অনেক বৈরাগী আসে। এখন মেলা ভেঙে গিয়েছে, দলে দলে লোক ফিরে চলেছে।

চাঁপা ও কুসমি একান্তে বসে ঘর-মুখো সেই জনতার স্রোত লক্ষ্য করছিল। অধিকাংশ লোকে হেঁটে চলেছে, অবশ্য গোরুর গাড়ির সংখ্যাও কম নয়। যারা মেলায় সওদা বেচতে এসেছিল তাদের অনেকে টাট্টু ঘোড়ায় মাল চাপিয়ে নিয়ে চলেছে—যাদের ঘোড়ার সঙ্গতি নেই তারা কাঁধে মাথায় বোঝা নিয়েছে। এমন সময়ে তারা লক্ষ্য করল জনতাস্রোত থেকে ভ্রষ্ট দুজন প্রৌঢ়া বোষ্টমী খঞ্জনী বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে—

'গগনের পূর্ণিমা চাঁদ নদীয়ায় উদয় গো
তার নাইকো তিথি, নাইকো অস্ত
নাই কভু বিলয় গো।'

শূন্য নদীতীরে, শান্ত দুপুরে, মৃদুগুঞ্জিত সেই গান চাঁপার কানে বড় মধুর শোনাল। গানটা ভালো করে শুনে নেবার আশায় সে ডাক দিল—ও বোষ্টমী, একবার এদিকে এস।

বোষ্টমীরা কাছে এসে দাঁড়াল।

চাঁপা বলল—তোমাদের গানটা বড় মিষ্টি লাগছিল, তাই ডাকলাম। তখন দুজনে গলা মিলিয়ে খঞ্জনী বাজিয়ে সুরু করল—

তার নাইকো তিথি, সেই অতিথি
মনের মাঝে জাগছে নিতি
মনে আছে তাই তো ভুবন
চাঁদের জ্যোৎস্নাময় গো।'

গান শেষ হলে তন্ময় চাঁপা চুপ করে রইল! তখন বোষ্টমীদের একজন শুধাল, ঠাকরুন—ওটি বুঝি তোমার মেয়ে?

চাঁপা চমকে উঠল—নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে বলল—হাঁ মা, ঠিক ধরেছ।

এবারে চাঁপা বলল—তোমাদের বাড়ি কোন গাঁয়ে?

বোষ্টমীরা একসঙ্গে হেসে উঠল, একজন বলল—বোষ্টমের আবার বাড়ি-ঘর আছে নাকি? সব জায়গাই আমাদের নদে শান্তিপুর।

চাঁপা বলল—কিন্তু এক সময়ে তো বাড়িঘর ছিল।

—ছিল বই কি মা! সবই ছিল। ওদের একজন উত্তর করল।

চাঁপা শুধাল—তবে সব ছাড়লে কেন?

—গুরু ডাক দিলেন মা, না ছেড়ে উপায় কি?

চাঁপা বলল—বুঝতে পারছি মা, অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে তবে সংসার ছেড়েছ।

বোষ্টমীদের একজন কথাবার্তা বলছিল—আর একজন এক-আধটা হাঁ, না ছাড়া চুপ করেই ছিল!

সেই কথালু বোষ্টমীটি বলল—রসি না কাটলে কি নৌকা স্রোতে ভাসে! তারপর একটু থেমে বলল—রসি কাটতে গেলে লাগবে বই কি!

চাঁপা শুধাল—কতদিন হল তোমরা ভেক নিয়েছ?

একজন অপরের দিকে তাকিয়ে সময় সম্বন্ধে নীরব সমর্থন জেনে নিয়ে বলল—তা পাঁচ-সাত বৎসর হবে বই কি!

চাঁপা শুধাল—এবারে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ঠিক উত্তর দিও। মনে শান্তি পেয়েছ কি?

পূর্বোক্ত বোষ্টমীটি বলল—মা, কঠিন কথা তুললে। কিন্তু ঠিক উত্তর দেব। সংসারে থাকতে একটা কুকাজ করেছিলাম, কেবল তারই জন্যে মাঝে মাঝে কষ্ট পাই!

চাঁপা বলল—এমন কি কাজ শুনতে পাই না?

বোষ্টমী বলল—বিধবার বিয়ে দিতে সাহায্য করেছিলাম।

এতক্ষণ কুসমি নীরব ছিল—এবার সে খিল খিল করে হেসে উঠল—বলল,—বিধবার নাকি আবার বিয়ে হয়!

চাঁপা বলল, সেটা এমন কি অপরাধ! তোমাদের মধ্যে তো বিধবার বিয়ে হয়েই থাকে।

বোষ্টমী বলল—তখন তো আমরা বোষ্টম হই নি—

চাঁপা শুধায়—তবে এমন কাজ করতে গেলে কেন ?

বোষ্টমী বলে—তখন তো ধর্মজ্ঞান হয় নি মা, গুরুর কৃপাও হয় নি, ভাবলাম তিন বছরের মেয়ে বিধবা হয়েছে বলেই কি সারা জীবন ভুগবে—

চাঁপা বাধা দিয়ে শুধাল—ঐ তিন বছর বয়সেই আবার তার বিয়ে দিলে ?

বোষ্টমী বলল—আমরা বিয়ে দিই নি মা, কেবল সে যে বিধবা এই কথাটা চেপে রেখেছিলাম।

চাঁপা বলে—বেশ তো, মনে যখন খটকা আছে, তার বিয়ে যাতে না হয় তাই কর না কেন।

—পারলে তো করি।

—বাধা কি ?

বোষ্টমী বলে—সে যে এখন কোথায় জানতে পারলে অবশ্যই চেষ্টা করতাম !

বিস্মিত চাঁপা বলে—সে কি তবে তোমাদের কেউ না ?

বোষ্টমী বলে—না গো না।

তখন অপর বোষ্টমী বলল—সই, ওসব কথা থাক না।

পূর্বোক্ত বোষ্টমী চাঁপার উদ্দেশ্যে বলল—সই মেয়েটাকে মানুষ করেছিল—বড় ভালোবাসত, এখন তার কথা উঠে পড়লে ও সহ্য করতে পারে না !

চাঁপা সমবেদনার সঙ্গে বলল—তবে থাক মা ও সব কথা ! পাপপুণ্যের হিসাব যিনি রাখেন তাঁর একচুল এদিক ওদিক হয় না ! আমাদের ওসব কথায় কাজ কি মা !

এবারে কুসমি নীরব বৈষ্ণবীর দিকে তাকিয়ে বলল - বোষ্টমী, তুমি একটা গান কর, শুনি।

সে খঞ্জনী ঠুকে আরম্ভ করল—

পোহাল নবমী নিশি
উমা কাঁদে একা বসি
উঠো না তপন ওরে,
ডুবো না মলিন শশী—

গানের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল—

সে গেয়ে চলল—

তিনটি দিনের তরে
এসেছিল ফিরে ঘরে
তিনটি নিমেষ প্রায়
দিন কটি গেল খসি

তার সুরের মূর্ছনায় জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণ ছল ছল করে উঠল, অদূরে একটা 'চোখ গেল পাখি' দারুণ আর্তনাদ করে উঠল—আর সেই গাছের ছায়ায় উপবিষ্ট কয়টি প্রাণীর মনের মধ্যে বিভিন্নমুখী করুণার প্রবাহ অশ্রুত কলধ্বনিতে বইতে লাগল।

গান শেষ হলে কুসমি শুধাল—বোষ্টমী, তুমি কাঁদছ কেন ?

বোষ্টমী বলল—এখন বুঝবে না মা, বিয়ে হোক তারপরে বুঝতে পারবে, আমার চোখের জলের অর্থ।

তারপরে থেমে বলল—বিয়ে বুঝি হয় নি ? কুসমি নীরবে হাসল।

বোষ্টমী বলল—বুঝেছি, আর দেরি নেই। আহা সুখী হও মা !

কুসমি শুধোল, মেয়েটি বুঝি মারা গিয়েছে ?

বোষ্টমী বলল—তা হলেও বুঝি এত দুঃখ হত না !

—তবে ?

বোষ্টমী বলল—তাকে দিয়ে দিলাম।

—কেন ?

বোষ্টমী বলল—কেন কি ! পেয়েছিলাম একজনের কাছে থেকে—আবার দিয়ে দিতে হল আর-একজনকে !

কুসমি বলল—এতক্ষণ ঐ বোষ্টমী যার কথা বলছিল সেই মেয়েটি বুঝি ?

বোষ্টমী বলল—হাঁ, মা।

তারপর বলল—তিন বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল, ভাবলাম সে কথা গোপন করে দিয়ে দিই। বড় হয়ে বিয়ে করে সুখী হোক।

কুসমি শুধায়—তবে আবার তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন? তার সুখে ছাই দেবার ইচ্ছায়? সে হয়তো এতদিনে ঘরসংসার নিয়ে সুখে আছে—তার সে সুখে আগুন দেবার চেষ্টা কেন?

বোষ্টমী উত্তর না দিয়ে কেবল কপালে হাত ঠেকাল।

এবারে বোষ্টমী চাঁপার দিকে ফিরে শুধাল—হাঁ মা, তোমার মেয়ের বিয়ে কোথায় ঠিক করলে?

চাঁপা সে সম্বন্ধে কিছুই জানত না, কিন্তু কিছু জানি না বললে মাতৃসম্পর্কে শিথিলতা জ্ঞাপন করতে হয়, কাজেই বলল—সব ঠিক হয়েছে, এবারে হবে।

বোষ্টমী শুধাল—বরের কি নাম?

চাঁপার ফিরবার পথ নাই—তাই সে বলে ফেলল—মোহন।

নারীজাতির সহজাত পটুত্বে মোহনের সঙ্গে কুসমির সম্বন্ধটা সে অনুমান করে নিয়েছিল। আর এই অল্প সময়ের মধ্যে কুসমির মুখে মোহন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সে সংগ্রহ করে ফেলেছিল। সে লক্ষ্য করেছিল যে মোহনের প্রসঙ্গ তুলে দিলে কুসমির কথা আর থামতে চায় না। তাতে করে মোহন-সম্পর্কিত সন্দেহটা আরো পাকা হয়েছিল।

বিবাহের প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় চারজন রমণীই একান্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল—অবশ্য কুসমি মনে মনে।

মোহনের বাড়িঘর, ক্ষেতখামার, আত্মীয়পরিজন সকলেরই পরিচয় নেওয়া এবং দেওয়া হল। যেখানে চাঁপার কল্পনা ও অনুমান ব্যর্থ হবার মতো হয়—কুসমি সেখানে তথ্য-প্রমাণ যোগায়।

সব শোনা শেষ হলে বোষ্টমী দুজন সমস্বরে বলে উঠল—আহা, বাছা আমার সুখী হোক।

তারা যখন উঠবার উপক্রম করছে—তখন চাঁপা বলল—তোমরা একবার যেও না আমাদের বাড়ি—

একজন বলল—যাবো বইকি মা, বোষ্টমদের কাজই তো ঘুরে ঘুরে বেড়ানো, কোন গাঁয়ে তোমাদের বাড়ি?

চাঁপা বলল—ধুলোউড়ি।

—ধুলোউড়ি?

নামটি শুনে তারা দুজনে চমকে উঠল।

তাদের ভাব লক্ষ্য করে চাঁপা শুধাল—তোমরা অমন করলে কেন?

একজন বলল—কিছু না মা, শোনা-গাঁয়ের নাম কি না?

আর-একজন বলল—ধুলোউড়ির নাম কে না শুনেছে?

দুজনে বলল—যাবো বইকি মা, একদিন গিয়ে বর-বউকে আশীর্বাদ করে আসব।

এই বলে তারা উঠে পড়ল।

এমন সময় হাই তুলতে তুলতে ভিজে গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে ডাকু রায় নৌকার বাইরে এসে দাঁড়াল, ডাক দিল—মধু, তামাক দিয়ে যা।

বোষ্টমীদের একজন তাকে কিছুক্ষণ ভালো করে দেখে নিয়ে বলে উঠল—রায়মশায় না?

ডাকু তাকে চিনতে পারল না, শুধাল—কে? আমি তো বাপু চিনতে পারলাম না।

বোষ্টমীটি বলল—এখন আর চিনবেন কী করে? বুড়ো হয়ে পড়েছি যে।

এবারে মনে হল ডাকুর পুরাতন স্মৃতিতে কী একটা পরিবর্তন ঘটল—সে বলে উঠল, আরে, এ যে দেখছি সৌদামিনী।

তারপরে বলল—তা বাপু আমার দোষ কি! এ বোষ্টম বেশে তোমাকে চিনব কেমন করে? তারপরে এখানে কোথায়?

সৌদামিনী বলল—বৈরাগীতলার মেলায় এসেছিলাম। তা সব ভালো তো?

এমন সময়ে মধু তামাক নিয়ে এল। হুঁকোতে আচ্ছা করে কয়েকটি টান দিয়ে ডাকু বলল—হাঁ, এক রকম চলে যাচ্ছে!

এবারে সৌদামিনী শুধাল, আমাদের মেয়েটা ভালো আছে তো?

কতদিন মনে করেছি একবার খোঁজ নিই। কিন্তু একে দূরের পথ, তাতে আবার,—

বাক্যটা অসমাপ্ত রেখে আবার শুধাল—ভালো আছে তো ?

ডাকু অপর বোষ্টমীটির পরিচয় জানত না, আর চাঁপাকেও সে চেনে না, কাজেই কোনরকম সন্দেহের অবকাশ তার ছিল না, বিশেষ দীর্ঘদীনের সূত্রে যে মেয়ের প্রতি তার কন্যার অধিকার জন্মে গিয়েছে তাকে যে কেউ আবার ফিরে দাবি করতে পারে—এ আশঙ্কার ছায়াও তার মনে ছিল না—তাই সে হাসতে হাসতে বলল—ভালো আছে কি মন্দ আছে নিজের চোখে দেখ না—ওই তো সে গাছতলাতে বসে।

এই বলে সে পরম নিশ্চিন্ত মনে হুঁকোয় আবার মর্মান্তিক টান দিল।

সম্মুখে বজ্র পড়লেও বোষ্টমীরা বোধ হয় এমন চমকে উঠত না।

সৌদামিনী অপরাকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে উঠল—ও মোতি, ঐ যে আমাদের সুজনি !

মোতি ছুটে গিয়ে কুসমির গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল—ওরে মা রে ! এতদিন কোথায় ছিলি ?

মোতি কাঁদতে লাগল, সৌদামিনী কখন কাঁদে, কখন হাসে।

হঠাৎ কি ঘটল চাঁপা ও কুসমি বুঝতে পারে না ! অবাক হয়ে থাকে ! দ্বিতীয়া বোষ্টমীর সঙ্গে কুসমির কি সম্পর্ক ডাকু অনুমান করতে পারে না !

বিস্ময়ের ধাক্কা কমলে চাঁপা শুধায়—কুসমিকে তোমরা চিনতে নাকি ?

—চিনব ! মোতি কাঁদতে থাকে !

—আমরা চিনব না তো কে চিনবে ! বলে সৌদামিনী কখন পাগলের মতো হাসে, কখনো কাঁদে।

কুসমিকে কোলে টেনে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মোতি বলতে থাকে,—আমার দেখে কেমন সন্দ হয়েছিল এ আমাদের সুজনি না হয়ে যায় না !

সুজনি ! চাঁপার স্মৃতি চমক খায় !

মোতি বলে চলে—একদিন দাদা বিকাল বেলা এতটুকু মেয়েটাকে নিয়ে এনে দিল—বলল, মোতি তোর ছেলেমেয়ে নেই, মেয়েটা তোকে দিলাম, পালন কর!

একটু থেমে, কুসমির কপালে চুম্বন করে আবার বলে—আমি বললাম, দাদা, এ মেয়ে কোথায় পেলে? দাদা হেসে বলে পথে কুড়িয়ে পেয়েছি।

তারপরে নিজের মনেই বলে—এমন ধন নাকি পথে ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া যায়!

আবার শুরু করে—আমি বললাম দাদা, মেয়েটার যে মুখ শুকিয়ে গিয়েছে! দাদা বলল—পথে দুধ কোথায় পাব রে! আর বিলের কাঁধি থেকে তোদের গ্রাম তো সামান্য পথ নয়!

—বিলের কাঁধি। চাঁপার স্মৃতিতে ওলটপালট ঘটে।

সে চীৎকার করে শুধায়—তোমার দাদার কি নাম?

বিস্মিত মোতি বলে—যদু চাকি!

—বিলের কাঁধি! যদু চাকি! ওরে আমার পোড়া কপাল—এই কথাগুলি বলতে বলতে চাঁপার মুখচোখের ভাবে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটল—সে আর কিছু বলতে পারল না, মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল!

এ আবার কোন সম্ভাবনার নূতন সূত্র দেখা দিল কেউ বুঝতে পারে না। তারা চোখে জল ছিটিয়ে, মাথায় হাওয়া করে চাঁপার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল। কেবল কুসমি মনে মনে ভাবতে লাগল—তবে আমিই সেই বিধবা মেয়ে।

এবারে পাঠক এই কাহিনীর পূর্বতন এক পরিচ্ছেদের ঘটনা স্মরণ করলে উপস্থিত পাত্রপাত্রীগণ যে পরিচয়-বিভ্রান্তিতে পড়েছে তা থেকে উদ্ধার পাবেন।

কুসমির পূর্বতন নাম সুজনি। সে চাঁপার সন্তান। পরন্তপের অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার আশায় চাঁপা বিলের কাঁধি গ্রামের যদু চাকি নামে একটি গৃহস্থের হাতে কুসমিকে দান করে। যদু চাকি কুসমিকে দিয়ে আসে তার

বোন মোতিয়ার হাতে। সেখানে তিনবছর বয়সে তার বিবাহ হয়—কয়েক মাস পরেই তার বৈধব্য ঘটে। তখন মোতিয়া তার সই সৌদামিনীর সাহায্যে তাকে দান করে বিপত্নীক ডাকু রায়কে। ডাকু রায় তাকে মাতুল-গৃহে প্রতিপালিত নিজ কন্যা বলে সমাজে চালিয়ে দেয়। এসব তথ্য পাঠকের অজ্ঞাত নয়, যদিচ উপস্থিত পাত্রপাত্রীগণ কেউই ঘটনার সমগ্ররূপ অবগত নয়—সকলেই খণ্ডশ জানে—আর সেই কারণেই বিভ্রান্তিতে পতিত।

সন্ধ্যার পরে চাঁপার মূর্ছা অপগত হল—কিন্তু সে উঠবার চেষ্টামাত্র করল না, মূর্ছিতের মতোই পড়ে রইল। কেবল শারীরিক দুর্বলতা নয়, নিজের অবস্থাটা কী দাঁড়াল ভাববার জন্যেও তার অবকাশ প্রয়োজন—তাই সে উঠবার কোন উদ্যম প্রকাশ করল না। তার মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে কুসমি-ই তার হারানো মেয়ে সুজনি। সে কখনো কখনো সুজনির সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করেছে—কিন্তু যদু চাকির মৃত্যু হওয়ার পরে সুজনির সূত্র একেবারেই লুপ্ত হয়েছিল—সে মনকে কতবার বুঝিয়েছে যে সুজনির মৃত্যু হয়েছে।

কালকে অপ্রত্যাশিত ভাবে কুসমিকে পেয়ে যখন তার মাতৃস্নেহ উদ্বোধিত হল তখন তার কল্পনার এমন দুঃসাহস হয় নি যে কুসমিকে সুজনি বলে মনে করে। সে ভেবেছিল—না হয় এই মেয়েটিকে অবলম্বন করেই মাতৃস্নেহের সার্থকতা হোক। এমন সময়ে অভাবিত সূত্রে সে সুজনিকে পেল। প্রথমে তার মনে হল—তাকে মাতৃপরিচয় দিয়ে দ্বিগুণ আগ্রহে কোলে টেনে নেয়। কিন্তু তখনি মনে হল—অদৃষ্টের ফাঁস ছিন্ন করা এত সহজ নয়। সে বুঝল মাতৃপরিচয় দিতে গেলে পিতৃপরিচয় দিতে হয়। কি পিতৃপরিচয় সে দেবে? সে তো বিবাহ-জাত সন্তান নয়! নিজের কন্যাকে এ পরিচয় দেওয়া কি সম্ভব? একবার মনে হল পরন্তপকে স্বামী বলে পরিচয় দিলেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু তখনি আবার মনে হল, সর্বনাশ! তাতে যে স্বীকার করা হয় পিতা কর্তৃক কন্যা আক্রান্ত হয়েছিল! সে পরখ করে দেখল—অদৃষ্টের তরবারি দুদিকে ধারালো। পিতার পরিচয় না দিলে কন্যা হয় জারজ, আর পিতার

পরিচয় দিলে হয়···কী হয় তা আর সুস্থ মস্তিকে চিন্তা করতে পারল না। তখন সে বুঝল বহুদিনের হারানো কন্যাকে পেয়েও তাকে আপন কন্যা বলে বুকে টেনে নেবার পথে নিদারুণ অদৃষ্ট দুস্তর বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে! তখন সে স্থির করল যত শীঘ্র সম্ভব, প্রথম সুযোগেই তার স্থানত্যাগ করা উচিত, নয়তো কুসমির কাছে থাকলে কোন দুর্বল মুহূর্তে সে কুসমিকে আপন পরিচয় দিয়ে বসবে। নিস্তব্ধভাবে চোখ বুঁজে শুয়ে শুয়ে এই সব চিন্তা করতে লাগল।

অন্ধকারের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে কুসমি ভাবছিল—সে দেখল যে এক মুহূর্তের মধ্যে অদৃষ্টের অস্ত্রাঘাতে তার পূর্বাপর ছিন্ন হয়ে গিয়ে সে শূন্যে ঝুলছে। সে বুঝল—ডাকু রায় তার পিতা নয়, ক্ষান্তবুড়ি তার ঠাকুরমা নয়! সে বুঝল কে তার পিতা, কে তার মাতা কেউ জানে না! সে বুঝল চাঁপাঠাকুরানীর কোলে তুলে দিয়ে একমুহূর্তের জন্য অদৃষ্ট তাকে মাতৃস্নেহের স্পর্শ দিয়ে পরমুহূর্তেই তা কেড়ে নিল—শূন্যতাকে দ্বিগুণ শূন্য করে দিল। আর সবচেয়ে বেশি করে বুঝল—সে বিধবা! সে বুঝল তার অতীত যেমন অজ্ঞাত, তার ভবিষ্যৎ তেমনি নিশ্চিত! মোহনের কথা মনে পড়ে, মোহনের ভালোবাসা মনে পড়ে, মোহনের বিদায়কালীন সেই আগ্রহাতুর মুখখানি মনে পড়ে দুই চোখ দিয়ে ধারাবাহী জল পড়তে লাগল।

সোদামিনী ও মোতির মনের অবস্থাও অনুরূপ। অল্পক্ষণের পরিচয়েই তাদের নারীহৃদয় কুসমিকে ভালোবেসে ফেলেছিল—কিন্তু অদৃষ্ট তাদের হাত দিয়ে কুসমিকে কি আঘাতই না করল—তাকে একেবারে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ল। তারা এমনি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল যে কুসমির কাছে ঘেঁসতে আর সাহস করল না—অদূরে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে জড়বৎ বসে রইল!

ডাকু রায় ভাবছিল—এ কি গেরো! আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে দেব—

তার মধ্যে একি হাঙ্গামা উপস্থিত। সে জানত কুসমি তার কন্যা নয়—কাজেই এদিক দিয়ে তার বিচলিত হবার সম্ভাবনা ছিল না, বিশেষ কুসমিকে কন্যা বলে দাবি করবার লোক যখন কেউ নেই, তখন তার আর চিন্তার কি? তবে সে শৈশবেই নাকি বিধবা হয়েছিল। কথাটাকে ডাকু ভালো করে আমল দিল না। কোথাকার ছুটো বোষ্টমী এসে এক আষাঢ়ে গল্প বলে গেল—তাকেই কি অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করতে হবে। সে স্থির করল গাঁয়ে ফিরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কুসমির বিয়ে দিয়ে ফেলবে! এখন বোষ্টমী ছুটো সরলে বাঁচা যায়! চাঁপার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ তার মনে প্রবেশ করে নি। ডাকু ভাবল—ভোর হবার আগেই নৌকা ছেড়ে দেবে।

জ্যৈষ্ঠের গুমোটবাঁধা রাত্রি ঘনীভূত হয়ে এল। পাঁচটি প্রাণী মূঢ়ের মতো গাছতলায় নীরবে বসে রইল—কারো মুখে কথা নেই। শেষরাতে মেঘের উৎকট গর্জনে সবাই চকিত হয়ে জেগে উঠল—কখন অজ্ঞাতসারে তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল, সবাই দেখল চাঁপার স্থান শূন্য। কোথায় গেল সে? কাছাকাছি সন্ধান করা হল—তাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

তখন ডাকু বলল—আমি তো অপেক্ষা করতে পারি না।

সৌদামিনী বলল—রায় মশায়, আপনি এগোন, আমরা যদি তার সন্ধান পাই, আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

সৌদামিনীর কথায় ডাকু পালাবার পথ পেল। সৌদামিনীও পালাবার পথ খুঁজছিল—এই উপায়ে ছুপক্ষের কাজই সহজ হয়ে গেল।

কুসমিকে নিয়ে ডাকু নৌকায় গিয়ে চড়ল। বিদায়ের সময় সৌদামিনী আর মোতি তার সঙ্গে একটিও কথা বলবার সাহস পেল না। কুসমিও কোন উৎসাহ দেখাল না।

নৌকা ছেড়ে দিলে ডাকু বলল,—মা এবার ঘুমিয়ে নে! বোষ্টমীদের আষাঢ়ে গল্পে বিশ্বাস করিসনে।

কুসমি শয়ন করল—কিন্তু তার কি ঘুম আসতে পারে! জলের কলধ্বনির সঙ্গে তান মিলিয়ে তার চোখের জল ঝরতে লাগল—তার বুক ভেসে গেল।

মোহন ভাবিতেছে পথ আর শেষ হইতে চায় না। সে বারবার মাঝিদের তাগিদ দিতেছে, ও রহিম, ও করিম—আরও একটু জোরে ভাই।

কখনো বা নিজেই একখানা বৈঠা লইয়া বসে, আবার কিছুক্ষণ পরে বৈঠা ছাড়িয়া হালে গিয়া বসে—কিন্তু পথ যেন আজ মোহনের সঙ্গে আড়ি করিয়া বসিয়াছে।

—ওটা কোন গাঁ ভাই।

—রহমৎপুর!

—এতক্ষণে! আমি তো ভেবেছিলাম ওটা নিয়ামৎপুব! নাঃ, আজ তোদের কি হল?

আবার সে বৈঠা লইয়া বসে।

অবশেষে সে এক জায়গায় ছিপ ভিড়াইয়া নামিয়া পড়িল, বলিল—আমি হেঁটে রওনা হলাম, তোরা ছিপ নিয়ে আয়।

এই বলিয়া সে ধুলোউড়ির দিকে রওনা হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ চলিবার পরে তার মনে হইল আজ জলস্থল সমস্তই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। স্থলপথকে তার অনাবশ্যক দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল। পথ যতই অফুরন্ত মনে হয়—ততই দ্রুত সে চলিতে থাকে। সে ভাবিতেছে কতক্ষণে সে গ্রামে পৌছিবে, কতক্ষণে সে বন্ধু-বান্ধবদের সুসংবাদটা দান করিবে। কেবল বন্ধু-বান্ধবকে বলিলে চলিবে না, ক্ষান্তবুড়িকেও কথাটা জানাইতে হইবে। অবশ্য তার বাবাকে নিজে জানানো সম্ভব নয়, তবে তার ভরসা ছিল বন্ধুদের মুখ হইতে কথাটা গড়াইয়া মাধব পালের কানে পৌছিবে। সে জানিত মাধব পাল বিবাহে আপত্তি করিবে না।

অবশেষে সত্য সত্যই পথ ফুরাইল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে গ্রামে প্রবেশ করিল। বিলের বিপরীত দিক হইতে সে গ্রামে

ঢুকিয়াছিল, কাজেই বিলের অবস্থা জানিতে পারিল না। নিজের বাড়িতে যাইবার আগে সে ডাকু রায়ের বাড়িতে যাওয়া স্থির করিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের এই সময়টাতে ধুলোউড়ি হইতে ছোট ধুলোড়িতে হাঁটিয়া যাওয়া চলে। সে দেখিল মাঝখানে জল আসিয়া পড়িয়াছে। সে যদি আজ প্রকৃতিস্থ থাকিত তবে এই অপ্রত্যাশিত কাণ্ডে বিস্ময়বোধ করিত। কিন্তু তার মন আজ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। সে একখানা নৌকা টানিয়া লইয়া ছোট ধুলোড়িতে গিয়া উঠিল এবং ছুটিতে ছুটিতে একেবারে ডাকু রায়ের বাড়িতে অন্দরমহলে গিয়া উপস্থিত হইল।

সে দেখিল ঘরের রোয়াকে একখানা মাদুরের উপরে শুইয়া ক্ষান্তবুড়ি হাঁপাইতেছে! তাহাকে দেখিবামাত্র ক্ষান্তবুড়ি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল – ও বাবা মোহন, আমার কুসমি মাকে কোথায় রেখে এলি।

ডাকু ও মোহনের পরন্তপকে অনুসরণ করিবার সংবাদ একজন মাঝি আসিয়া ক্ষান্তবুড়িকে জানাইয়াছিল। সেই সংবাদ পাইবার পর হইতে ক্ষান্ত-বুড়ি শয্যাগ্রহণ করিয়াছিল, মোহন অপ্রকৃতিস্থ ছিল বলিয়াই বুঝিতে পারিল না যে বার্ধক্যের সহিত উদ্বেগ মিলিত হইয়া ক্ষান্তবুড়িকে প্রায় অন্তিম অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

তাহার উদ্বেগাকুল প্রশ্নের উত্তরে মোহন জানাইল—ঠাকুরমা, কুসমিকে নিয়ে রায়মশায় ফিরছেন। তোমাকে সংবাদ দেবার জন্যে আমাকে আগে পাঠিয়ে দিলেন।

মুমূর্ষুর ঘোলা চোখে একবার আশ্বাসের আলো দেখা দিল—সে বলিল—আবার বল বাবা।

মোহন বলিল—রায়মশায় কুসমিকে নিয়ে রওনা হয়েছেন। তোমাকে সংবাদ দেব বলে আমি আগে এলাম।

বৃদ্ধা বলিল—বাবা, বেঁচে থাক।

তারপরে বলিল – বোধ হয় কুসমির বিয়ে দেখে যেতে পারলাম না।

এই পর্যন্ত বলিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

মোহন বলিল—রায়মশায় বললেন যে ফিরেই কুসমির বিয়ে দেবেন।

বৃদ্ধা শুধাইল—কার সঙ্গে বাবা?

মোহন বলিল—ঠাকুরমা, ঘটক ঠাকুর যখন হাজির নেই, তখন নিজেকেই বলতে হল—রায়মশায় জেদ ধরেছেন আমাকেই বিয়ে করতে হবে।

বৃদ্ধার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে বলিল—বাবা, এতদিনে বুঝি খোকার সুবুদ্ধি হল। কুসমির যে এত সৌভাগ্য হবে তা ভাবি নি!

আবার একটু দম লইয়া বলিল—কুসমি বড় ভালো মেয়ে। তোমার কোন কষ্ট হবে না।

থামিল, আবার আরম্ভ করিল—আমি শুনেছি তুমি না থাকলে এই বিপদ থেকে কুসমিকে কেউ রক্ষা করতে পারত না! বেঁচে থাক, বাবা, বেঁচে থাক।

তারপরে সে আপন মনেই বলিয়া চলিল—তুমি আসবার আগে ঘুমের ঘোরে আমি দেখছিলাম যে কুসমি আমার চেলি পরে সিঁথেয় সিঁদুর পরে বিয়ে করতে চলেছে···বর এল···তোমাকে চিনতে পারি নি বাবা।

এই বলিয়া ম্লান হাসি হাসিল।

তখন কুসমির আসন্ন বিবাহ সম্বন্ধে বৃদ্ধা কত কি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিল। সে কোন চেলিখানা পরিবে? তার খানা না নিজের মায়ের খানা! কোন কোন অলঙ্কার কুসমির জন্য সঞ্চিত আছে বলিল। আর বলিল বিবাহদিনের জন্য কামাখ্যার সিঁদুর অতি যত্নে সে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা পরিলে কুসমিকে কেমন মানাইবে! বৃদ্ধা জানাইল কামাখ্যার সিঁদুর যে মেয়ে পরে সে বিধবা হয় না! এই সব বর্ণনায় মোহনের মন রঙীন হইয়া উঠিল!

ঠিক সেই সময়ে মুছিয়া-যাওয়া সিঁথির সিঁদুর স্মরণ করিয়া, একাকী নৌকার মধ্যে পড়িয়া কুসমি কাঁদিয়া বক্ষস্থল ভাসাইয়া দিতেছিল।

মোহন বিদায় লইয়া উঠিয়া পড়িল। শেষরাত্রে ক্ষান্তবুড়ি প্রাণত্যাগ করিল।

*

বিষম কোলাহলে খুব ভোরবেলা মোহনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইল জনতার স্রোত চলিয়াছে—তাহাদের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব, মুখে তাহাদের ভয় ও নৈরাশ্যের ছাপ। সে দেখিল জনতার মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক সব বয়সের লোক রহিয়াছে—সমর্থ পুরুষ মানুষেরও অভাব নাই। শিশুরা মায়ের কোলে-কাঁখে, যাহারা কেবল হাঁটিতে শিখিয়াছে জননী বা বয়স্কাগণ তাহাদের কোন রকমে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। বালক বালিকা হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেরই হাতে কিছু না কিছু ঘরকরনার সরঞ্জাম। সমর্থ পুরুষেরা মাথায় পিঠে যেখানে পারিয়াছে ছোট বড় নানা আকারের বোঝা লইয়াছে। বাক্স, পেঁটরা, বিছানা, হাঁড়ি-কুড়ি, ধামা-কাঠা, মাদুর, কুলা যে যাহা পারিয়াছে বহন করিতেছে। মাঝে মাঝে দু-চারখানা গোরুর গাড়ি মাল বোঝাই হইয়া পর্বতপ্রমাণ হইয়াছে—গাড়িতে ঢেঁকি হইতে তক্তাপোশ, চাল ডাল বোঝাই ছালা, পথ চলিতে অসমর্থ বৃদ্ধা বা রোগী—কী না আছে! মোহন বুঝিতে পারিল না—ইহারা কোথা হইতে আসিতেছে—কেন তাহাদের এই লক্ষ্মীছাড়া ভাব।

সে একজনকে শুধাইল—তোমরা কোথায় চললে!

সে কোন কথা না বলিয়া কপালে একবার হাত ঠেকাইল।

সে আর-একজনকে শুধাইল—তোমরা কোথা থেকে আসছে?

সে কোন কথা না বলিয়া আঙুল দিয়া পিছনের দিকে নির্দেশ করিল।

অবশেষে সে একজন চেনা লোক পাইয়া শুধাইল—কেদার ভাই—এ কি দেখছি।

কেদার বলল—অদৃষ্ট! অদৃষ্ট!

আর কোন কথা বলিবার অবকাশ তাহার হইল না, সে দ্রুত চলিয়া গেল।

কাহারো কাছে প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া সমস্যা সমাধানের আশায় সে জনতার বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করিল—সে দেখিল জনতার স্রোতের আর শেষ নাই।

দ্রুতপদে কিছুক্ষণ চলিবার পরে সে কুঠিবাড়ির নিকটে আসিয়া পৌঁছিল এবং এক নিমেষেই প্রশ্নের উত্তর পাইল। বিলের দিকে তাকাইয়া সে দেখিতে পাইল—যতদূর দেখা যায় দেখিতে পাইল—বিলের কালো জলরাশি বিস্তারিত হইয়া গিয়াছে। সে আরও দেখিল প্রথম দুটা বাঁধের চিহ্নমাত্রও নাই—অবিরল জলরাশি আসিয়া প্রথম বাঁধটার,—সেটাই মূল বাঁধ,—উপরে আসিয়া প্রহত হইতেছে। কাল রাতের বেলায় অন্ধকারে সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই, বিশেষ তখন সে প্রকৃতিস্থ ছিল না বলিলেই চলে।

নূতন জোড়াদীঘির দিকে তাকাইয়া সে দেখিল গ্রাম পরিত্যক্তপ্রায়, যাহারা এখনো আছে তাহারা পালাইবার উদ্যোগ করিতেছে—সে বুঝিল বিলের আসন্ন আক্রমণ হইতে ধনপ্রাণ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যেই জনতা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছে। সে আর কালব্যয় না করিয়া নূতন জোড়াদীঘির দিকে চলিল। যতই সে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই সমস্যার বিরাটত্ব এবং গুরুত্ব বুঝিতে পারিল। সে দেখিল কৃষিক্ষেত্র জনহীন, কোথাও একটা গোরু-বাছুর পর্যন্ত নাই। জলিধান তখনো পাকে নাই কেবল শিষ দেখা দিয়াছিল, আর কয়েকদিন সময় পাইলেই পাকিত, লোকে তাহাই কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। কোনখানে কাটা ধান স্তূপ হইয়া পড়িয়া আছে, লইবার সুযোগ হয় নাই, কোন কোন ক্ষেতে ধান কাটিবার চেষ্টা পর্যন্ত হয় নাই, কৃষক আগেই পালাইয়াছে। সে আরও অগ্রসর হইয়া দেখিল অনেকগুলি কুটীরের বেড়া দণ্ডায়মান, চাল কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থানে চাল কাটিয়া নামানো হইতেছে, কোন কোন বাড়ির সম্মুখে স্তূপীকৃত জিনিসপত্র অবিন্যস্তভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—গৃহস্বামী হয় পালাইয়াছে, নয় গোরুর গাড়ির সন্ধানে গিয়াছে। কেহ তাহার কথার উত্তর দিল না, কেহ তাহাকে দেখিয়াও দেখিল না, সকলেই অদৃষ্টের আঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত, মানুষের প্রতি মনোযোগ দিবার সময় তাহাদের নাই। শত্রুসৈন্যের আকস্মিক আবির্ভাবে নিরীহ জনপদের যে ভাব হয়—সমস্ত গ্রামটিতে তাহারই ছবি। বিলের ভয়ে মানুষ পলাতক। মোহন বুঝিল ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে—যেহেতু একটা

মাত্র বাঁধ সর্বনাশ ও জনপদের মধ্যে বিরাজমান। সেটা ভাঙিলে আর কাহারো রক্ষা থাকিবে না। সেটার কি অবস্থা দেখিবার উদ্দেশ্যে সে রওনা হইল। একটু অগ্রসর হইতেই বিলের দিক হইতে একটা চাপা গর্জন সে শুনিতে পাইল—সে বুঝিল এ গর্জন বিলের স্বভাবসিদ্ধ নয়, বিল তো বোবা! বুঝিতে পারিল যমুনার অকাল জোয়ার দুর্দাম বেগে আসিয়া পড়িয়াছে। ভাবিল, এখন এই বাঁধটা রক্ষা পাইলে হয়। বাঁধের কাছে পৌছিয়া দেখিতে পাইল সর্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত সেই মাটির শির-দাঁড়ার উপরে দুর্ভাগ্যের সেনাপতির মতো বিলের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ দর্পনারায়ণ একাকী দণ্ডায়মান!

মোহন ছুটিয়া গিয়া দর্পনারায়ণের পাশে দাঁড়াইল।

দর্পনারায়ণ শান্তভাবে বলিল—মোহন তুই এসেছিস!

তাহার কণ্ঠস্বর উদ্বেগহীন। মনে মনে যে ব্যক্তি সর্বনাশকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহার তো উদ্বিগ্ন হইবার কথা নয়।

তারপরে বলিল—তোর কথাই ভাবছিলাম।

মোহন বলিল—বাঁধ তো রক্ষা করতে হয়।

দর্পনারায়ণ বলিল—রক্ষা করতে হবে বইকি।

—কিন্তু সবাই যে পালাচ্ছে।

দর্পনারায়ণ বলিল—গাঁয়ের লোক! না, তাদের দিয়ে এ কাজ হবে না। আর তা ছাড়া তাদের আর বলবই বা কোন মুখে? বাঁধ ভাঙবে না বলে আমার কথার উপরে বিশ্বাস করেই তারা এখানে এসে ঘর তুলেছিল, ক্ষেত খামার করেছিল! আজ আবার তাদের বাঁধরক্ষা করবার অনুরোধ করতে গেলে আমার কথা শুনবে কেন?

একটু থামিয়া বলল—না, তাদের দিয়ে হবে না। বিশেষ সবাই এখন পালাতে ব্যস্ত।

মোহন শুধাইল—নবীন আর করিমও পালিয়েছে নাকি? তাদের দেখলাম না।

দর্পনারায়ণ বলিল—না, পালায় নি। তারা আছে, মুকুন্দ আছে আর তুই আছিস!

—তবে ওরা কোথায়?

দর্পনারায়ণ বলে—নবীনকে পশ্চিমে আর করিমকে উত্তরে পাঠিয়েছি।

মোহন বুঝিতে না পারিয়া শুধায়—কেন?

দর্পনারায়ণ বলে—যমুনার বান যতই প্রবল হোক, তার আক্রমণ থেকে বাঁধ রক্ষা করতে পারা যাবে। কিন্তু এর উপরে যদি বড়ল নদী দিয়ে পদ্মার বান আর আত্রাই নদী দিয়ে বান এসে উপস্থিত হয় তবে আর কিছু করবার উপায় থাকবে না।

মোহন বলিল—কিন্তু পদ্মার ঘোলা আসবার তো সময় হয় নি, আর আত্রাইর বান আসবার তো অনেক দেরি।

দর্পনারায়ণ বলিল—কিন্তু যমুনার বান আসবার সময়ও তো এটা নয়—আর এমন অকস্মাৎ আসাও তো তার স্বভাব নয়!

তারপরে বলিল—তাই নবীনকে পাঠিয়েছি বড়ল নদীর দিকে, করিমকে আত্রাই নদীর দিকে, সেখানকার জলের অবস্থা দেখে তারা ফিরে এসে খবর দেবে।

—আর মুকুন্দ-দা।

—সে গিয়েছে ইসলামপুরে, মজুর আনবার উদ্দেশ্যে।

—বাঁধরক্ষা করবার জন্যে?

দর্পনারায়ণ মাথা নাড়িয়া সমর্থন জ্ঞাপন করিল।

সে বলিল—চল, একবার বাঁধটার অবস্থা দেখে আসি।

বাঁধটা তিন-চার শ গজ দীর্ঘ। উপরে দু-তিন জন মানুষ পাশাপাশি হাঁটিয়া যাইতে পারে—নীচেটা আরও অনেক চওড়া, দু-মানুষ উঁচু হবে। কিছু দূর গিয়া তাহারা দেখিতে পাইল একজায়গায় অনেকটা মাটি ধ্বসিয়া

পড়িয়াছে—এমনতরো সঙ্কটের স্থান আরও দুই-তিনটি তাহাদের চোখে পড়িল।

দর্পনারায়ণ বলিল—মোহন, এই জায়গা কটাই বিপদের। সন্ধ্যার আগে যদি এগুলো মেরামত করা সম্ভব হয়, তবে বাঁধ রক্ষা হবে।

তারপরে বলিল—রাতেই বেলাতেই জল বাড়ে।

তখন বেলা প্রায় প্রহরাতীত, দুজনে বাঁধের উপর হইতে দূরে তাকাইয়া বিলের যে মূর্তি দেখিল ইহার আগে তেমন আর কখনো দেখে নাই। যতদূর দেখা যায় একখানা কালো জলের প্রকাণ্ড চাদর যেন বিস্তারিত, আর অদৃশ্য কোন শক্তির তালে তালে সমস্ত চাদরখানা যেন ফুলিয়া ফুলিয়া, ঠেলিয়া ঠেলিয়া, পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে। চাদর যেখানে আকাশ পানে ঠেলিয়া উঠিতেছে. সেখানে পরস্পর হইতে সমান দূরে সুদীর্ঘ সরল রেখায় ঢেউভাঙা শাদা ফেনার দাগ; দুই রেখার মাঝখানের কালো জল রৌদ্রে চিকচিক করিয়া কাঁপিতেছে; কোথাও আর কিছু দৃষ্ট হয় না। এখানে ওখানে যে সব গ্রামের টুকরা ছিল কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র নাই—বিলের পরিব্যাপ্ত দেহের কোথাও মনুষ্যসম্পর্কিত কোন চিহ্ন নাই—একখানা নৌকা পর্যন্ত নয়। আকাশে বিক্ষিপ্ত মেঘ, উড্ডীয়মান পাখি আর নির্মল, প্রখর, বাষ্পলেশহীন সূর্যকিরণ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করিয়া আছে বন্যার অবিরাম, অবিরল একটানা গর্জন, তার স্বরগ্রামে কোথাও ছেদ নাই, কোথাও উত্থান-পতন নাই, আর আছে দুরন্ত পুবে হাওয়া! পুবে হাওয়ার বাহনে বন্যার গর্জন! অশরীরী বাহনে অশরীরী আরোহী! অল্পক্ষণেই মানুষের মন অভিভূত করিয়া ফেলে।

এমন সময়ে তাহারা কোলাহল শুনিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিল জন পঁচিশ-ত্রিশ লোক ঝুড়ি কোদাল হাতে আসিতেছে, তাহাদের আগে আগে মুকুন্দ।

কাছে আসিয়া মুকুন্দ বলিয়া উঠিল—এই নাও দাদাবাবু, আর ভয় নেই।

তারপরে জনতার দিকে তাকাইয়া বলিল—নাও বাপসব, এবার

ঝপাঝপ মাটি কেটে বাঁধটাকে ঠেকাও তো! দেখি বেটা বানের কত তোড়!

জনতার মধ্যে মুরুব্বিগোছের একজন বাঁধের উপরে উঠিয়া বানের অবস্থা দেখিয়া মুকুন্দকে বলিল—ও মুকুন্দদাদা, এ যে রুগীর শ্বাস উঠবার পরে বদ্যি ডাকলে।

মুকুন্দ বলিল—বড় বদ্যি আগে ডাকতে কি ভরসা হয়?

তারপরে বলিল—নাও, নাও, আর দেরি নয়। ঝপাঝপ আরম্ভ করে দাও।

দর্পনারায়ণ মুকুন্দকে বলিল—এই দুটো জায়গায় মাটি ফেলতে লাগিয়ে দাও। সন্ধ্যা হবার আগে মজবুত হওয়া চাই।

তখন মুকুন্দর নির্দেশে মজুরের দল মাটি কাটিয়া কম-জোরি জায়গায় ফেলিতে লাগিল।

দর্পনারায়ণ মোহনকে ডাকিয়া বলিল—তোর কাজ বলে দিই—বাঁধ তদারকের ভার তোর উপরে রইল। যেখানে দেখবি ঢেউয়ের বাড়াবাড়ি, মাটি ধ্বসতে শুরু করেছে, সেখানে মজুর লাগিয়ে দিবি।

মোহন বাঁধ তদারকে প্রবৃত্ত হইল। আর অস্নাত, অনাহারী দর্পনারায়ণ পৃষ্ঠদেশে দুই বাহু সংবদ্ধ করিয়া একান্তে বিলের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝোড়ো বাতাসে তাহার চুল উড়িতে লাগিল। তাহার সেই অটল স্থাণু মূর্তিকে টলাইতে পারে এমন সাধ্য সে বিলের নাই, সে বানের নাই, হিমালয়ের সমস্ত তুষার গলিয়া ছুটিয়া আসিলেও যেন তাহাকে নড়াইতে পারিবে না।

সন্ধ্যা আসন্ন হইল। বাঁধের কম-জোরি স্থান দুটা মজবুত হইয়াছে বটে—কিন্তু বাঁধের স্থায়িত্বের প্রতি কাহারো মনে আর তেমন ভরসা নাই। কারণ জল বাড়িতেছে। সকালবেলা জল বাঁধের গোড়ায় ছিল—সন্ধ্যাবেলা জল বাঁধের কোমর অবধি উঠিয়াছে। জল বাড়িয়াই চলিয়াছে, ঝোড়ো বাতাস ঝড়ে পরিণত হইয়াছে—আকাশ ছিন্নভিন্ন মেঘে পূর্ণ—বিদ্যুতের অগ্নিময় সূত্র

সেইসব ছিন্ন টুকরাকে শক্ত করিয়া গাঁথিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে।

অটল সঙ্কল্পে দর্পনারায়ণের স্থাণুমূর্তি বিলের স্পর্ধিত আহ্বানের সম্মুখে আপনাকে স্থাপিত করিয়াছে। সে কী ভাবিতেছে জানি না। বোধ করি সে নিজের জীবনের পূর্বাপর চিন্তা করিতেছিল। যে-ব্যথার চিহ্নবহ্নি মুহুর্মুহু তাহার অন্তরে চমক মারিতেছিল, যাহার তুলনায় আকাশের বহ্নিশলাকা নিতান্তই ম্লান, সেই পরম অগ্নিময় আভাতে তাহার পূর্বস্মৃতির ক্ষীণ দিগ্‌বলয় আজ প্রোজ্জ্বল প্রভাময় হইয়া উঠিয়াছিল। সে বুঝিয়া লইয়াছিল বোঝা-পড়ার চরম মুহূর্ত আজ সমাগত। সে আরও বুঝিয়াছিল—ইহার পরিণাম মাত্র একটিই হইতে পারে, তাহার পরাজয় অনিবার্য, অনিবার্য এবং আসন্ন। কিন্তু তাহাতে কি তাহার মনে দুঃখ ছিল! দুর্ভাগ্যের আঘাতের পরে আঘাতে তাহার সমস্ত জীবনটাই ধ্বসিয়া পড়িয়াছে—এখন এই সামান্য বাঁধটা ধ্বসিয়া গেলে এমন আর কি বেশি ক্ষতি হইবে? এমনি কত কি কথা সে ভাবিতেছিল। এই সময় আকাশের পূর্বতন প্রান্তে একটা সুগম্ভীর মেঘগর্জন শ্রুত হইল, আর ধ্বনিপ্রতিধ্বনিপরম্পরায় তাহার চূড়া আসিয়া দর্পনারায়ণের কাছে পৌঁছিল। সে ধ্বনি এমনি গম্ভীর, এমনি নিরেট যেন শব্দমাত্র নয়, যেন শব্দের কুতুবমিনার, স্তরে স্তরে মহাশূন্যের দিকে উন্নীত হইয়া গিয়াছে। দর্পনারায়ণের অভিজ্ঞ অন্তর বুঝিতে পারিল—এ শব্দ আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রারম্ভি ঘোষণার পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ! সে চমকিয়া উঠিল—যেখানে মশালের আলোতে মাটি ফেলা চলিতেছিল সেখানে আসিয়া শুধাইল—মোহন, নবীন আর করিম ফিরল কি?

মোহন বলিল—না, দাদাবাবু তারা এখনো ফেরে নি।

কালরাত্রি প্রভাত হইল—কিন্তু এ কি রকম প্রভাত! দিনের আলোকে যেন একটা বিরাট অজগরে গ্রাস করিয়াছে—তাহাকে অনুমান করা যায় কিন্তু

চোখে পড়ে না। সারা আকাশ ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে পূর্ণ, দিবান্ধকারের সুযোগে বিদ্যুৎ মার্জিত পিত্তলের বর্ণ বিকাশ করিতেছে—মেঘে বিদ্যুতে ভ্রূকুটি-কন্না আকাশ কোনো এক অতিকায় দৈত্যের বেদনাবিকৃত মুখমণ্ডলের ন্যায় ভীষণ। শিকল-ছেঁড়া পুবে হাওয়ায় ভর করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হু হু করিয়া আসিয়া পড়ে—ক্ষণেক পরেই আবার নাই। আর নীচে যতদূর দেখা যায় কালো জল, অন্ধকারে এমন ঘন কালো, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়া বাসুকির হাজার ফণার মতো বাঁধের উপরে ছলাত ছলাত ছোবল মারিতেছে, বাঁধ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে, মাটি ধ্বসিয়া ধ্বসিয়া পড়ে। বহু মৃত নদনদীর পঞ্চমুণ্ডী আসনে চলনবিল সমাধিতে বসিয়াছিল, তাহার সমাধিভঙ্গের উদ্দেশ্যে প্রকৃতি বিভীষিকারূপিণী হইয়া সমাগত, তাহার সমাধি এখনো ভাঙে নাই, তবে ইতিমধ্যেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আকাশজোড়া কালো অজগরের পেটের মধ্যে সূর্যের ম্লান গোলকটা ক্রমেই তলাইয়া যাইতেছে—সেই মুমূর্ষু আলোর অন্তিম আর্তধ্বনির মতো এক-একবার কাকের দল চীৎকার করিয়া ওঠে, শালিক, চড়ুই, কোকিল, পাপিয়া আজ নিস্তব্ধ!

আকণ্ঠনিমজ্জিত বাঁধের উপরে দর্পনারায়ণ, মোহন ও মুকুন্দ। দর্পনারায়ণ ছাড়া আর সকলেই বাঁধরক্ষার আশা ছাড়িয়া দিয়াছে! কাল সারারাত্রি মজুরেরা মশালের আলোকে মাটি কাটিয়াছে। এক জায়গায় ফাটল দেখা দেয়—সকলে ছুটিয়া গিয়া সেখানে মাটি ফেলে। সেখানটা মজবুত হইবামাত্র অন্যত্র হইতে ফাটল ধরিবার সংবাদ আসে—সকলে সেখানে ছুটিয়া যায়। এই ভাবে সারা রাত্রি চলিয়াছে—মানুষে বিলে সময়ের প্রতিযোগিতা। সবাই ভাবে ফাটল না হয় মেরামত হইল—কিন্তু জল বাড়িয়া যে বাঁধ ডুবিবার উপক্রম—তাহার উপায় কি? এত অল্প সময়ে বাঁধ তো উঁচু করা সম্ভব নয়। সকলে বুঝিল, দর্পনারায়ণ ছাড়া আর সকলে, যে বাঁধ না ভাঙিলেও গ্রাম রক্ষা করা অসম্ভব—বাঁধ উপছাইয়া বানের জল এদিকে প্রবেশ করিবে। কিন্তু দর্পনারায়ণ এসব যুক্তিতে কর্ণপাত করিতে চায় না। মজুরেরা হতাশ হইয়া

ঝুড়ি-কোদাল রাখিয়া দিলে দর্পনারায়ণ আসিয়া কোদাল ধরে। তখন আবার সকলকে কোদাল ধরিতে হয়।

সন্ধ্যাল বেলায় ক্লান্ত হইয়া সকলে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিতেছে—তাহাদের আশা ছিল জল আর বাড়িবে না, ভোর হইলে অবস্থার উন্নতি হইবে। কিন্তু সকাল বেলায় আকাশের মুখে আশার কোন লক্ষণ দেখা গেল না—মিত্র শত্রু হইয়া উঠিলে যেরূপ ভীষণ হয়, ভোরের জগৎ তেমনি ভয়ঙ্কর।

মোহন দর্পনারায়ণের কাছে গিয়া বলিল—দাদাবাবু, চেষ্টা তো করা গেল, এবারে চল যাই।

দর্পনারায়ণ যেন তাহার প্রস্তাব বুঝিতে পারিল না, শুধাইল—কোথায়?

মোহন বলিল—কুঠিবাড়িতে ফিরে চল।

—কেন?

—বাঁধ তো গেল!

দর্পনারায়ণ বলিল—যাবে কেন? এই তো রয়েছে।

মোহন বলিল—এ তো গেল বলে।

দর্পনারায়ণ সবেগে বলিল—না, না, সে হবে না।

তারপর থামিয়া বলিল—নবীন করিম ফিরে না এলে নিশ্চয় করে বলা যায় না যে বাঁধ যাবেই।

তারপরে গম্ভীরভাবে বলিল—তোরা ভয় পেয়েছিস, ফিরে যা, আমি শেষ পর্যন্ত এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব।

মোহন বলিল—তাতে যে প্রাণের ভয় আছে।

মোহনের কোন উত্তর দর্পনারায়ণ দিল না—কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিল। মোহন তাহার সেরূপ দৃষ্টি কখনো দেখে নাই। সে ভীত সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া আসিল।

মোহনের নির্দেশে মজুরেরা আবার মাটি কাটিতে লাগিল।

মুকুন্দ একান্তে ডাকিয়া মোহনকে বলিল—মোহন, দাদাবাবুর মনের গতিক

ভালো নয়। শেষ পর্যন্ত দরকার হলে তাকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি গিয়ে একখানা নৌকা নিয়ে আসি।

বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে নবীন ও করিম ফিরিয়া আসিল। তাহারা আসিয়া বাঁধের উপরে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—সকলে তাহাদের ঘিরিয়া ধরিল—শুধাইল—কি খবর?

নবীন বলিল—আল্লা এবারে আর কাউকে রাখবে না।

সে বলিল—পদ্মার বান সুনগরের নদীর মুখ পর্যন্ত এসে পড়েছে—আর প্রহর দুইয়েকের মধ্যে বিলে এসে পড়বে।

করিমের সংবাদও অনুরূপ। সে জানাইল যে আত্রাই নদীতে অকাল বন্যা নামিয়াছে—তাহার প্রকাণ্ড জলপ্রবাহ ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে—এতক্ষণে বিলের উত্তর দিকে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বোধ করি সেই জন্যই বানের এত তোড়—নতুবা শুধু যমুনার বান তো এমন প্রবল হইবার নয়।

তারপরে সে বার কয়েক কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল—আল্লা, আল্লা, আল্লা, এ কি তোমার কাণ্ড!

তখন সকলেই বুঝিল সমস্ত আশাভরসা নির্মূল হইয়াছে। মজুরেরা নিজেদের জরু-গোরু রক্ষার্থ ঝুড়িকোদাল লইয়া প্রস্থান করিল। কেহ তাহাদের থাকিতে অনুরোধটুকুও করিল না।

সকলেই বুঝিল সব আশা শেষ। কেবল দর্পনারায়ণ বুঝিল না। দর্প-নারায়ণ বাঁধ ছাড়িয়া নড়িতে রাজি হইল না, কাজেই মোহন প্রভৃতি তার জন্য বাঁধের উপরে রহিয়া গেল, বাঁধরক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, যদি সম্ভব হয়, দর্পনারায়ণকে রক্ষা করিবার আশায়। সঙ্কটকালের জন্য মুকুন্দ একখানা নৌকা আনিয়া রাখিল।

দণ্ডে দণ্ডে দুর্যোগ ভীষণতর হইতে লাগিল। সূর্য ডুবিল কি না বোঝা গেল না। প্রতিমুহূর্তে জলস্থলের চেহারা অধিকতর উৎকট হইতে থাকিল। ঢেউ অধিকতর শব্দিত, বাতাস অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। বাতাস সহস্র সহস্র বন্য-অশ্বের হ্রেষা তুলিয়া ধাবিত হইল, খুরে খুরে তরঙ্গশ্রেণী বিক্ষুব্ধ হইল, মেঘে মেঘে কেশর কম্পিত হইল। নিস্তব্ধতার শবদেহটাকে লইয়া সহস্র সহস্র ধ্বনিপ্রতিধ্বনির প্রেত লুফিয়া লুফিয়া খেলা করিতে লাগিল। আর কাহারও যেন দুই অতিকায় বাহু মেঘে মেঘে ঠুকিয়া বিদ্যুৎস্ফুরণ করিতে থাকিল। তখন জলে স্থলে মেঘে বিদ্যুতে বজ্রে ঝঞ্ঝায় সে এক পরম প্রলয়-সঙ্গীতের বিরাট সঙ্গত শুরু হইয়া গেল।

রূপকথায় শোনা যায় সকলে এতকাল যাহাকে রাজরানী বলিয়া জানিতে অভ্যস্ত, অকস্মাৎ সে বিরাট রাক্ষসীমূর্তি ধরিয়া সভাস্থলে উপস্থিত। প্রকৃতির আজ সেই রাক্ষসীরূপ।

এমন সময়ে দর্পনারায়ণ লক্ষ্য করিল, আকাশের পূর্বতম প্রান্তে, যমের সহোদরা অদৃশ্য যমুনা যেখানে প্রমত্তা প্রকৃতির রক্ততাড়িত ধমনীর মতো উত্তাল নর্তনে বহমানা, সেই অতিদূর পূর্বদিগন্তে একখানা মেঘ উঠিতেছে—আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত অবধি বিস্তৃত। সে কী মেঘ! যেন একখানা কষ্টিপাথরের প্রাচীর, তেমনি নিরেট, তেমনি কৃষ্ণ, তেমনি গুরুভার। সেই মেঘপ্রাকার ক্রমশ ঠেলিয়া উচ্চ হইতে থাকিল—শেষে তাহার শীর্ষ মধ্যগগন স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে আনত হইয়া পড়িল। তখন তাহার ছায়ায় কালো বিলের জল মহিষাসুরের দেহের মতো বিবর্ণ কৃষ্ণপাণ্ডুর রূপ ধরিল। তখন বৃষ্টি নামিল, বিদ্যুৎ চমকিল, ধরিত্রীর নাভিকুহর হইতে উত্থিত এক মেঘগর্জন ধ্বনিত হইল। বৃষ্টি বর্গীর ঘোড়সোয়ারের তির্যকধৃত বর্শাফলকের মতো আঘাত-ভীষণ, বিদ্যুৎ ভয়াবহতার মশালের মতো মুহুর্মুহু নির্বাণ-ভাস্বর, মেঘগর্জন

প্রলয়ের জয়স্তম্ভের মতো স্বসমুখ; জল পুতনার লোলুপরসনার মতো লেলিহমান। চরাচর নরকরোটির মতো রিক্ত, শুষ্ক, নিরর্থক।

কোন অনাদিকাল হইতে প্রকৃতি আর মানুষে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, কি নিষ্ঠুর সে সংগ্রাম! মাঝে মাঝে তাদের রণ-বিরতি ঘটে। তখন মানুষ আসিয়া প্রকৃতির কোলে বাসা বাঁধে, চাষ করিয়া ফসল ফলায়, প্রকৃতির দানে আঁচল ভরে, তখন মানুষের মুখে হাসি, প্রকৃতির মুখে শান্তি! দুজনেই ভাবে বুঝি এই ভাবেই চলিবে। কিন্তু হঠাৎ রণবিরতি ভঙ্গ হয়! তখন ভূমিকম্পে অট্টালিকা চূর্ণ, অগ্ন্যুৎপাতে নগর ভস্মীভূত, জলপ্লাবনে জনপদ মগ্ন, ঝড়ে নৌবহর বানচাল, শস্যদাত্রী বর্ষা বন্যারূপে প্রাণহন্ত্রী, আর প্রকৃতি অবচেতন মনের অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার মতো আকাশ-ছাওয়া পঙ্গপাল পাকা ফসলের ক্ষেত্র লুটিয়া খাইয়া যায়, একটি কণাও অবশিষ্ট থাকে না। একই প্রকৃতির এই দুই বিচিত্র রূপ।

পার্বতীরূপে সে ঘরের কন্যা, কালীরূপে সে নগ্নিকা; লক্ষ্মীরূপে সে গৃহশ্রী, চামুণ্ডারূপে সে সর্বহা; ষোড়শীরূপে সে বাসনাসিন্ধুর উদ্বোধয়িত্রী, ছিন্নমস্তা সে আত্মরুধিরপায়িনী; বগলা সে শান্তিময়ী, ধূমাবতী সে শ্মশানধূমধূসরা; প্রকৃতি সে গৃহলক্ষ্মী, প্রকৃতি সে ভৈরবিনী, প্রকৃতি সে সাধ্বী, প্রকৃতি সে স্বৈরিণী, সে মধুরা, সে ভয়ঙ্করা; বিপরীতবিহারিণী সে। তাহাকে লইয়া কাজ করা চলে, ঘর করা চলে না। সে ক্ষণকালের খেলার সঙ্গী হইতে পারে, চিরকালের পোষ-মানা কখনো হয় না। তবু তাহাকে লইয়াই মানুষের সারা জীবন কাটাইতে হয়, সে তাহার এক দুরূহ সৌভাগ্য।

দর্পনারায়ণের অটল মূর্তি, পৃষ্ঠদেশে নিবদ্ধ বাহুদ্বয়, উন্নত বক্ষস্থল প্রকৃতির স্পর্ধিত আহ্বানের অভিমুখে প্রতিস্পর্ধা হানিয়া বিরাজমান। আজ দুদিন সে অভুক্ত, অস্নাত, অনিদ্র। তাহার সিক্ত কেশ কপালে কপোলে লিপ্ত, তাহার গাত্রবাস কতবার ভিজিয়া কতবার শুকাইয়াছে—আবার ভিজিয়াছে। তাহার অনুগত অনুচর চারজন অদূরে উপবিষ্ট, তাহাদের ধারণা বাঁধটা ভাঙিয়া যাইবে আশঙ্কায় দাদাবাবু উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা কেমন

করিয়া বুঝিবে দর্পনারায়ণের বেদনা কোথায়! তাহারা কেমন করিয়া বুঝিবে সে বেদনা কত দুঃসহ আর কত গভীর! ঐ বাঁধটাকে একটা মাটির স্তূপ মনে করিলে অন্যায় হইবে—সকলের কাছে তাহাই বটে, কিন্তু যে ঐ বাঁধটা গড়িয়া তুলিয়াছে সেই দর্পনারায়ণের কাছে ওটা তাহার জীবনের আশাআকাঙ্ক্ষা, স্পর্ধা-প্রতিস্পর্ধার প্রতীক—না, ওটাকে তাহার জীবনের বহিরভিব্যক্তি মনে করা অনুচিত হইবে না। এসব কথা কে বুঝিবে! কালো চলন বিল যদি ঐ মাটির শিরদাঁড়াটাকে আজ জীর্ণ হরধনুর মতো অনায়াসে ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়, তবে দর্পনারায়ণের অবস্থা কি কাল হতমান পরশুরামের ন্যায় হইবে না। তখন আর বাঁচিয়া থাকিবার কোন সার্থকতা থাকিবে কি? এসব কথা আর কাহারো বুঝিবার নয়—তাহারা ভাবিবে বাঁধের শোকে দর্পনারায়ণ চৌধুরী উন্মাদ!

এমন সময়ে সমগ্র বাঁধটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, এবং যে জল বাঁধের কণ্ঠদেশে ছিল তাহা হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া বাঁধের মাথা ডুবাইয়া দিয়া দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের জানু স্পর্শ করিল। নবীন ও করিম বলিয়া উঠিল—ভাই—এই বুঝি বড়ল আর আত্রাইর বান এসে বিলে পড়ল।

সকলে বুঝিল—সব আশা নির্মূল, বাঁধের উপরে আর একমুহূর্ত থাকা নিরাপদ নয়। তাহারা দর্পনারায়ণকে একরকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়াই উচ্চতর ভূমিখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণের মধ্যে জলের সীমানা সেখানে পৌঁছিল। মানুষ কজন সরিয়া গেল। জল এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইতেছে, মানুষ এক-পা এক-পা করিয়া পিছু হটিতেছে।

এবার দুর্যোগ চরমে উঠিল। চলন বিল সমুদ্রাকার। সমুদ্রের স্মৃতি বুঝি আজ তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে—তাই বুঝি সে সমুদ্রে পরিণত! তাই সেই কালো সমুদ্র বহু মৃত নদনদীর শ্মশানভূমিসঞ্চারিণী শ্মশানকালীর ন্যায় পদ্মা ও আত্রেয়ীর বন্যারূপিণী ডাকিনী যোগিনীকে সঙ্গে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বিদ্যুৎস্ফুরিত তরঙ্গফণা কালনাগিনীর ন্যায় ফুঁসিতে লাগিল। তাহার অনুচারিণী পরিচারিকাগণের ছলছল খলখল হাস্যে, কলকল কোলাহলে

বিশ্বের অপর শব্দসমূহ নিমগ্ন, গুরু গুরু মেঘের রবে সহস্র সহস্র শুষ্ক নরমুণ্ডের গড়াগড়ি, ঝঞ্ঝা নৃত্যোন্মত্তের নিশ্বাসস্পন্দের মতো প্রবল, ধরণী ক্ষণে ক্ষণে কম্পমানা!

এই বিরাট স্পর্ধার বিরুদ্ধে একটিমাত্র মানুষ। তাহাকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে চরাচর আজ উদ্যত। কোন দুষ্ট নিয়তি মেঘান্তরালে গুপ্ত থাকিয়া মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ফাঁস নিক্ষেপে তাহাকে আজ বাঁধিয়া ফেলিতে সচেষ্ট, কাহার ইঙ্গিতে তাহার বিরুদ্ধে জলস্থল অন্তরীক্ষ এবং আকাশের চতুরঙ্গবাহিনী আজ চালিত।

জল আরও বাড়িল, মানুষ কয়জন পিছু হটিল—জল বাড়িয়াই চলিল—আর পিছু হটিবার স্থান নাই। এবারে দর্পনারায়ণ তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—তোরা এবার ফিরে যা—

মোহন বলিল—কেন?

দর্পনারায়ণ বলিল—আর থাকলে বিপদ আছে।

মুকুন্দ বলিল—বিপদ কি তোমার হতে নেই?

দর্পনারায়ণ বলিল—বিপদের তলা দেখতেই আমি বেরিয়েছি।

তারপরে সে মোহনের দিকে ফিরিয়া বলিল—মোহন তুই পালা, তুই ছেলেমানুষ, অনেক সুখসৌভাগ্য এখন তোর সম্মুখে।

মোহনের মনে একবার কুসমির কচি মুখখানি জাগিল—উষার অরুণোদয়ের আভাসের মতো কুসমির সিঁথায় ক্ষীণ সিঁদুররাগ সে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইল। কিন্তু পালাইবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। দর্পনারায়ণ বলিল—পালা, পালা, তোরা সবাই পালা! আর এখানে নয়। দেখছিসনে—

তাহার বাক্য সমাপ্ত হইবার আগেই একটা সুদীর্ঘ অস্পষ্ট অব্যক্তগম্ভীর শব্দ শ্রুত হইল। সকলেই বুঝিল বাঁধটা সাকুল্যে ধ্বসিয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রকাণ্ড একটা তরঙ্গ আসিয়া দর্পনারায়ণের উপরে পড়িল। সকলে ছুটিয়া অগ্রসর হইবার আগেই তাহাকে টানিয়া লইয়া তরঙ্গ সরিয়া গেল। সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল।

তখন চারজনে নৌকায় চড়িয়া মশাল জ্বালাইয়া সারারাত্রি তাকে খুঁজিয়া বেড়াইল, দাদাবাবু বলিয়া কত ডাকিল, কেহ উত্তর দিল না।

ওদিকে কুঠিবাড়িতে দীপ্তিনারায়ণ স্বপ্নের ঘোরে পাশ বালিশটাকে পিতা ভাবিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। অনেক রাত্রে একবার তাহার ঘুম ভাঙিলে অন্ধকারে পাশ বালিশটাকে পিতা কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত আশ্বাসে সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরবেলা কর্দমাক্ত ক্লান্ত দেহে মোহন কুসমিদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। সে ক্ষান্তবুড়ির মৃত্যুসংবাদ জানিয়াছিল, কাজেই তাহার সন্ধান না করিয়া সরাসরি কুসমির ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল—দেখিল দ্বার রুদ্ধ। বাড়িতে কাহাকেও দেখিতে পাইল না যে কুসমি কোথায় শুধাইবে। তখন সে দরজায় ধাক্কা দিয়া বুঝিল ভিতর হইতে রুদ্ধ।

মোহন ডাকিল—কুসমি!

সাড়া নাই।

মোহন আবার ডাকিল—কুসমি নিরুত্তর।

সে ভাবিল বিবাহের প্রস্তাব ওঠাতে কুসমি তাহার সম্মুখে আসিতে লজ্জা পাইতেছে। তাই সে বলিল—কুসমি বাইরে আয় না, কেউ নেই। তখনো নিরুত্তর।

তখন সে বলিল—দুদিন বানের মুখে দাঁড়িয়ে থেকে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে ফিরে এলাম—আর তোর এ কি ভাব!

এবারে দরজা খুলিল।

মোহন চমকিয়া উঠিল।

সে দেখিল—চৌকাঠের ফ্রেমে বাঁধানো একখানি ছবির মতো নতনয়না নীরব কুসমি দণ্ডায়মান—তাহার পরনে শাদা থান, তাহার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, তাহার অঙ্গ নিরলঙ্কার, তাহার মুখে প্রশান্ত বিষাদ। কিছু বুঝিতে না পারিয়া মোহন হতবুদ্ধির ন্যায় তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বিস্ময়ের ভাব কাটিলে শুধাইল—এ কি।

কুসমি বলিল, তাহার কণ্ঠস্বর যেন কতদূর হইতে আসিতেছে, সে বলিল—মোহনদা, আমি বিধবা।

মোহন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মূঢ়ের মতো তাকাইয়া রহিল

কুসমি বলিয়া চলিল—তাহার কণ্ঠস্বরে জীবিতের কণ্ঠস্বরের মূর্ছনার অভাব, সে বলিয়া চলিল—মোহনদা, যে-ঘরে আমি মানুষ সে আমার ঘর নয়, যিনি আমায় পালন করেছেন তিনি আমার পিতা নন, আমার মাতা কে, পিতা কে, আমার বংশ বাড়ি ঘর কেউ জানে না! শুধু নিশ্চিত এই যে আমি বিধবা। এর বেশি জানবার দরকার হলে আমার পালনকর্তাকে, পিতাকে জিজ্ঞাসা কোরো।

এই বলিয়া যেমন নীরবে সে দরজা খুলিয়াছিল তেমনি নীরবে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

মোহন কিছুক্ষণ মূঢ়ের মতো বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বালকের মতো চৌকাঠের উপরে মাথা কুটিতে থাকিল, তাহার চোখ জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ঘরের ভিতরের চোখ দুটিও শুষ্ক ছিল না। মোহন অবিরল মাথা কুটিতে লাগিল আর অনর্গল উচ্চারণ করিতে লাগিল—ভগবান, ভগবান, ভগবান···

ভগবান, নিয়তি, অদৃষ্ট, শয়তান তোমাকে কী নামে ডাকিব জানি না, কেবল জিজ্ঞাসা করিতে চাই মানুষের জীবন লইয়া তোমার এই নিষ্ঠুর পরিহাস কেন? সে তোমার পরিহাসের যোগ্য নয়! তবে কেন? তবে কেন? কে উত্তর দিবে—তবে কেন?

সমাপ্ত